পারিয়াই
ের উপর ঝুঁকিয়া

তীর্থ যাত্রী

১

ভাই বোনদের মাঝখানে নিতান্ত শান্ত ভাবে বসিয়া রাখাল উপক্রমণিকার পড়া মুখস্থ করিতেছিল—নরঃ, নরৌ, নরাঃ—

দরজার উপর মামীমাকে রুদ্র-মূর্ত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়াও সে দেখিল না, দুলিয়া দুলিয়া আরও বেশী উৎসাহে, বেশী জোরে সে পড়িতে লাগিল," নরম্—নরৌ নরান্,—নরেন নরাভ্যাম্—নরৈঃ—

কাংস্য কণ্ঠে মামীমা বলিলেন, "থাক রে হয়েছে, আর লেখা পড়ায় কাজ নেই, এখন এদিকে একটু উঠে এসো তো বাছা—"

তিনি যে কি মতলবে এমন অসময়ে পড়ার ঘরের দরজায় স্থূল-শরীরখানি বহিয়া আনিয়া দাঁড়াইয়াছেন তাহা রাখালের অজ্ঞাত ছিল না। তিনি এখানেই কথার তুবড়ি ছুটাইতেন, নেহাৎ নিজের ছেলেমেয়েদের পড়ার বিঘ্ন হইবে বলিয়াই তিনি অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়াছিলেন।

তাহার মতলব বুঝিতে পারিয়াই রাখাল উঠিল না, বরং অতিরিক্ত মনোযোগী ছেলের মত বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

মামীমা এবার আর অন্তরের ক্রোধ দমন করিতে পারিলেন না, ... স্বর চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "কই উঠলি ... রাখাল? আমি কি তোর দাসী বাঁদি যে এখানে ঠায় একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকব?"

মাষ্টার মোহিনীমোহন নরেশের পড়া ধরিতেছিলেন, গৃহিণীর রুক্ষ কণ্ঠস্বরে ... ফিরিয়া দেখিয়া ব্যাপার বুঝিলেন। মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "যাও আগে ওঁর কথা শুনে এসো রাখাল, পড়া পরে হবে।"

অনিচ্ছার সঙ্গে বই বন্ধ করিয়া রাখাল বাহিরে আসিল।

বারাণ্ডায় আসিবামাত্র মামীমা কঠিন স্বরে বলিলেন, "নবাব পুত্তুর, কথা কানে গিয়েও যায় না,—দাসী বাঁদির কথা কিনা, সে কি আর কানে ঠেকে? হতো মামার ডাক,—অমনি যেখানে থাক—ছুটে আসা হতো। আর যাই হোক—মন যোগানোর বিদ্যেটা বেশ আয়ত্ত্ব করেছিস রাখলা।"

তাঁহার কথাগুলার মধ্যে এমন শ্লেষের ভাব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছিল যাহাতে রাখালের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। সে সে প্রসঙ্গে কোন কথা না বলিয়া অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, "বাঃ, কি বলতে এসেছ বল, আমায় বুঝি পড়া করতে হবে না? ওদিকে পড়া না হলে ইস্কুলে মাষ্টার বকবে, এদিকে বাড়ীতে নিত্যি ফাই ফরমাস, দোকান কর—বাজার কর, —পঞ্চাশবার এখানে যাও—ওখানে যাও—"

মামী একেবারে দপ করিয়া স্পিরীটের মত জ্বলিয়া উঠিলেন, বিকৃত কণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি বললি রাখলা—সব তুই করিস আর কেউ কিছু করে না? সবাই জড়ের মত হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে আর তুই একলা সংসারের সব কাজ করিস? অমন ধর্ম্ম ছেড়ো কথা বলিসনে রাখলা,—পাপ পুণ্যির এতটুকু ভয় রাখিস।"

গৃহিণীর উচ্চ কণ্ঠস্বর বাড়ীর সকলের কানেই গিয়াছিল, কাহার

উপরে তাঁহার রোষরূপ বজ্র নামিয়া আসিল ভাবিয়া—কেবল মাত্র পড়ার ঘরের কয়েকজন বাদে আর যে যেখানে ছিল সকলেই ছুটিয়া আসিল।

গৃহিণী সকলের উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া তাঁহার সুখদুঃখে সমবেদনা প্রকাশ-কর্ত্রী বিমলা ঠাকুরাণীর উপর দৃষ্টি রাখিয়া গভীর ক্ষোভের সহিত বলিলেন, "শুনছো মাসী, ছোঁড়ার কথা শোন একবার, এই জন্যেই না পাড়ার লোকেও এত কথা বলবার অবকাশ পায়। শতেক খোয়ারীরা এই ছোঁড়ার মুখে এককথা শোনে, তাতে হাজার ডালপালা জুড়ে দিয়ে লাখ কথা বলে যায়। তারা একবার এসে দেখে যেতে পারে না, তার বেলায় কি গতরে শুঁয়া পোকা ধরে? একবার ডেকো তো গা পাড়া কুঁদুলীদের, বেশ দশ কথা শুনিয়ে দেব আচ্ছা করে। ওই যে কথায় আছে না, ভাত দেবার কর্ত্তা নয়, কীল মারবার গোঁসাই, পাড়ার ওদের একবার ডেকো না গো—একবার চাক্ষুস সব দেখিয়ে দেব।"

ব্যাপারটা যে কি তাহা বিমলা কিছুই বুঝিলেন না, বলিলেন, "সে তো ভাল কথা মা, তাদের একদিন না হয় ডেকেই আনব। তবে সত্যি যে তারা লাখ কথা শুনায় তা নয় তারা যেমন শোনে তেমনই বলে, না হ'লে কথা জুড়বে কোথা থেকে?"

গৃহিণী একটু নরম হইয়া বলিলেন, "সে তো সত্যি কথাই বাছা, এই ছোঁড়া হাজার খানা করে লাগায় বলেই তো তারা দু কথা বলতে পায়। ঘরের ঢেঁকি কুমীর,—খাবে দাবে আর লোকের বাড়ী কুৎসা গাইবে। কি পোড়ার মুখো ছেলে মা, শুনলুম ও পাড়ার নন্দর পিসী নাকি একরাশ কাপড় ক্ষারে কেচে বাড়ী যাচ্ছিল, ছোঁড়া তার সঙ্গে ঝগড়া করে সেই রাশী রাশী কাপড় মাটিতে টেনে ফেলে এমন করে কাদা মাখিয়েছে যে সে কাপড় আবার সেদ্ধ না করলে হবে না। বুড়ির সে কি কান্না বাছা,

সেই বোঝা বয়ে আবার আমায় দেখাতে এসেছিল। বল দেখি এসব দেখলে কার না আপাদ মস্তক জ্বলে ওঠে বাছা? এ কি মানুষের কাজ, চামারেও যে এমন কাজ করে না।"

গুম হইয়া রাখাল দাঁড়াইয়া রহিল, একটী কথাও সে বলিল না।

বিমলা বলিলেন, "ও কি বলে?"

মুখভঙ্গী করিয়া মামীমা বলিলেন, "বলবে? বলবে আবার কি, ও নিজেই তো এ কাজ করে তবে পড়তে বসেছে এসে। এখন কি শান্ত ছেলে, পড়ায় কত মন—বই ছেড়ে উঠতে পারে না। তার পর কত করে ডেকে তবে তো এল, এসে আবার লম্বা চওড়া কথা দেখ—ওই নাকি আমার বাজার হাট সব করে, পঞ্চাশ বার দোকানে যাওয়া আসা করে—এর জন্যে নাকি ওর পড়া হয় না। সত্যি করে বল মাসী, এমন মিথ্যে কথা কোনদিন শুনেছ? লোকে শুনলে সত্যি বলে ভাববে নাই বা কেন, লোকের অপরাধ কি?"

জ্বলন্ত দৃষ্টি রাখালের মুখের উপর হইতে পা পর্য্যন্ত তিনি বুলাইয়া লইলেন।

বিমলা গালে হাত দিয়া বলিলেন, "হরি, হরি, এই ছেলে—এর মধ্যে এত কথা। হ্যাঁ গা, তা বয়েস কত হল?"

মামী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "ছেলেমানুষ। আমার নরোর বয়সী গো, এই পনের বছর বয়েস হল। ওরই বয়সী আমার নরো, নিজের ছেলে বলে অহঙ্কার করে বলছিনে গাঁয়ের সবাই বলুক—বাছা আমার সত্যি ধীর শান্ত কিনা। মুখের মাঝে কথাটী নেই পাত চড়ে রা কাড়ে না। অমন ছেলে একটী গাঁয়ে আছে?"

বিমলা বলিলেন, "তা নেই—এ একমুখে কেন হাজার মুখে বলব। আর এ ছেলেরও তো গুণ জানি বাছা, লোকের ক্ষতি করতে, সর্ব্বনাশ

করতে এমন ছুটি ছেলে থাকলে গাঁয়ে টেঁকা ভার হতো। বলে—একা রামে রক্ষে নেই লক্ষ্মণ দোসর—ঠিক সেই—"

অকস্মাৎ দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া অপরাধী ছেলেটী মুখভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিল, "হয়েছে হয়েছে ঠাকরুণ; তুমি এখন যা নিতে এসেছ সেই চাল ডাল ছুটো নিয়ে বিদেয় হও দেখি, আর কথা বলে কোন তো লাভ নেই। যার জন্যে এতগুলো নির্জলা সত্যি কথা বলে গেলে তা তো হল, এখন সরে পড়, পথ দেখ।"

বিমলা একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন, মামীমা কি বলিতে উদ্যত হইয়া থামিয়া গেলেন, বীরবালক সদর্পে বক্ষস্ফীত করিয়া তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া পড়ার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

হঠাৎ সচেতন হইয়া মামী বলিলেন, "দেখলে মাসী, শুনলে একবার ওর কথা গুলো? ওই ভাগনে নিয়ে আমায় ঘর করতে হয়, ওর ওই নিমের চেয়ে তেতো কথা আমার অহোর্নিশি শুনতে হয়। দেখলে—গাঁয়ে লোকের ক্ষতি করে এলে বাড়ীর একটা কথা বলতে গেলে কি রকম জ্বলে ওঠে উল্টে কথা ছুড়ে ফেলে। আমি মেয়ে তাই ওই ভাগনে নিয়ে ঘর করছি, অন্য কেউ যদি হতো—"

এতক্ষণে কথা বলিবার অবকাশ পাইয়া বিমলা বলিলেন, "আমি আর কি বলব বাছা, তোমাদের এই সব ব্যাপার দেখে আমি একেবারে 'থ' হয়ে গেছি। সে কথা হাজার বার সত্যি বাছা, তুমি নাকি সৎবংশের মেয়ে তাই ওকে নিয়ে মানিয়ে গণিয়ে ঘর করছো, অন্য কোন মেয়ে হলে ওকে একরাত এ বাড়ীতে থাকতে দিত না। তাও তো নিজের ভাগনে নয় বাছা, গ্রাম সম্পর্কে কোন চুলোর বোন, তারই ছেলে, ওকে নিয়ে কথাও তো বড় কম সইতে হচ্ছে না তোমাদের।"

মামী মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "ওকে আর কি বকি কি সাধে

মাসী ? তোমার জামাইকে কোন কথা বল দেখি—হেসেই উড়িয়ে দেন, বলেন—'ওগো আমরাও ওই বয়েসে ওর চেয়ে বেশী দুষ্টুমী করেছি। তোমার ছেলেটী দুর্ব্বল বলেই ঠাণ্ডা, তা বলে সবাই কি তাই হবে?' ছেলেটাও কি সেয়ানা দেখ, শনিবার দুপুর হতে সোমবার সকাল পর্য্যন্ত কি ভলিমাঁস্থটি হয়ে থাকে তা কি বলব। তখন যে কথাটী বলবে "নুট" করে শুনবে—আর কেবল মামার কাছে কাছে ঘুরে ওঁর মন যুগাবে। এতেই না আমার সব কথা ভেসে যায়, তোমার জামাই মনে ভাবেন আমি মিছে কথা বলছি, ওঁর ভাগনে খুব ভাল ছেলে। ওতেই না আমার আরও বেশী দুঃখ হয় মাসী, যদি ছেলেটার দোষ জানতে চাইতেন তা হলে তো এত দুঃখ হতো না। যাই হোক, এই তোমরা সব সাক্ষী রইলে, আমি এবার আর নিজে কিছু বলব না, যা বলবার সব তোমরা বলবে কথা রইল।"

বিমলা বলিলেন, "তার জন্যে আর বলাবলি কি বাছা, ললিত বাড়ী আসুক, সব শুনুক, ও ছেলের যা হয় একটা ব্যবস্থা করুক নইলে শেষে যে তুমিই মাঝে হতে মারা পড়বে মা।"

তাঁহার সান্ত্বনায় মামী কতকটা আশ্বস্ত হইলেন।

খুড়ার ঘর হইতে পলকের দৃষ্টিপাতে বাহির পানে তাকাইয়া এক সময় রাখাল দেখিতে পাইল বিমলা ঠাকুরাণী একখানা গামছার দুই ধারে দুইটী পুঁটলী বাঁধিয়া বাহির হইতেছেন।

২

রাখাল কেবল বাড়ীতে নয়, সারা গ্রামের মধ্যে স্বকার্য্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

তাহাদের দেশ যশোহর জেলার একটী ক্ষুদ্র গ্রামে, বাড়ীতে কেবলমাত্র মা আছেন, আর কেহ নাই। রাখাল যখন তিন বৎসরের তখন সে পিতৃহীন হইয়াছিল; মাতা শিবানী এই তিন বৎসরের ছেলেটীকে আশ্রয় করিয়া স্বামীর ভিটায় রহিয়া গিয়াছিলেন।

গ্রামে লোক ছিল সংখ্যায় খুব কম, বেশীর ভাগ দরিদ্র কৃষিজীবী। দুই এক ঘর ভদ্র স্বজাতি ছিল কিন্তু তাহাদের অবস্থাও প্রায় সমান। গ্রামে কোঠাবাড়ী কাহারও ছিল না, সকল বাড়ীই মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালে প্রস্তুত।

গ্রামে একটী পাঠশালা ছিল, বাগ্দী বংশীয় রামলোচন দাদা কতকাল হইতে এই পাঠশালায় গুরুর কাজ করিয়া আসিতেছে সে সংবাদ বড় একটা কেহ রাখে না। রামলোচনের মাথার চুল সব প্রায় উঠিয়া গিয়া প্রকাণ্ড টাকে পরিণত হইয়াছে, গায়ের চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ভ্রূ দুটি ও চোখের পাতাগুলি পর্য্যন্ত সাদা হইয়া গেছে, তথাপি আজও সে গুরুমহাশয়রূপে নিত্য পাঠশালায় আবির্ভূত হয়। আজও সে শেওড়া গাছ দেখিয়া বাছিয়া বাছিয়া ছড়ি তৈয়ারী করে এবং সেই ছড়ি প্রায় প্রত্যহই পড়ুয়াদের পৃষ্ঠে পড়িয়া দুই তিন খণ্ড হইয়া যায়।

গুরু মহাশয়ের নিজের সন্তান সন্ততি নাই, সংসারে কেবলমাত্র স্ত্রী যশোদার বয়সও অনেক, তথাপি সে আজও ঢেঁকিতে ধান ভানে, হাতে ও কক্ষে কলসী লইয়া ঘাট হইতে ফিরে।

রাখাল পাঁচ বৎসর বয়স হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িয়াছে। গ্রামের কৃষাণদের ছেলেরা—যে দুই এক ঘর ভদ্রলোক আছে তাহাদের ছেলে-মেয়েরা, নদীর ধারে যে মালোরা থাকে তাহাদের ছেলেরা, সকলেই তাহার সঙ্গে পড়িত।

এই পাঠশালার সর্দ্দার পড়ুয়া ছিল সে। কিন্তু অনেক সময় তাহাকে ডিঙ্গাইয়া চলিত একটী মেয়ে—সে ঘোষালদের বাড়ীর বড় বাবুর মেয়ে সপ্তমী।

কিন্তু সপ্তমী তাহাকেই এই পদ-মর্য্যাদাটা কেন জানি না—স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিয়াছিল। সেবার যখন ইনেস্পেক্টার মহাশয় আসিয়াছিলেন তখন একটী লিখিত প্রশ্ন উচ্চ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের দিয়াছিলেন। সপ্তমী নিকটবর্ত্তী রাখালের শুষ্ক মুখের পানে তাকাইয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল রাখাল এ প্রশ্নের উত্তর ঠিক করিতে পারিতেছে না। প্রশ্নের উত্তর খুব ভালরূপে জানা সত্ত্বেও সে ভুল করিয়া উত্তর দিয়াছিল।

গুরু মহাশয় ইনেস্পেক্টারের কাছে সগৌরবে এই মেয়েটীর গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং তিনি নিজেও কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া এই ছোট মেয়েটীর বুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু সামান্য এই প্রশ্নটীর উত্তর সম্পূর্ণ ভুল পাইয়া তিনি মৃদু হাসিয়া গুরুমহাশয়ের দিকে তাকাইয়াছিলেন মাত্র।

রাখালের উত্তর কতকটা ঠিক হইয়াছিল, তাই তাহার বুক দশ হাত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সে সপ্তমীকেও বিদ্রূপ করিতে ছাড়ে নাই। সপ্তমী একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে পাঠশালা ত্যাগ করিয়াছিল, ইহার পর আর সে পাঠশালায় আসে নাই।

কিন্তু এ পাঠশালার প্রভুত্ব করা রাখালের অদৃষ্টে বেশী দিন ঘটিল না। কি কাজের জন্য ললিতবাবু একবেলার জন্য গ্রামে আসিয়াছিলেন।

তিনি শিবানীর মামাতো ভাই, সেই জন্যই সেই একবেলা ভগিনীর বাটীতে আসিয়াছিলেন।

চৌদ্দ পনের বছরের একটী ছেলে আজও পাঠশালায় পড়িতেছে, সৎশিক্ষা কাহাকে বলে জানে না; চাষা ও জেলে তাঁতির ছেলেদের সহিত মিলিয়া আজও দুষ্টামী করিয়া বেড়ায় দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, এবং অবিলম্বে প্রস্তাব করিলেন রাখাল তাঁহার সহিত চলুক, তিনি সেখানে উহাকে লেখাপড়া শিখাইবেন এবং যাহাতে মানুষ হইয়া মায়ের দুঃখ ঘুচাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিবেন।

দুঃখিনী বিধবা যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইলেন। তাঁহার পুত্র লেখাপড়া শিখিবে, মানুষ হইবে ইহা যেন কল্পনাতীত ব্যাপার। তিনি নীরবে চোখের জলে জ্যেষ্ঠের পা দু'খানা সিক্ত করিয়া দিলেন।

কিন্তু রাখালকে প্রথমে এ-কথা বলিতে সে কিছুতেই রাজি হয় না। তাহার আবাল্য পরিচিত গ্রাম, নদী, এই সব গাছপালা, পথ ঘাট, মা, খেলার সঙ্গী, সব ফেলিয়া সে যাইবে কোথায়? সে প্রথমে প্রবলবেগে মাথা নাড়িল—না, সে এইখানেই দিন কাটাইয়া দিবে, আর কোথাও যাইবে না।

মা তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন—মামার বাড়ী কত ভদ্র-ছেলেদের সঙ্গে তাহার আলাপ হইবে, কত নূতন নূতন জিনিস সে দেখিতে পাইবে। কত গাড়ী মোটর, জাহাজ—ষ্টীমার—

নিকটবর্ত্তী কলিকাতার চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, থিয়েটার, বায়স্কোপ —আরও কত কি? কলিকাতায় রাত্রে বিদ্যুতের আলো জ্বলে, বিদ্যুতের পাখা চলে, কোথাও কিছু নাই—কেমন গান, কথা শুনা যায়, গড়ের মাঠে মনুমেণ্ট, এরোপ্লেন—

মামার মুখে কলিকাতার কথা শুনিতে শুনিতে রাখালের চক্ষু দুইটী

উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সে মামার হাত চাপিয়া ধরে—"আমি তোমার সঙ্গে যাব মামা।"

মামা বিব্রত হইয়া বলিলেন, "আজই যাবি কিরে? আমি আজ যাই, তোকে যেদিন পত্র দেব সেই দিনে তুই তোর কাপড় জামা যা আছে নিয়ে যাস।"

রাখাল দিন গণিতে লাগিল কবে পত্র আসে। গ্রামের সকলেই তাহার যাওয়ার কথা শুনিয়া দুঃখিত হইল, কিন্তু তাহাতে রাখালের দৃকপাত ছিল না, সহরে যাইবার আনন্দে সে তখন উতলা।

মামার পত্র আসিল। শিবানী চোখের জল চোখে রাখিয়া—কিছুদিন আগে নিকটবর্ত্তী হাটে কেনা ছোট লাল পোর্টম্যাণ্টটিতে পুত্রের যে দুই একখানা কাপড় জামা ছিল তাহা এবং লাটিম মারবেল লাটাই কাঁচ ভাঙ্গা, সিসা প্রভৃতি আবশ্যকীয় অনাবশ্যকীয় জিনিসগুলি সাজাইয়া দিলেন। মহোৎসাহে গ্রামের নীলু মালের সহিত সে যখন চলিয়া গেল তখনই মা শূন্যঘরে লুটাইয়া পড়িলেন।

মামা লোকটী ভাল, কিন্তু মামী যেন সর্ব্বদা যুদ্ধোন্মুখী হইয়াই আছেন। অসভ্য জঙ্গলী এই ছেলেটাকে দেখিয়া তিনি এতটুকু খুসি হইতে পারেন নাই। গ্রামের কাহারও নিকটে তিনি প্রথমে ইহাকে ভাগিনেয় নামে পরিচিত করিতে চাহেন নাই। কিন্তু ললিত বাবু এ বিষয়ে একেবারেই নির্ব্বিকার, তিনি অসঙ্কোচে সকলের নিকটে ইহার পরিচয় দিতে লাগিলেন।

মামার ছেলে-মেয়েরা মুখ দেখাইতে পারে না। তাহারা কোথাও যাইবার সময় এ ছেলেটীকে সঙ্গে লয় না, স্কুলে গিয়া ইহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার হইয়া থাকে। ললিতবাবু নিজে যেখানে যান সেইখানে ইহাকে লইয়া যান।

ইহাঁর উপর সংসারে অবিশ্রান্ত তাড়না। রাখাল প্রথম নীরবে সহ্য করিত। ইদানিং সেও মাথা তুলিতে শিখিয়াছে, সেও দুই এক কথা শুনাইয়া দিতে ইতস্ততঃ করে না।

ললিত বাবু কলিকাতায় অফিসে কাজ করিতেন, সোমবারে সকালে বাড়ী হইতে যাইতেন, শনিবারে বাড়ী ফিরিতেন।

বাড়ী আসিলেই কেবল রাখালের নামে অভিযোগ, ছেলে মেয়ে গৃহিণীই কেবল নহেন, বাড়ীর দাস-দাসী, পাড়ার ছেলে-মেয়ে সকলেই শত মুখে রাখালের নামে অভিযোগ করিত; ললিত বাবু জ্বালাতন হইয়া পড়িতেন।

প্রথম এই পরের বাড়ীতে পরের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়া রাখাল খুব শান্তশিষ্ট ভাবে দিন কাটাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল, হয় তো হইতও তাহাই, কিন্তু মামী ও তাঁহার ছেলেমেয়েদের জ্বালায় তাহা ঘটিয়া উঠিল না। বাড়ীর জন্য—দুর্বিনীতা মায়ের জন্য তাহার মন যতই খারাপ হইতে লাগিল বাহিরের আঘাতগুলা ততই বেশী হইয়া গায়ে বাজিতে লাগিল, রাখালও তত অশিষ্ট দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

এখন তাহার বিশেষ করিয়া সেই মায়ের কথাই মনে পড়ে—যে মা সময়ে অসময়ে তাহাকে ভৎ´সনা করিতেন, প্রহার করিতেন। কোথাও কোনও দুষ্টামী করিয়া আসিয়া সে বাড়ীতে ভাত পাইত না, তখন সেও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিত এবং মাকে বিধিমতে শাস্তি দিত।

মনে পড়ে গ্রামের সেই চিরপরিচিত পথ, নদীর ঝকঝকে বালি বাঁধানো ঘাট। জলের উপর যখন দুপুরের রোদ আসিয়া পড়ে, তখন জলের তলায় বালিগুলা চিকমিক করে ঠিক হীরা গুঁড়ানোর মতই। খেলার সাথীদের কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়ে—আর মনে পড়ে সপ্তমীর কথা।

গত গ্রীষ্মের বন্ধে সে বাড়ী গিয়াছিল। মায়ের সে কি আদর—কি যত্ন! সে কি খাইতে ভালবাসে সেইগুলি সযত্নে যোগাড় করিয়া তাহাকে খাওয়াইয়াছেন, তাহার কাপড় জামা ছুদিন অন্তর ক্ষার দিয়া কাচিয়া দিয়াছেন। সে কতগুলা বই পড়ে জানিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছেন। তন্ন তন্ন করিয়া তাহার মামার বাড়ী ছয় মাস বাসের খবর লইয়াছেন, এমন কি—কখন কি করে—কখন খায়, কখন শোয়, কাহার কাছে শোয় সে সব হিসাবও তিনি লইয়াছেন।

তাহার পূর্ব্বের সঙ্গীরা মাত্র ছয় মাস পরে তাহাদের সাথীকে নূতন ভাবে তাহাদের কাছে পাইয়াছিল—মাঝে পায় নাই। রাখাল ইহাদের সম্মুখে নিজের নাগরিক চাল বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং সেই জন্যই প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও নদীর কালো জল কাদা-মাখা করে নাই, আমবাগানগুলি অক্ষত ছিল, ধনা ময়রার পুকুরে বড় বড় মাছগুলি নির্ভয়ে খেলা করিতে পাইয়াছিল।

সকলেই আসিয়াছিল আসে নাই সপ্তমী। এই এক মাসের মধ্যে একদিন মাত্র তাহাকে কলসী কক্ষে ঘাটের পথে দেখা গিয়াছিল। নিজের অজ্ঞাতেই রাখাল শুনিতে পাইয়াছিল সপ্তমী লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে, সে এখন ঘরের কাজকর্ম্ম করে।

এক মাসের ছুটি ফুরাইতে সে আবার আসিয়াছে। দেশে পূজা নাই, সেই জন্য মামা তাহাকে পূজার ছুটিতে এখানেই রাখিয়াছিলেন। এখানে সে অনেক বাড়ী পূজা দেখিয়াছে, মামার সহিত নিমন্ত্রণ খাইয়াছে, যাত্রা থিয়েটার দেখিয়াছে। মাকে সেই সব লিখিয়া জানাইয়াছে। পূজার দীর্ঘ ছুটিতে পুত্রকে বুকে লইবার জন্য মায়ের বুক ছটফট করিতে ছিল, সে আসিল না দেখিয়া তিনি চোখের জলও ফেলিয়াছিলেন। অবশেষে তাহার দীর্ঘ পত্রগুলি পাইয়া তিনি কতকটা শান্ত হইলেন, দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলিয়া ভাবিলেন—সত্যিই তো, এখানে বাছা একখানা ঠাকুর দেখতে পায়নি, সেখানে আনন্দে আছে।

এই ভাবেই রাখালের দিন কাটিতেছিল। মা জানিতেন পুত্র মামার বাড়ীতে খুব সুখে আছে, সেও পত্রে তাহাই জানাইত, আগাগোড়া মিথ্যা বলিতে বা লিখিয়া জানাইতে সে কোনদিনই এতটুকু ইতস্ততঃ করে নাই, এটুকুই ছিল তাহার বিশেষত্ব।

৩

বাড়ীতে ফিরিয়াই নরেশ মাকে জানাইল "আজ রাখালটা ইস্কুলে কি মারটা খেয়েছে মা তা আর কি বলব। কি আশ্চর্য্য যে অত মার খেয়ে অন্য যে কেউ হয় তো অজ্ঞান হয়ে যেত, তার অজ্ঞান হওয়া দূরে থাক, চোখ দিয়ে একটি ফোঁটা জল পর্য্যন্ত পড়ল না।"

মা খুসি হইয়া বলিলেন, "তা আর মারবে না? মাগো, কি দস্যি ছেলে, কেউ যদি ওকে দমিয়ে রাখতে পারে! ও যে ডাকাত হবে তা আমি এক কলমে লিখে দিচ্ছি, এ তুই দেখে নিস নরেশ, আমার কথা ফলে কিনা তুই দেখে নিস। তা যাক, আজ ওকে মারলে কেন, আজ কি করেছিল?"

মুখ বাঁকাইয়া নরেশ বলিল, "সত্যি মা, ওর কি শক্তি, বাপ রে, হাতীর জোর ওর গায়। আজ নাকি ঘাটে চান করতে গিয়ে কোন হিন্দুস্থানীর ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া বেধেছিল, তাইতে ও কিনা ঠিক ওরই মত ছেলেটাকে ধরে ঠিক আধঘণ্টা জলের মধ্যে চুবিয়ে রেখেছিল।"

মা শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওমা, বলিস কি বাছা, ও ছেলে তবে তো খুনও করতে পারে। তার পর কি হল?"

নরেশ বলিল, "ঘাটে আরও লোক ছিল তো, তারা তাকে বাঁচিয়ে দিলে, সে তখন ইস্কুলে নালিশ করে দিলে। দেখ মা—হেড মাষ্টার যখন জিজ্ঞাসা করলেন ওকে ডুবিয়ে রেখেছ কিনা, তাতে ও একটী কথা বল্‌লে না, ঠিক বুনো শূয়োরের মত ঘাড় বেঁকিয়ে রইল, যেমন আমাদের বাড়ীতে কেউ কিছু বল্‌লে থাকে।"

নারায়ণী বলিলেন, "তাই তো আমার ভয় করে, তোরা যে রকম

রোগা তাতে ঝগড়া ঝাঁটি করে যদি তোদের গলাটা ধরে' একটী টিপ দেয়, আর তোদের দেখতে হবে না।"

শীর্ণ দেহ নরেশ আস্ফালন করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, টিপুনি দেওয়া বড় মুখের কথা কিনা, বল্লেই হল আর কি? আমি এমন পেঁচ জানি যাতে ওকে একেবারে ঘাব্‌ড়ে দেব; টিপ দেবে—উঃ বড্ড ক্ষমতা!"

নারায়ণী বলিলেন, "তবু কতকটা সাবধানে থাকিস্ বাছা, বিশ্বাস তো নেই!"

কিন্তু একই সংসারে থাকিয়া এত দূরে রাখায় রাখাল মোটেই শান্তি পাইতেছিল না। মায়ের জন্য মনটা যখন বড় অস্থির হইয়া উঠিত তখন একটু শান্তি লাভাশায় মামীর কাছে ঘেঁসিয়া যাইত, একটা স্নেহের কথা পাইবার জন্য তাহার সারাচিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিত, কিন্তু মামী এই ধেড়ে ছেলের ন্যাকামী মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না।

একদিন মামীর কোলের মেয়ে রমুকে হঠাৎ সে বড়ই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। দেড় বৎসরের মেয়েটীকে কোলে লইয়া সেদিন সে সকাল সাতটার সময় বাহির হইয়াছিল। সমস্ত দোকানে বাজারে ঘুরিয়া তাহাকে রঙিন কত জিনিস দেখাইয়াছিল, মামার কাছ হতে পাওয়া পয়সা খরচ করিয়া তাহাকে বিস্কুট লজঞ্চুস কিনিয়া খাওয়াইয়াছিল। রমু একটী বারও কাঁদে নাই, মায়ের কথা পর্য্যন্ত মুখে আনে নাই। পূর্ণ আড়াই ঘণ্টা চারিদিকে বেড়াইবার ক্ষোভ মিটাইয়া সাড়ে নয়টার সময় সে যখন বাড়ীতে আসিল তখন বাড়ীতে হুলুস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত গ্রাম রমুকে খুঁজিয়া লোক বেড়াইতেছে, এমন কি খিড়কির পুকুরে জাল ফেলা হইতেছে, যদি রমু জলে ডুবিয়া গিয়া থাকে। স্থূলাঙ্গিনী মামীমা কইমাছের মত তোলা আছাড় খাইতেছেন, পাড়ার কোন মেয়েই তাঁহার দেহখানি সামলাইবার সাহস পাইতেছে না।

এইদিন হইতে রমুর উপর রাখালের যে টুকু অধিকার ছিল তাহাও সে হারাইল। নারায়ণী আতঙ্কে শিহরিয়া এখন বলেন—"মাগো, ওই বাঁদরটা যদি রমুকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে পালাত। এক গা গয়না, ও মেয়েকে কি আর পাওয়া যেত? আমার নাকি পূর্ব্বজন্মের পুণ্যির জোর, তাই মেয়েকে ফিরে পেয়েছি।"

ললিতবাবু শনিবারে বাড়ীতে ফিরিয়াই এ কথা শুনিতে পাইলেন; তবে ব্যাপারটা ঠিক সত্যই ছিল না, তাহার তিনভাগ প্রায় মিথ্যা, একভাগ কোনক্রমে সত্যি ছিল। ললিতবাবু শুনিলেন, রাখাল এখানে থাকিতে চায় না, কলিকাতায় যাইতে চায়; সেজন্য অর্থের আবশ্যক হওয়ায় সে সালঙ্কারা রমুকে লইয়া বাড়ী হইতে পলায়ন করে। ইচ্ছা ছিল, রমুর গহনাগুলি কাড়িয়া লইয়া হয় তাহাকে ছাড়িয়া দিবে, নচেৎ গলা টিপিয়া মারিয়া কোথাও ফেলিয়া দিবে। কিন্তু প্রায় একক্রোশ পথ গিয়া মেয়ে খুব কাঁদিতে আরম্ভ করে, তখন লোকজন ছুটিয়া আসে এবং ভয় পাইয়া রাখাল তখন রমুকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিয়াছে।

আশ্চর্য্য কথা, যে এই সাজানো মিথ্যাগুলি অনায়াসে বলিতে মামীমার কণ্ঠস্বর একটুও কাঁপে নাই এবং নরেশও সাক্ষী দিতে দ্বিধা করে নাই।

শান্ত প্রকৃতি ললিতবাবু এবার যথার্থ-ই একটু বিচলিত হইয়াছেন তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝা গেল।

সময় বুঝিয়া নারায়ণী বলিলেন, "আমি বাপু ও ছেলেকে আর একটী দিন এ বাড়ীতে রাখতে পারব না, ও কোনদিন আমার কি সর্ব্বনাশ করে বস্‌বে কে জানে। তখন যাবে তো আমারই, আর কার কি?"

ললিতবাবু বলিলেন, "ব্যস্ত হচ্ছো কেন, রোস, আমি আগে সত্যি খবরটা নেই, তারপর ব্যবস্থা করব তো।"

ঝঙ্কার দিয়া গৃহিণী বলিলেন, "কি সত্যি খবর তুমি পাবে? ও কি বলবে আমি গয়না নেওয়ার জন্যে ওকে নিয়ে গিয়েছি? ও নিশ্চয়ই বল্‌বে খুঁকিকে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল, বলছে ও তো তাই। তুমি কেন ওকে পাঠিয়ে দাওনা ওর মার কাছে, বলে দাও—ওর আর এখানে থাকা হবে না।"

ললিতবাবু চিন্তিত মুখে বলিলেন, "তুমি এত ক্ষেপ্‌ছ কেন? আমি বল্‌ছি—সত্যি সে যদি সে কাজ করে থাকে আমি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব, ওর মার কাছে পাঠাব, সেখানে থেকে যা খুসি তাই কর্‌বে।"

সেদিন রাখাল মামা আসিবার অনেক আগেই বাহির হইয়া গিয়াছিল, মাঠে আজ ফুটবল ম্যাচ আছে, তাহাদের টিমে ক্যাপ্টেন সেই, কাজেই উৎসাহ তাহারই খুব বেশী।

ম্যাচে জিতিয়া হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে শব্দে বিজয়ী দল ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ীতে ফিরিয়াই মনে পড়িয়া গেল—মাষ্টার অনেকক্ষণ পড়াইতে আসিয়াছেন। অন্যদিন হইলেও কথা ছিল না, কিন্তু আজ মামা বাড়ী আছেন।

যদি কাহাকেও রাখাল ভয় করে, তাহা হইলে একমাত্র মামাকে। মামা বেশী কথা বলিতেন না, সামান্য দুই একটী মাত্র; কিন্তু সেই দুই একটী কথাকেই রাখাল ভয় করিত। অন্যের নিকট সে অসঙ্কোচে মিথ্যা কথা বলিয়া যায়, মামার কাছে অনেক চেষ্টা করিয়াও মিথ্যা বলিতে পারে না, কেমন যে রাশীকৃত মিথ্যা চাপা দিয়া একটুকরা সত্য বহুনিম্ন হইতে জাগিয়া উঠে তাহাই সে ভাবিয়া পায় না।

মুহূর্ত্তমাত্র দেরী না করিয়া সে আস্তে আস্তে পড়িবার ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, রমু, পিতার কোলে থাকিয়া রাখালকে দেখিতে পাইয়াই হাত-তালি দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"দাদা দাদা—"

তাহার কণ্ঠস্বরের অনুসরণ করিয়া মামা চাহিলেন, গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, "রাখাল—"

রাখালের গতিরোধ হইয়া গেল, এই মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইল—রমুটার মরিয়া যাওয়াই ভাল ছিল, বাঁচিয়া থাকিয়া সে একা রাখালেরই দুঃখের হেতু হইয়াছে।

কিন্তু উপায় নাই, সুড়্ সুড়্ করিয়া সে মামার গৃহে প্রবেশ করিল।

মামা রমুকে পার্শ্বে দণ্ডায়মানা বৃদ্ধা দাসীর কোলে দিয়া বলিলেন, "ওর মার কাছে দাও গিয়ে।"

সে রমুকে লইয়া চলিয়া গেলে, মামা রাখালের দিকে ফিরিলেন।

খানিক মাথা নত করিয়া আড়ষ্টভাবে রাখাল দাঁড়াইয়াছিল; শেষে—মামা কথা বলিলেন না দেখিয়া সে আস্তে আস্তে মাথা উঁচু করিয়া দেখিতে গেল—মামা কি করিতেছেন। বাপ রে, মামা তাঁহার বড় বড় দুইটি চোখে আগুন জ্বালিয়া তাহারই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছেন।

শীকারী বাঘের উজ্জল দৃষ্টির সামনে শীকার যেমন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, রাখালও তেমনি ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া একেবারে এতটুকুটি হইয়া গেল।

"রাখাল—"

কণ্ঠস্বর তো নয়, যেন শাঁখের আওয়াজ। মামা যখন ভাল মেজাজে থাকেন তখন কণ্ঠ হইতে স্বর ফুটে না, কিন্তু রাগিলেই মুস্কিল। সেই মানুষের কণ্ঠেই যে সপ্তম সুরে শাঁখ বাজিতে পারে তাহা কে বিশ্বাস করিবে?

রাখাল একবার নড়িল মাত্র, যেন তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছে কিনা তাহাই দেখিয়া লইল।

মামা কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাওয়া হচ্ছে এখন ?"

ক্ষীণ কণ্ঠে রাখাল উত্তর দিল, "পড়তে।"

মামা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিলেন, "হুঁ, তার পর, বেলা তিনটে হতে আটটা—এই পাচ ঘণ্টা ছিলি কোথায় ?"

রাখাল কথা বলে না।

মামা উগ্র হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "জবাব দে।"

রাখাল পূর্ব্ববৎ ক্ষীণস্বরে বলিল, "আজ গোবরাপুরের সঙ্গে আমাদের ম্যাচ ছিল, তাই—"

কথাটা সে আর শেষ করিতে পারিল না, চোখ ফাটিয়া বুঝি জলই আসিয়া পড়ে।

ললিতবাবু আবার খানিক চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বিকৃত মুখে বলিলেন, "পড়া শুনার তো অষ্টরম্ভা হচ্ছে, মাষ্টারদের মুখে যা সুখ্যাতি শুন্‌তে পাচ্ছি তাতে তো তোকে আর পড়াতে ইচ্ছে করে না। এ দিকে খেলার বেলায় তো খুব ওস্তাদ, স্রোতের আগে ভেসে চলিস্। যাক, সেদিন রমুকে কোথায় নিয়ে গেছলি বল দেখি? শুন্‌লুম তুই নাকি তার গায়ের গয়না খুলে নিয়ে বাজারের মধ্যে তাকে ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় পালাবার যোগাড়ে ছিলি ? বল্লি, এ সব বুদ্ধি পেলি কোথায় দিলে কে তাই শুনি ?"

এ কথা কেবল এখনই নয়—ইহার আগে যাহার সহিত দেখা হইয়াছে সেই বলিয়াছে,—কত অপমানই না করিয়াছে; কিন্তু রাখাল একটী কথা বলে নাই, নীরবে থাকিয়াছে। সে জানিত, মামার কানে এ সব কথা উঠিবেই; কিন্তু মামা কখনও বিশ্বাস করিবেন না। মামাকেও নির্ব্বিবাদে এই কথা মানিয়া লইতে দেখিয়া সত্যই সে অস্থির হইয়া উঠিল;

কি একটা কথা বলিতে গিয়া হঠাৎ উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া উঠিয়া সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ছুটিয়া পলাইল।

বিস্মিত মামা কেবল চাহিয়া রহিলেন, ব্যাপার যে কি তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

রাত্রে রাখাল আহারও করিল না, নিজের ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইয়া রহিল। বামা ঝি দুই একবার রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিল, সে উত্তর দিল না। নারায়ণী ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "থাক, আর ডাকিস্ নে বামা। কি হয়েছে, কে কি বলেছে যাতে বাবুর এত রাগ হল, ভাত খাওয়া হল না? বামুনঠাকুরকে বলে দে—ভাত তুলে রাখুক, কালকে ওই ভাত যেন ওকেই দেয়।"

রাখাল সবই শুনিল, তবু সে একটা উত্তর দিলনা, শুধু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার সব চেয়ে বড় দুঃখ যে তাহার মামাও তাহাকে অপরাধী ভাবিলেন, তাহার মুখে একটী কথাও শুনিলেন না। সে অনেকক্ষণ কাঁদিয়া স্থির করিল—আর লেখাপড়া শিখিয়া কাজ নাই, সে বাড়ীতে মার কাছে চলিয়া যাইবে এবং সেখানে যেমন ছিল তেমনই থাকিবে।

প্রভাতে সকলের অজ্ঞাতে সে যখন ঘাটে যাইতেছিল সেই সময়ে দেখা হইল মামার সহিত, তিনি বাগানে কি করিতেছিলেন।

কথায় বলে—যেখানে বাঘের ভয় সেইখানে সন্ধ্যা হয়, রাখালের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। সে এক পা এক পা করিয়া পিছনে সরিয়া যাইতেছিল, মামার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহা এড়াইল না, তিনি নরমস্বরে ডাকিলেন, "শোন রাখাল—"

রাখাল একবার দাঁড়াইল, কি ভাবিয়া আবার অগ্রসর হইল!

মামা বলিলেন, "আজ তুই একবার বাজারে যা দেখি, আমি আজ আর যাব না, ও পাড়ার দিকে একটা কাজ আছে আমায় সেখানে এখনি যেতে হবে। এই টাকা দু'টো নে, ভাল দেখে মাছ তরকারি আনিস, আজ আবার রামবাবু, নেপালবাবু আস্‌বেন—এখানে মাছ ধরতে; আমাদের পুকুরে, ওঁরা খাবেন। মুখটা ধুয়েই চলে যা, দেরী করিস্ নে যেন।"

টাকা দুইটা ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখাল ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল।

মামা বলিলেন, "হ্যাঁ, আর একটা কথা, কাল যা বল্‌ছিলুম—সত্যি কি হয়েছিল বল দেখি, ওরা তোর নামে কত কথাই না বলছে, আমি একমুখে শুনে কোন কথা বিশ্বাস করি নে, তাতো জানিস্। সত্যি কি হয়েছিল সেদিন বল দেখি।"

মামার নিকট অভয় পাইয়া রাখাল একনিশ্বাসে সব কথা বলিয়া ফেলিয়া নিজেকে হাল্‌কা বোধ করিল।

মামা একটু হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ, এই ব্যাপার, এর জন্যে এত আরে, কাল তুই যা করে কেঁদে পালিয়ে এলি তাতে আমি একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। তুই তো আচ্ছা বোকা রাখাল, মেয়েদের মত প্যানপ্যানে স্বভাব তোর, অল্পেতেই কেঁদে ফেলিস্।"

রাখালের সুগৌর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল।

৪

অনেক কাল পরে মামার শ্যালী ভগিনীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন, সঙ্গে আসিয়াছেন তাঁহার স্বামী ও একটী ননদ।

ভগিনীপতি ব্যারিষ্টার; ভগিনী মৃণালিনী পদমর্য্যাদা সম্পন্ন স্বামীর স্ত্রী, সঙ্গে আবার ব্যারিষ্টারের শিক্ষিতা ভগিনী ইথার; মামীমা একেবারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

বড়দিনের বন্ধে ইঁহারা একদিন বা দুইদিনের জন্য এখানে আসিবেন পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন সেই জন্য এ বন্ধেও রাখালের দেশে যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না।

গ্রামের সাতকড়ি সংক্ষেপে সাতু ঘোষ কলিকাতায় কোন দোকানে মাসিক পনের টাকা বেতনে কাজ করিত। সে মাঝে মাঝে যখন বাড়ী যাইত রাখাল তাহার সহিত যাইত, একা এত দূর ট্রেণে যাওয়া তাহার সাহসে কুলাইত না। এবার সাতকড়ি যখন জানিতে আসিয়াছিল সে কবে যাইবে তখন মামীমার কাছে ভিতরে গিয়া কথাটা তুলিবা মাত্র তিনি একেবারে অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিলেন, তার স্বরে চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "তাতো বটেই, এখন চলে যাবি নে তো কি? এখন আমার বোন ভগ্নিপতি আস্‌ছে কিনা, পাছে একখানা কাজ কর্‌তে হয়, একটা ফরমাস শুন্‌তে হয় সেই ভয়ে পালাচ্ছিস্ না রাখাল? ওই যে একটা কথা আছে না—'পরের হোলা খায় দায় বন পানে ধায়," তোরও হয়েছে তাই। এতদিন ফুর্ত্তি করে খেয়ে বেড়িয়ে এখন কাজের বেলায় পিট্‌টান দিচ্ছিস্। কিন্তু ও সব কথায় চিঁড়ে ভিজ্‌বে না তা বলে রাখ্‌ছি রাখলা, এখন

যদি যাস্ আর কোন দিন আমার বাড়ীতে আমি এতটুকু জায়গা দেব না—এই স্পষ্ট বলে দিচ্ছি কিন্তু।”

রাখাল ভয় পাইয়া গেল। অনেক কষ্টে এইবার সে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়াছে, মামা বইয়ের লিষ্টি লইয়াছেন, এক সপ্তাহের মধ্যে নূতন বই আসিবে। এখন বাড়ীতে গিয়া সে নূতন ক্লাসে উঠার আনন্দ নষ্ট করিতে চাহিল না।

মামীমার বোনকে দেখার একটা কৌতুহলও ছিল। এই তিন বৎসরের মধ্যে প্রায়ই প্রতিদিন সে মামীমার বোনের ও ভগ্নিপতির কথা শুনিতে পাইয়াছে, তাঁহাদের আশ্চর্য্য বাড়ীর—মোটর গাড়ীর কথা শুনিয়াছে। নরেশ মাঝে একবার দিন পাঁচেকের জন্য মাসীমার বাড়ী গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া তাহার মুখে মাসীমার বাড়ীর কথা আর ফুরায় না। তাহার মাসীমা নাকি ঠিক মেমসাহেবদের মত, ইংরাজি বলিতে পারে, নিজের হাতে মোটর চালাইতে পারে। সকলের চেয়ে ইথারের কথাই সে বলিত বেশী। মাত্র পনের যোল বয়স তাহার, এই বার সে ম্যাট্রিক পাস করিয়া স্কলারশিপ পাইয়াছে এবং আই এস সি পড়িতেছে। সে নাকি বি এ পাস করিয়া বিলাতে যাইবে বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

আর মামীমার ভগ্নিপতি অমরেশ চৌধুরী তিনি নাকি এক আশ্চর্য্য মানুষ। তিনি এরোপ্লেনে উঠিতে পারেন। রাখাল এরোপ্লেনে উঠার বিচিত্র গল্প শুনিতে শুনিতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যায়। অবাক্ হইয়া ভাবে—যে এরোপ্লেন অমন ভীষণ শব্দ করিয়া ডানা মেলিয়া অতখানি উঁচুতে ভাসিয়া উড়িয়া যায়, তাহার মধ্যে নরেশের মেসোমহাশয় থাকিলেন কি করিয়া?

এই তিনটী অদ্ভুত লোককে দেখিবার জন্য সে বাড়ী গেল না, সাতু

ঘোষের হাতে দিয়া মাকে একখানা পত্র লিখিয়া পাঠাইবে, এ বন্ধেও সে বাড়ী যাইতে পারিল না, গরমের বন্ধে গিয়া একেবারে দেড়মাস থাকিতে পারিবে।

উৎসুক হইয়া সে এই তিনজনের আসার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, দিন গণিতে লাগিল কবে শুক্রবার আসিবে সে দিন তাঁহারা আসিবেন বলিয়াছেন।

দিন তিন চার পূর্ব্ব হইতে মামা মামী, নরেশ, সুরেশ, মৃন্ময়ী ও দাস দাসীর অবকাশ রহিল না অতবড় বাড়ীখানার ঝুল ঝাড়া, ধোওয়া মোছা গুছানো নিরন্তর চলিতে লাগিল। পড়ার ঘরের শ্রী সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া গেল। নরেশ সুরেশ বই খাতা পরিপাটী রূপে সাজাইয়া ফেলিল, মা বাক্স হইতে একখানি সুজনি বাহির করিয়া টেবলে ঢাকা দিলেন। ইথার কলেজে পড়া মেয়ে, পাছে সে ছেলেদের রিডিং রুম, টেবিল দেখিয়া মুখ বাঁকায় এই সকলের ভয়।

রাখালও প্রাণপণে খাটিতেছিল, উৎসাহের আতিশয্যে কতবার সে গালাগালি খাইতেছিল তাহা তাহার খেয়ালই ছিল না।

শুক্রবার প্রভাতেই মহোৎসাহে সে মামীমাকে গিয়া বলিল, "কিন্তু গাড়ী যে ঠিক করা হয় নি মামীমা রোমজানকে বলে আসি—যেন ঠিক বারটার সময় ষ্টেশনে যায়—নইলে—

নরেশ হো হো করিয়া এমন হাসি হাসিয়া উঠিল যাহাতে রাখালের কান পর্য্যন্ত লাল হইয়া গেল। নরেশ বলিল, মার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই তাই একে এখানে রেখেছেন। রাখাল বড় দিনের ছুটিতে বাড়ী যেত, আমাদের তাহলে ওঁদের কাছে লজ্জায় পড়তে হতো না। আজ তিনবছরেও ওর গেঁয়ো স্বভাব গেল না, এতটুকু সভ্যতা শিখ্‌তে পারলে না, মাসীমা মেসোমশাই সকলের ওপরে ইথার ওকে দেখলেই যে হেসে মরবে।"

মামীমা বলিলেন, "তুই তবে বলিস্‌নে নরেশ, তারা ওর সঙ্গে কথা বল্‌লে তবে তো? ওর যা ভূতের মত চেহারা আর সভ্যতা তাতে কেউ ওর পানে ফিরেও চাইবে না, কথা বলা দূরের কথা! তোকেও বলে রাখি রাখাল—তুই যেন বাপু অনবরত ওদের সামনে বেড়াস্‌নে যে দুদিন ওরা থাক্‌বে একটু তফাতে তফাতেই থাকিস্‌, ওরা যেন তোর কথা কিছু না জান্‌তে পারে। আর গাড়ীর কি দরকার হবে পাগলা, তারা কি আমাদের মত লোক যে গরুর গাড়ীতে উঠবে? শুনিসনি নরেশের মুখে তাদের কথা? তাদের নিজেদের দশ বারো গণ্ডা মটর গাড়ীই আছে, নিজেরাই চালায়, ওরা ওরই একটাতে আস্‌বে।"

এই সুদীর্ঘ তিনবৎসরের মধ্যে আজই রাখাল মামীর মুখে প্রথম স্নেহের সম্ভাষণ পাইল, কিন্তু ইহাতে তাহার অন্তরের ব্যথা কমিল না, বরং জ্বালা আরও জ্বলিয়া উঠিল। সে আস্তে আস্তে নিজের গৃহে—উপরে যাইবার সিঁড়ির পার্শ্বে যাহা অবস্থিত ছিল সেইটীতে প্রবেশ করিল।

বৈকালের দিকে একখানা মটর হুশ্‌ হুশ্‌ শব্দে আসিয়া পড়িল, তাহার পিছনে বোধ হয় চল্লিশ পঞ্চাশটী ছেলে মেয়ে। পথের লাল ধূলায় তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ধূসরিত। কাহারও অঞ্চল লুটাইতেছে, কাহারও কাপড় খুলিয়া গেছে সেদিকে তাহাদের এতটুকু দৃক্‌পাত নাই, তাহারা তখন তন্ময় চিত্তে মোটর দেখিতে মহাব্যস্ত।

নিজের ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র জানালা এতটুকু খুলিয়া চোরের মত লুকাইয়া রাখাল দেখিতেছিল—মামীমা ছেলেমেয়ে কয়টীকে উপযুক্ত রকমে সজ্জিত করিয়া নিজেও যথা সম্ভব পরিষ্কৃত হইয়া মোটর হইতে ভগিনী ও ভগিনী-পতিকে নামাইয়া লইতেছেন। খুঁকির হাসি মুখে আর ধরে না। গ্রামের অনেক মেয়েই সেখানে জড় হইয়াছেন মামীমার গর্ব্বপূর্ণ দৃষ্টি মাঝে মাঝে তাঁহাদের উপরও ঠিকরাইয়া গিয়া পড়িতেছিল।

মামীমার বোন কি সুন্দরী, কি সুন্দর ভাবে কাপড়খানা পরিয়াছেন, আর কি সুন্দর হাসিটী। তাঁহার ওই হাসি দেখিয়া রাখালের মনে হইল, তিনি নিশ্চয়ই মামীমার মত নহেন ; যদিও তিনি ধনি গৃহের বধূ, তবু তাঁহার অহঙ্কার নাই। মেসোমহাশয় নামিলেন, তাঁহার আকৃতিতে বিশেষত্ব কিছু নাই, তবে এটুকু রাখাল লক্ষ্য করিল, তাঁহার পরণে ধুতি-চাদর। নরেশ ও মামীমা যে বলিতেন মেসোমহাশয় সর্ব্বদা কোট-প্যাণ্ট পরিয়া থাকেন, ধুতি মোটেই পরেন না, এ কথা তবে ঠিক নয়।

সকলের পরে নামিল একটি অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী। তাহার চোখে চশমা, হাতে একটি ছোট ঘড়ি। মাসীমার পায়ে নাগরা ছিল, ইহারও পায়ে রহিয়াছে, বিভিন্নতা কেবল ঘড়ি ও চশমায়।

মামীমা মহা সমাদরে সম্মানীয় অতিথিগণকে রাখালের ঘরের পাশ দিয়া উপরে লইয়া গেলেন। রাখাল বাহির হইল না, অভিমানাহত বক্ষে নিজের ঘরে একখানা বই লইয়া শুইয়া পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যার দিকে বাহির হইয়া সে বাগানে গিয়াছিল, ঘাটে যাওয়াই তাহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু ঘাটের কাছাকাছি গিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। ঘাটের হু'ধারে বসিবার জন্য যে উঁচু করিয়া বাঁধানো জায়গা ছিল তাহারই উপর বসিয়া আছে সেই মেয়েটী, তাহার চারিধারে ঘেরিয়া সুরেশ মৃন্ময়ী, রমু, পাড়ার আর কতকগুলি ছেলেমেয়ে। নরেশ ইচ্ছা সত্ত্বেও এই কলেজে পড়া মেয়েটীর সঙ্গ লইতে পারে নাই, তাহাকে মেসোমহাশয়ের নিকট থাকিতে হইয়াছিল।

দ্বাদশীর শুভ্র চাঁদখানা সন্ধ্যার আগেই আকাশে ম্লানভাবে ফুটিতে দেখা গিয়াছিল, সন্ধ্যা হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দীপ্তি ফুটিতে ছিল। বাগানের গাছগুলার উপর, পুষ্করিণীর কালো জলের উপর, মেয়েটীর

চশমার দু'খানি কাঁচের ও ঘড়ির উপর চাঁদের আলো পড়িয়া চিক চিক করিতেছিল। এই দারুণ শীতে হঠাৎ ঘাটে আসিয়া বসিয়া হাওয়া খাইবার অর্থ রাখাল কিছু বুঝিতে পারিল না। ব্যাপার যাহাই হোক, সে ফিরিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল।

রমু চাঁদের আলোয় তাহাকে দেখিতে পাইল, হঠাৎ দু'খানা হাত বাড়াইয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"দাদা—"

মৃন্ময়ী আশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিল, "ওমা, তাই তো, রাখাল দাই বটে তো। দেখেছ মেজদা মা যে অত করে বারণ করে' দিলে তা না শুনে রাখালদা কেমন আস্‌ছে দেখ।"

রাখালের চলচ্ছক্তি কে যেন হরণ করিয়া লইল ইথার বিস্মিত হইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও ছেলেটা কে সুরেশ?"

সুরেশ অবজ্ঞা ভরে উত্তর দিল, "কে আবার? আমাদের কেউ হয় না, এমনি পড়বার জন্যে আমাদের বাড়ী রয়েছে, বাবা দয়া করে' রেখেছেন; খায়, থাকে এই পর্য্যন্ত।"

রাখালের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল, সে আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না, ছুটিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে শুনিল, ইথার তাহাকে ডাকিতেছে; কিন্তু সে ফিরিল না, উত্তরও দিল না।

কি, নিদারুণ অপমান, ভাই বলিয়া পরিচয় দিতে ইহারা লজ্জা পায়। দোষ কাহার, তাহাদের না তাহার মামীর? মামী যদি এই সব ছেলেমেয়েদের মন এরূপে বিষাক্ত না করিয়া দিতেন তাহা হইলে ইহারা অন্যরূপ ভাবিত।

রাত্রিটা কাটাইয়া ভোর হইতেই সে উঠিয়া পড়িল। এখন আর দেশে যাইবার উপায় নাই, সাতুদা চলিয়া না গেলে সে যেমন করিয়াই হৌক বাড়ী যাইত। এখন সে ভাবিল এই দুইটা দিন পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম

আনন্দ পাড়ায় কাটাইয়া আসিবে। তাহার স্কুলের সহপাঠী তারণ বোসের বাড়ী এখানে, সে কতদিন তাহাকে নিজেদের বাড়ী লইয়া যাইতেও চাহিয়াছিল, কিন্তু মামীর ভয়ে সে সাহস করিয়া যাইতে পারে নাই।

আজ সে এই উদ্দেশ্যেই ঘর হইতে বাহির হইল। সম্মুখেই ভৃত্য লোহিয়াকে দেখিয়া সে তাহাকে জাগাইয়া দিল, সে দিন তিনেকের মত বন্ধুর বাড়ী যাইতেছে, এ কথা যখন না তাহার খোঁজ লইবেন তখন যেন জানাইয়া দেয়।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, ভগবান করেন আর এক; তাই সে যখন—একমাত্র লোহিয়া ছাড়া অন্য জাগ্রত মানুষের অস্তিত্বে নিঃসন্দেহ হইয়া বাড়ীর সামনে দরজার বাহিরে পথে পা দিল—সম্মুখেই ইথারকে দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।

ইথার খুব ভোরে উঠিয়া একাই বাহির হইয়া গিয়াছিল। খানিক দূর বেড়াইয়া কতকগুলা বন্য ফুল এক করিয়া লতা দিয়া বাঁধিয়া লইয়া ফিরিতেছিল, সম্মুখে রাখালকে দেখিয়া সেও থমকিয়া দাঁড়াইল।

কাল চাঁদের আলোয় সে রাখালের আকৃতি তত স্পষ্ট দেখিতে পায় নাই, আজ রাখালের সুগঠিত বলিষ্ঠ আকৃতিটার পানে তাকাইয়া সে খানিক নির্ব্বাক হইয়া রহিল। মাথায় সে অনেকখানি লম্বা, চওড়াও তেমনি, তাহার সুন্দর মুখ, বড় বড় চোখ, প্রশস্ত ললাট, সব গুলিই একপলকের দৃষ্টিপাতে ইথার দেখিয়া লইল।

অসঙ্কোচেই সে বলিল, "কোথায় যাচ্ছ রাখালদা কাল তোমায় আমি অত বার ডাক্‌লুম, এলে না, বড় যে এক দৌড়ে পালিয়ে গেলে। বেশ মানুষ যা হোক। ওরা যে বল্‌লে তুমি মোটে সভ্যতা ভদ্রতা জানো না, সত্যিই দেখ্‌ছি তাই,—ও-সব বালাইয়ের ধার দিয়েও যাওনি, বেশ আছ যা হোক।"

রাখাল একেবারে নির্ব্বাক্। কলেজে-পড়া বড় লোকের দুলালী মেয়ে প্রথম আলাপেই তাহাকে দাদা বলিয়া বসিল, আবার তাহার কথা কি চোখা যেন বিষ মাখানো বাণ।

ফুলের তোড়াটা বাম হাতে লইয়া ডান হাতে রাখালের হাতখানা ধরিয়া ইথার বলিল, "যাক, খুব বিছের পরিচয় দিয়েছ, আর বেশী বিছের পরিচয় দিয়ে কাজ নেই। এখন চল দেখি, তোমাদের বাগানে বেশ সুন্দর গোলাপ ফুটেছে, আমায় একটা তোড়া গেঁথে দিতে হবে। আর দেখ রাখালদা, খানিকদূরে কাদের একটা বাগান দেখতে পেলুম, এমন চমৎকার গোলাপ ফুটেছে তা আর কি বল্‌ব। ওই রকম ফুল দিয়ে একটা তোড়া যদি গাঁথতে পারতুম, তবেই না। যাকগে, এসো তুমি, বাড়ীতে যা আছে তাই দিয়েই তোড়া গাঁথ্‌বে।"

রাখালকে আর একটী কথা বলিতে না দিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সে বাগানে লইয়া চলিল। নরেশ উপরের বারাণ্ডায় সবে মাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, নীচের এই দৃশ্যের প্রতি যখন তাহার দৃষ্টি পড়িল তখন সে একেবারে লাল হইয়া গেল।

৫

মজা হইল এই রাখাল যত লুকাইয়া থাকিতে চায়, ইথার ততই তাহাকে টানিয়া বাহির করে।

সে দিন বৈকালে নরেশ যখন ইথারকে বেড়াইতে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিল, তাহার অনেক আগেই ইথার প্রস্তুত হইল। বাড়ীর সব ছেলেমেয়ে গুলি তাহার সঙ্গী হইল, হইল না কেবল রাখাল।

পথে বাহির হইয়া খানিকদূর চলিতে দেখা হইল রাখালের সহিত, সে বাজার হইতে কি সব জিনিস কিনিয়া আনিতেছে।

ইথার ভর্ৎসনার স্বরে বলিল, "বাঃ, বেশ মানুষ তো তুমি রাখালদা, তোমায় বলেছিলুম না আজ বিকেলে বেড়াতে যাব, তোমায় সঙ্গে যেতে হবে? নাঃ, তুমি বাস্তবিকই ভদ্রতা কাকে বলে তা জানো না দেখ্‌ছি।"

রাখালের মুখখানা লাল হইয়া গেল আর নরেশের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কোন উত্তর না দিয়া রাখাল পাশ কাটাইল। অভিমানে তাহার অন্তর প্রদেশ তখন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সে ইথারের পানে একবারও চাহিল না।

সে দিন সন্ধ্যায়-ভ্রমণ কারীর দল যখন ফিরিয়া আসিয়া চা খাইবার জন্য চীৎকার সুরু করিয়া দিল, তখন নারায়ণী রাখালকে ডাকিয়া ষ্টোভে কয়েক কাপ চা প্রস্তুত করিয়া আনিতে আদেশ দিলেন।

রাখালের বিবর্ণ মুখখানার পানে তাকাইয়া মৃণালিনী বলিলেন, "ও বেচারাকে আর কেন বিব্রত করছ দিদি, তোমার বামুন ঠাকুর কয়েক কাপ চা করে দিতে পারবে না?"

রাখালের প্রতি ভগিনীর এই মমতা দেখিয়া নারায়ণী অসন্তুষ্ট হইলেন বড় কম নয়, সে ভাব গোপন করিয়া তিনি বলিলেন, "পোড়া কপাল, সে নাকি চা তৈরি করবে? কখনও জীবনে চা তৈরী করেছে অথচ শিখানোর জন্যে কম চেষ্টাটা করেছি, সব মিথ্যে হয়ে গেছে। সেই জন্যে ভোলা চাকরটাই চা করে, তা সে যে এই সময়েই কোথায় গেছে, নইলে সেই করে' দিত। তা রাখালই করুক না, কয় কাপ চা করতে ও দেহ ক্ষয়ে যাচ্ছে না।"

মৃণালিনী একবার ভগিনীর দিকে একবার রাখালের দিকে তাকাইলেন। রাখাল নীরবে চলিয়া গেল।

পাশের ছোট কুঠারীটায় চা প্রস্তুত হয়! সেই ঘরে গিয়া ষ্টোভ ধরাইতে ধরাইতে তাহার চোখে বার বার জল আসিতেছিল।

আজ সারাদিনটা সে কি কম খাটিয়াছে, এখন সে একপাশে দাঁড়াইয়া একটু গল্প শুনিতে গিয়াছিল, সেও কেবল ইথারের জিদে পড়িয়া, নচেৎ সে যাইত না। সকালে সে একবার চা করিয়া সকলকে খাওয়াইয়াছে, মামা মৃদু আপত্তি করিতে মামীমা সকোপ কটাক্ষ স্বামীর উপর ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, "ভয় নেই গো, কয়েক কাপ চা তৈরী করতে তোমার ভাগনে পুড়ে মরবে না, ও দেহ রাংয়ের তৈরী নয়, রীতিমত লোহা দিয়ে তৈরী হয়েছে। ভোলা, অমরেশ যে কয়দিন থাকবে ও কাজ কর্ম্ম ভোলা করবে, এ সব ফাই-ফরমাস খাটবে কে—তুমি?"

ষ্টোভের উপর কেট্‌লিতে জল বসাইয়া দিয়া রাখাল ভাবিতেছিল টি-পটে চা লইয়া সে টেবলের উপর রাখিয়া চলিয়া যাইবে, তাহার পর উহারা নিজে ঢালিয়া লইবে, সে কিছুতেই চাকরের মত চা ঢালিয়া দিবার জন্য অপেক্ষা করিবে না। মামী, নরেশ প্রভৃতি উঁহাদের কাছে তাহার যা খুসি পরিচয় দিন, সে তো জানে সে মামার ভাগিনেয়, চাকর নহে।

হঠাৎ পিছনে দরজা ঠেলার শব্দে সে চমকাইয়া ফিরিয়া চাহিল, পাছে ষ্টোভের সোঁ সোঁ শব্দ বড় ঘরে গিয়া সকলের বিরক্তি উৎপাদন করে এই ভয়ে সে দরজা চাপিয়া দিয়াছিল।

মৃণালিনী ধীর পদে প্রবেশ করিয়া দরজাটা ভেজাইয়া দিলেন, রাখালের নিকট সরিয়া আসিয়া স্নেহ পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি ওঠো তো রাখাল, আমি চা তৈরী কর্‌ছি।"

রাখাল যেন আকাশ হইতে পড়িল, নির্ব্বাক্ নেত্রে সে মৃণালিনীর পানে তাকাইয়া রহিল।

মৃণালিনী চায়ের কৌটা সরাইয়া লইয়া সেখানে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "তোমায় চা কর্‌তে হবে না, আন্দাজ পাবে না, এর পরে হয় তো চা খারাপ হওয়ার জন্যে বকুনিও খেতে হবে। আমি তৈরী করে' টি-পটে ঢেলে দেই, তুমি টি পট আর কাপ ডিস গুলো বরং টেবলের পরে রেখে এসো, আমি সকলকে ঢেলে দেব এখন।"

ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে রাখাল বলিল, "না না মাসীমা, কিচ্ছু খারাপ হবে না, আপনি বরং খেয়ে দেখবেন এখন। আপনি যান, আমি তৈরী করে' নিয়ে যাচ্ছি।"

স্নেহ পূর্ণ কণ্ঠে মৃণালিনী বলিলেন, "এত কুণ্ঠিত হচ্ছো কেন বাবা, মায়ের কাছে কোনদিন এই রকম কুণ্ঠা বোধ কর্‌তে কি? সত্যি করে' বল দেখি,—মা মাসী কি ভিন্ন?"

মায়ের কথা মনে পড়িতে বুকের মধ্যটা কি রকম করিয়া উঠে। চির দুঃখিনী অভাগিনী মা, পুত্রের জন্য তাঁহার কত না ব্যাকুলতা। কখনও তিনি রাখালকে কোন ক্লেশ পাইতে দেন নাই, নিজে না খাইয়া খাওয়াইয়া তাঁহার পরম তৃপ্তি হইয়াছে। সেই মা,—সেই দুর্ভাগিনী মা—[illegible] দিন ধরিয়া মামীমার অবিরত তিরস্কার বাক্যবাণ সহিয়া

সহিয়া তাহার অন্তরটা বড় রূঢ় হইয়াই ছিল, এই স্নেহময় কথা কয়টী সে অন্তর বড় কোমল করিয়া তুলিল, তাহার অন্তরে জমা বাষ্পরাশী যাহা বজ্র উৎপাদন করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছিল, এই স্নেহের পরশ পাইয়া তাহা অশ্রুজলে রূপান্তরিত হইয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

তাহার চোখে জলস্রোত দেখিয়া মৃণালিনী বেদনা পাইলেন, তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "ছিঃ বাবা, কাঁদতে নেই। আমি আজ একটা দিন থেকে দেখে বুঝেছি, তোমার পরে এঁরা কি রকম ব্যবহার করেন। তুমি এঁদের কি রকম ভাগনে হও বাবা ?"

চোখ মুছিয়া আর্দ্রকণ্ঠে রাখাল বলিল, "মামা, আমার মায়ের পিসতুতো ভাই। কিন্তু মামা আমায় খুব ভালবাসেন, আজ তিন বছরের মধ্যে তিনি আমায় একটা মন্দ কথা বলেন নি।"

জল ফুটিতেছিল, মৃণালিনী ষ্টোভ নিভাইয়া ফুটন্ত জলে চা ছাড়িয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেশে তোমার কে কে আছেন রাখাল ? একটু তোমার দেশের গল্প বল—শুনি।"

দেশের গল্প—মায়ের গল্প, সে আর একমুখে ফুরায় না। এইতো—এখানেও দিন হয় রাত আসে, ইহার মধ্যে বিচিত্রতা এতটুকু নাই, সব যেন একঘেয়ে, কিন্তু দেশের সেই দিনরাতটীই বিচিত্রতাপূর্ণ। সেখানে ভোরে যখন ঘুম ভাঙ্গিত, চক্ষু মেলিয়াই সে আলো দেখিতে পাইত, পার্শ্বের বাঁশ-বাগানে কত পাখী বাসা বাঁধিয়াছিল, তাহারা গান গাহিত।

শোওয়ার ঘরের জানালার পাশে সেই কুল গাছটীতে একটী দোয়েল পাখী বাসা বাঁধিয়াছিল, কয়েকদিন সেই বাসা ভাঙ্গিয়া দিয়া ছানা সংগ্রহ করিবার বাসনা তাহার ছিল, কিন্তু মা তাহা হইতে দেন নাই। প্রত্যহ ভোরে ঘুম ভাঙ্গিতেই সে শুনিতে পাইত সেই কুলগাছের ডালে বসিয়া

৬

গ্রীষ্মের ছুটি আসিয়া পড়িয়াছে। মা পত্র লিখিয়াছেন এবার বাড়ী আসাই চাই, সে আজ দেড় বৎসর আসে নাই, মা তাহার মুখখানা দেড় বৎসর দেখেন নাই। রাখাল পত্র লিখিল সে এবার নিশ্চয়ই যাইবে, এবার কোনমতে অন্যথা হইবে না।

কলিকাতা হইতে ইথার মাঝে মাঝে পত্র দিত। সেদিনে সে পত্র দিয়াছে গ্রীষ্মের বন্ধে রাখাল যদি কলিকাতায় আসে তবে সে তাহাকে দ্রষ্টব্য অনেক কিছুই দেখাইতে পারিবে।

মনটা দুইদিকে টানিতেছিল, একদিকে মা আর দেশ, অপর দিকে কলিকাতা, বাল্য হইতে শোনা স্বপ্নে গড়া দেশ। সেখানে কত বড় বড় বাড়ী, কত মোটর ট্রাম, থিয়েটার বায়স্কোপ—

কিন্তু না, ও সব প্রলোভনে ভুলিলে চলিবে না, তাহাকে এবার দেশে যাইতেই হইবে নহিলে মা কাঁদিবেন।

মা লিখিয়াছেন এবার দেশে খুব আম হইয়াছে। রাখাল যে ভাদুয়া আমের কলম লাগাইয়াছিল এবার তাহাতে এত আম হইয়াছে যে ছোট গাছটি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবে। গাছে আম পাকিয়া ঝরিয়া তলায় পড়িতেছে, তিনি প্রাণ ধরিয়া পাড়িতে পারিতেছেন না। পুরোহিত পত্নী জয়া ঠাকরুণ সেদিন কতকগুলি বেল ও কুমড়ার মোরব্বা তৈয়ারী করিয়া দিয়া গেছেন, মা সেইগুলি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছেন। বাড়ীর পাশের খানাটায় মানুষ সমান কচু গাছ হইয়াছে, তিনি কাহাকেও তাহা কাটিতে দেন না। রাখাল কচুর শাকের ঘণ্ট খাইতে বড় ভালবাসে বলিয়া তিনি সেগুলি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছেন, এখন রাখাল আসিলেই হয়।

মায়ের পত্রে গ্রামের সকলের কথাই আছে, নাই কেবল সপ্তমীর কথা।

বৎসরখানেক পূর্ব্বে রাখাল মায়ের পত্রে জানিয়াছিল, তাহার বিবাহ হইবে এবং সে সেই জন্য মামার বাড়ী গিয়াছে।

আজ রাখাল বাড়ী যাইবে, গ্রামের সকলকেই সে গ্রামে দেখিতে চায়। সপ্তমী এতদিন কোথায়, মামার বাড়ী না পিতার বাড়ী তাহা কে বলিতে পারে ?

মামা যাইবার আগে তাহার ভাড়ার টাকা দিলেন। তার নিজের টিফিনের পয়সা জমাইয়া প্রায় দুই টাকা হইয়াছিল, রাখাল এই টাকা দিয়া মায়ের জন্য আবশ্যকীয় খুঁটিনাটি জিনিস কতকগুলা কিনিয়া ফেলিল।

সাতু ঘোষকে আগে সে পত্র দিয়াছিল, কিন্তু সে এবার বৈশাখ মাসেই দেশে চলিয়া গেছে।

এবার একটা দীর্ঘ পথ ভ্রমণ, কি রকম ভয় করে। যদিও তাহার বয়স প্রায় সতের আঠার হইয়া গিয়াছিল, তথাপি ট্রেণ ভ্রমণের পক্ষে আজও সে নাবালক মাত্র।

ট্রেণ রাণাঘাটে আসিয়া পৌছাইল। এই সময়ে হুড়মুড় করিয়া জনকতক স্ত্রীলোক সেই কামরায় উঠিয়া পড়িল। ইহাদের অনেকের কোলে শিশু, দুই তিনজন মাত্র রিক্ত হস্ত।

টিকিট কালেক্টার টিকিট চাহিতে আসিল। পুরুষেরা টিকিট দেখাইল, মুস্কিল করিল এই সব মেয়েদের লইয়া।

ভদ্রলোক টিকিট দেখিতে চাহিলে তাহাদের মধ্যে স্থূলাঙ্গিনী একটী রমণী অতি সন্তর্পণে অঞ্চল হইতে একখানি টিকিট লইয়া দেখাইল, টিকিট কালেক্টার টিকিট কোথাকার দেখিতে চাহিলেও তাঁহার হাতে দিলনা; বলিল, "এই তো বাবু, দেখুননা, আমরা গোপালপুর নামব, টিকিট দেখুন।"

পাখীটি কি সুন্দর শীষ দিতেছে। সেখানে কত সঙ্গী, কত খেলা, এখানে তাহার কিছু নাই, দিনগুলা আসে, এমনই চলিয়া যায়।

কিন্তু মৃণালিনীর আর শুনিবার সময় ছিলনা, চা হইয়া গিয়াছে।

টি-পট চা ঢালিয়া দিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, "আচ্ছা, আমি ও-ঘরে চল্লুম রাখাল, তুমি চা নিয়ে এস।"

তিনি বড় ঘরে প্রবেশ করিতেই অমরেশ বলিলেন, "এই যে, তুমি কোথায় গিয়েছিলে? দাদা এত মজার গল্প বল্‌ছেন যাতে হাস্‌তে হাস্‌তে আমার পেটের নাড়ী ছিঁড়ে গেল।"

মৃণালিনী বলিলেন, "দরকার ছিল বাইরে গিয়েছিলুম। বলুননা দাদাবাবু, গল্পটা আর একবার বল্‌তে সুরু করুন।"

অমরেশ বলিলেন, "কই, ছোকরাটী চা কর্‌তে গিয়ে আর যে ফির্‌লনা, পুড়েটুড়ে গেলনাতো?"

বিকৃতমুখে নারায়ণী বলিলেন, "না না, ও ছেলে পুড়ে মর্‌বার নয়। আর এমন কি কাজ যে পুড়ে মর্‌বে?"

কথা শেষ হইতে না হইতে রাখাল টি-পট ও কতকগুলি চায়ের কাপ ও ডিস লইয়া আসিল, এবং টেবলে সেগুলি সাজাইয়া ফেলিল।

একটু হাসিয়া অমরেশ বলিলেন, "বাহাদুর ছোকরা, এত শিগগির চা তৈরী করেছ—যাক্, দেখি এখন কি রকম চা করে' এনেছ, খেয়ে পরখ করা যাক।"

ইথার বলিল, "তুমি ছাড় দেখি রাখালদা, আমি চা ঢেলে দিচ্ছি।"

সে ক্ষিপ্রহস্তে প্রতি কাপে চা ঢালিয়া দিল, অমরেশ আস্বাদন করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, চাটা ভাল হয়েছে বটে।"

ইথার কাপে চুমুক দিতে দিতে বলিল, "কিন্তু যাই হক রাখালদা, সকালে যা চা করেছিলে সে আর মুখে দেওয়ার যো ছিলনা।"

রাখাল একবার কাতর নেত্রে মৃণালিনীর পানে তাকাইল। স্পষ্টই সে বুঝিতে পারিল কেবলমাত্র তাহার উপর দয়াপরবশ হইয়াই মৃণালিনী একবার উঠিয়া গিয়াছিলেন এবং চা প্রস্তুত করিয়া দিয়া আসিয়াছেন।

প্রশংসাবাদ চলিতে লাগিল, রাখাল আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

সে রাত্রিটা তাহার বড় শান্তিতে কাটিয়া গেল।

টিকিট কালেক্টার অবাক্ হইয়া গিয়া বলিলেন, "আরে, এ যে একখানা টিকিট, তোমরা আটজন বড় লোক আর পাঁচজন ছোট ছেলেমেয়ে রয়েছ, আর সব টিকিট কোথায় ?"

রমণীগণ মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, মহা আস্ফালন করিয়া তাহারা সমস্বরে বলিতে লাগিল, "আবার টিকিট কিসের বাবু, হিসেব মত সকলে পয়সা দিয়ে একখানা টিকিট কিনেছি, সে কি অমনি ফেলনা ?"

টিকিট কালেক্টার তাহাদের যত বুঝাইতে চান একখানা টিকিটে কিছু হইবে না, তাহারা ততই চটিয়া উঠে। বেগতিক দেখিয়া ভদ্রলোক ক্রুদ্ধ-ভাবে বলিলেন, "রোসো আমি পুলিস ডেকে নিয়ে আস্‌ছি, তোমাদের সকলের কাছ হতে ভাড়া আদায় না করে আমি ছাড়্‌ছিনে।"

তিনি নামিয়া গেলেন। মেয়েরাও সেই অবসরে বিশেষ তৎপরতার সহিত একটী ব্যূহ সাজাইয়া ফেলিল। যে স্থূলাঙ্গিনীর নিকট টিকিট ছিল তিনি ছেলেপুলে লইয়া মাঝখানে রহিলেন, অপর সাতজন কোমরে কাপড় জড়াইয়া তাহাদের বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া গর্ব্বভরে বলিতে লাগিল,—"ওঃ, অমন পুলিস ঢেরই দেখেছি। আমরা তো জোচ্চুরী করিনি, সবাই হিসেব করে পয়সা দিয়ে একখানা টিকিট কিনেছি, তবে আর কথা কিসের ?"

কামরার সমস্ত লোকই কৌতূহলের সহিত ইহাদের পানে তাকাইয়া-ছিল, প্ল্যাটফর্ম্মেও লোক বড় কম জড় হয় নাই।

পুলিসও আসিল, কিন্তু কোন ফলই হইল না। নিরুপায় সার্জ্জেনটী কোপে অধর দংশন করিতে লাগিল। এই সময়ে ট্রেণও ছাড়িয়া দিল।

মহিলাকুল এইবার যে যাহার সন্তান কোলে লইয়া শান্তমূর্ত্তি ধরিয়া বসিল। তাহার পর তাহাদের সে কি হাসি, আর কি গল্প। গল্পের সারমর্ম্ম এই—টিকিট বাবুটা তাহাদের বোকা বানাইয়া কিছু পয়সা

আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু তাহারা নাকি নেহাৎ চালাক তাই তাহারি ফন্দীতে পা দেয় নাই, এমন কি পুলিস দেখিয়াও ভয় পায় নাই।

মামার বাড়ী থাকিতে রাখাল দুই একখানা মাসিক পত্রিকা দেখিয়াছিল; দৈনিক পত্রিকাও মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করিত, তা সে পড়া হোক বা নাই হোক। নরেশ প্রভৃতি পাঁচজন ছেলে একত্রে মিলিয়া কত স্ত্রী স্বাধীনতার গল্প চলিত, সে এই রকমই নয় কি? রাখাল মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিল, এবার মামার বাড়ী ফিরিয়াই সে এই গল্পটী সকলের নিকট বিবৃত করিয়া বাহবা লইবে।

গোপালপুর ষ্টেশনে ট্রেণ থামিতেই মেয়েরা বেশ শান্তভাবে একে একে নামিয়া গেল, তাহাদের নামার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। যতদূর তাহাদের দেখা যায় রাখাল জানালা পথে মাথা বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল। বাস্তবিক ইঁহাদের সাহসের সহিত নিজের তুলনা করিয়া নিজেকেই সে খাটো বলিয়া মনে করিতেছিল। যদি কোনও লাল-পাগ্ড়িধারী লোক তাহার নিকট আসিত, সে তাহা হইলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত সন্দেহ নাই; কিন্তু এই মেয়েগুলার কি অসীম সাহস ইহারা পুলিসকে পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করে না।—

ট্রেণ যখন আসিয়া চাঁদপাড়া ষ্টেশনে থামিল তখন রাখালের সে কি আনন্দ; সে তাড়াতাড়ি তাহার পোঁটলা-পুঁটলি লইয়া ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়িল।

ছোট ষ্টেশন, লোক বেশী উঠেও না, নামেও না। যে দুই একজন নামিল তাহারা নামিয়াই সোজা পথ ধরিল। যে পর্য্যন্ত না ট্রেণ ছাড়ে সে পর্য্যন্ত রাখাল দাঁড়াইয়া রহিল।

ষ্টেশনে টিকিট চেকার যিনি, তিনিই সময় বিশেষে ষ্টেশন মাষ্টারও

বটেন। এ রকম ছোট ষ্টেশনে সময়ে তাঁহাকে সবই হইতে হয়—এমন কি খানসামা পর্য্যন্ত।

বাবুটি রাখালকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কাছে আসিয়া টিকিট চাহিলেন।

ব্যাগ নাই, রুমালও সে কোনকালে ব্যবহার করে না, একখানা চৌকা কাপড়ের টুকরা রুমালরূপে সে পকেটে রাখিয়াছিল, ইহারই এককোণে তাহার টিকিটখানি বাঁধা ছিল। অতি সন্তর্পণে সেইখানি বাহির করিয়া টিকিটখানা খুলিয়া বার বার দেখিয়া লইয়া সেখানা সে চেকারের হাতে দিল।

ষ্টেশনে ঘণ্টা পড়িল, ইঞ্জিন হইতে হুইস্‌লের শব্দ শুনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে বিশাল ট্রেণখানা নড়িয়া উঠিল।

ঝিক্ ঝিক্ শব্দ তুলিয়া ট্রেণ চলিল,—রাখাল তখনও দাঁড়াইয়া। একে একে কতকগুলি কামরা অবশেষে গার্ডের কামরাটীও চলিয়া গেল; সব পিছনের কামরাটীর পিছন দিক্‌টা লাল রংয়ে চিত্রিত। সেই লাল রংটা ক্রমে দূর হইতে দূরান্তরে চলিতে চলিতে বাঁকের আড়ালে লুকাইয়া গেল।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রাখাল ফিরিল। বেলা হইয়া উঠিয়াছে; ষ্টেশনের ঘড়ির পানে তাকাইয়া সে দেখিল এগারটা বাজিয়া গিয়াছে।

বাহিরে বিস্তৃত মাঠ; ওই মাঠের মাঝখান দিয়া আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য পথ গিয়াছে,—ওই পথ বাহিয়া তবে দূর গ্রামে পৌছাইতে হইবে।

রাখাল একবার আকাশের পানে চাহিল,—সূর্য্য প্রায় মাথার উপর আসিয়া তীব্র কিরণ ধরার বুকে বর্ষণ করিতেছে। মাঠের বুকে সূর্য্যের শুভ্র কিরণ যেন কুহেলী সৃষ্টি করিয়াছে।

অন্য সময়ে এই সব মাঠ ফসলে পূর্ণ থাকে বৈশাখে সে সব ফসল উঠিয়া গিয়াছে ; শূন্য মাঠ সব পড়িয়া আছে।

ধূ ধূ করিতেছে মাঠ, কোথাও এতটুকু জল নাই মাঝে মাঝে এক একটা বড় গাছ ছায়া দিতেছে। দূর মাঠ হইতে রাখাল ছেলেরা গরু আনিয়া মাঠে ছাড়িয়া দিয়া গাছের তলায় বসিয়া শুইয়া আছে। রৌদ্র ক্লান্ত গরুগুলি গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া রোমন্থন করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে রাখাল অগ্রসর হইল। দারুণ গ্রীষ্মে তাহার মাথা যেন ঝলসিয়া যাইতেছিল, দর দর করিয়া ঘাম ঝরিতেছিল। মাথায় একটা ছাতিও ছিল না যাহা দ্বারা কতকটা আত্মরক্ষা করা যায়। যখন প্রথম সে এখান হইতে গিয়াছিল, তখন তাহার সঙ্গে একটী ছাতা ছিল ; মামার বাড়ী গিয়া লজ্জায় সে একদিনও সেটা মাথায় দেয় নাই। সহরে নাকি ছাতা মাথায় দেওয়া দারুণ অভদ্রতা, কাজেই সে ছাতা মামার বাড়ীতে থাকিয়া কোথায় একদিন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।

পথে চলিতে চলিতে দুই একবার সে গাছতলায় দাঁড়াইয়া ঘাম মুছিতে লাগিল। ষ্টেশন হইতে গ্রাম তো বড় কম দূর নয়, প্রায় চার পাঁচ ক্রোশ হইবে। এতখানি পথ এই দুপুরে হাঁটাও বড় কম কথা নয়। সমস্ত মাঠ তাতিয়া আগুন হইয়াছে, পা দেওয়াই দুঃসাধ্য।

অনেক দূর আসা হইয়াছে, আর বেশী দূর নাই ; ওই দূরে নারিকেল গাছটা দেখা যাইতেছে—ওই তাহাদের গ্রাম। ওই নারিকেল গাছটা বহুদূর হইতে গ্রামের সীমা দেখাইয়া দেয়, গ্রামের পথে যাইতে উৎসাহিত করে।

রাখাল দ্রুত চলিতে লাগিল। বাড়ীতে মা কাল তাহার পত্র পাইয়াছেন, আজ রাঁধিয়া লইয়া তাহার জন্য বসিয়া আছেন। কতদিন পরে রাখাল গৃহে ফিরিতেছে, এ কি বড় কম আনন্দের কথা ?—

রাখাল সম্মুখপানে চাহিয়া দ্রুত চলিল।—

৭

ক্ষুদ্র গ্রামের বুকে একটা দমকা হাওয়ার মতই এবার রাখাল ভাসিয়া আসিল।

শিবানী পুত্রের গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া সস্নেহ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছিস বাবা, লোকে দেখে ভাববে তুই যেন খেতে পাসনে।"

রাখাল অন্তরে চমকাইয়া উঠিলেও মুখে প্রচুর হাসিয়া বলিল, "তোমার যেমন কথা মা। মামীমা বলেছেন আমি মাথায় লম্বা হয়েছি বলেই নাকি রোগা হয়ে গেছি।"

এই মিথ্যা কথাটা বলিতে তাহার গলা এতটুকু কাঁপে নাই। মামীমা যে তাহাকে কতখানি স্নেহের চোখে দেখেন তাহা সে বলে কি করিয়া ?

মা ভারি খুসি হইয়া উঠিলেন,—"হ্যাঁরে, বউ তোকে ভালবাসে—যত্ন করে ?"

রাখাল উত্তর দিল, "হ্যাঁ, তাঁর ছেলেদের চেয়েও বেশী যত্ন করেন।"

গদগদ কণ্ঠে শিবানী বলিলেন, "আহা, ওরা বেঁচে থাক, ওদের মঙ্গল হোক। গরীব বিধবার সন্তানটীকে যদি কোনরকমে মানুষ করে দিতে পারে--"

তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল, তিনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

একে একে রাখাল গ্রামের সকলের খবর লইল ; সকলেই এখানে আছে, ভালও আছে। সপ্তমীর বিবাহ, মাঝে আর দুইটী দিনমাত্র বাকি আছে।

কথাটার উপর রাখাল লক্ষ্য করার মত কিছুই পাইল না, তবে সম্প্রতি একটা যে নিমন্ত্রণের ব্যাপার আসিতেছে, ইহাতে সে বেশ খুসি হইয়া উঠিল।

রাখাল আসিয়াছে শুনিয়া সঙ্গীরা সকলেই আসিয়া জুটিল।

রাখাল প্রথমটা গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিতে গেল, কিন্তু বেশীক্ষণ এ ভাব থাকিল না, শীঘ্রই ইহাদের সহিত মিশিয়া গেল।

সকাল বেলায় ভেন্নার ডালে দাঁতন করিতে করিতে সে নদীর ঘাটে গিয়া বসিল।

নদীর ও পারে সূর্য্য উঠিয়াছে, এ পারে এখনও রৌদ্র পড়ে নাই, ওপারে আলোয় ভরিয়া গিয়াছে। দলে দলে পাখীরা সেই উন্মুক্ত আলোয় খেলিয়া বেড়াইতেছে, গান গাহিতেছে।

নদীর কালো জলে নৌকা ভাসিতেছে, মাঝি হাল ধরিয়া বসিয়া আছে, দাঁড়িরা গান গাহিয়া চলিয়াছে।

পিছনে কলসীর ঠুন ঠুন শব্দ শুনিয়া সে মুখ ফিরাইল, পিছনে দাঁড়াইয়া সপ্তমী।

বিস্ময়ে সে চাহিয়া দেখিল, সপ্তমী অনেক বড় হইয়া গেছে, আজ তাহাকে দেখিলে চেনা যায় না। মাঝে মাত্র দুইটা বৎসর গিয়াছে, ইহার মধ্যে সে এতবড় হইল কি করিয়া?

রাখালকে দেখিয়া সপ্তমী থতমত খাইয়া গিয়াছিল; সে ফিরিবে কি জলে নামিবে, তাহাই ভাবিতেছিল।

রাখাল ডাকিল—"কিরে সতী, তোর বুঝি আজ আমায় দেখে লজ্জা হচ্ছে?"

সপ্তমীর সুগৌর মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছিল; বাতাসে তাহার চুলগুলা এলোমেলো ভাবে মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। সে জোর

করিয়া মুখে একটুকরা হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তোমায় দেখে নাকি লজ্জা কর্‌ব ? লজ্জা আবার কিসের ।"

বলিতে বলিতে সে সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ ঠেলিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া জলে নামিয়া পড়িল ।

জল অনেক কমিয়া গিয়াছে, তীরে তাহার চিহ্ন রাখিয়া দিয়াছে। গ্রাম্য ঘাটে বালি চিক চিক করিতেছে। কাঁচের মত স্বচ্ছ জলে মাছগুলি খেলা করিতেছে, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ।

কলসী ভরিয়া লইয়া সপ্তমী উঠিতেছিল, সকৌতুকে রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "তোর নাকি বিয়ে হচ্ছে, সতী ? যাক্‌, কপালটা ভাল, বাড়ী এসেই বিয়ের নেমন্তন্নটা মিল্‌ল ।"

চলিতে গিয়া সপ্তমী হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল, কালো দুইটী চোখের দৃষ্টি রাখালের উপর নিমেষের তরে ফেলিল মাত্র, শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, কপাল ভাল বই কি, পেট ভরে নেমন্তন্নটা খেয়ে নিতে পারবে রাখালদা ।"

রাখাল হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ওই তো মস্ত লাভ হল রে, খাওয়াটা বুঝি বড় কম ? দেখনা, জগতে যত কাজই হোক আর যাই হোক, সকলের মূলে রয়েছে এই খাওয়া, তা ছাড়া আর কিছু নেই ।"

সপ্তমী উত্তর দিল না, নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল ।

এই চির চপল মেয়েটীকে আজ এত শান্ত হইতে দেখিয়া রাখালের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। বরাবর সে জানিত—যে কথাই হোক সপ্তমী কখনও নীরব থাকে না, এক কথা উঠিলে দশ কথা শুনাইয়া দেয় ।

"আচ্ছা রাখালদা, সত্যি করে বল দেখি মেয়েমানুষের নাকি বিয়ে না করা ছাড়া উপায় নেই ? আচ্ছা বল—সহরে তো অনেক মেয়েই বিয়ে না করে থাকে, পাড়াগাঁয়ে কেন তা হয় না ?"

অবাক্ হইয়া গিয়া রাখাল বলিল, "দূর, বিয়ে করে না এমন মেয়েমানুষ আবার আছে নাকি? মেয়েমানুষ হলেই তাকে বিয়ে করতে হবে, নইলে—"

বলিতে বলিতে সে হঠাৎ থামিয়া গেল, মনে পড়িয়া গেল, ইথার তো বিবাহ করে নাই, করিবেও না। সে তো সপ্তমীর চেয়ে বড় হইবে বই ছোট নয়।

সে একটু থামিয়া বলিল, "হ্যাঁ, সহরের মেয়েরা কেউ কেউ বিয়ে করে না বটে, তারা লেখাপড়া করে' জীবন কাটিয়ে দেয়; কিন্তু তাই বলে' পাড়াগাঁয়ে কি সে রকম চলে!"

জোর করিয়া সপ্তমী বলিল, "তবু তারাও তো মেয়ে রাখালদা—?"

অবহেলার ভাবে রাখাল বলিল, "তাদের সঙ্গে আর তোদের সঙ্গে কখনও মেলে কি? তারা কি রকম যদি দেখ্‌তিস তা হলে বলতে পারতিস্ নে।"

সপ্তমী আর একটী কথা বলিল না, ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ইহার পরই বাড়ী ফিরিয়া রাখাল শুনিতে পাইল সপ্তমীর বিবাহ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অবিনাশ চৌধুরীর সহিত হইতেছে।

মা সতুঃখে বলিলেন, "অভাগ্যি মেয়ে, নইলে অত রূপ, অমন গুণ থাকতে পড়তে হচ্ছে একটা তিনকেলে বুড়োর হাতে? ও বুড়োর বয়েস কি কম, আমার ঠাকুরদার বয়সী হবে।"

রাখাল অবাক হইয়া গিয়া বলিল, "অবিনাশ চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে হবে? বাপরে, সে যে মুকুলের ঠাকুরদাদা হয়।"

মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তবু তো সে আবার বিয়েও কর্‌ছে। মাগো, সাধে আর পুরুষজাতের মুখে ঝাঁটা মার্‌তে ইচ্ছে করে ইচ্ছে হয় না আর পুরুষের মুখ দেখি। এই যে মরবার বয়েসে এখন বিয়ে

করছে, ওকেও তো সেই আমাদের অবস্থায় এসে দাঁড়াতে হবে, এমনি থান পরতে হবে, জীবনের সব সাধ আহ্লাদ বিসর্জ্জন দিতে হবে। আজ বিয়ে হবে, কাল শুনতে পাব সিঁদুর মুছে, হাতের লোহা খুলে হবিষ্যি করতে বাপের বাড়ী ফিরে এসেছে। এ রকম বিয়ে দেওয়ার চেয়ে মেয়েটাকে বিষ খাইয়ে একেবারে মেরে ফেলা ভাল।"

রাখাল খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তা ওর বাপ ও-রকম লোকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে কেন?"

"দিচ্ছে কেন?" মা মলিনভাবে হাসিলেন, "উপায়ই বা কই? বয়েস তো হল এই চৌদ্দ পার হয়ে পনেরয় পা দেয়। হিঁদুর ঘরে এত বড় মেয়ে—"

রাখাল বলিল, "ওকথা বলো না মা, ওর চেয়ে কত বড় বড় মেয়ে আছে, তারা এখনও পড়্ছে, বিয়ে হয় নি।"

শিবানী বলিলেন, "সে হয় সহরে, পাড়াগাঁয়ে কি ও-রকম চলে? এ সব জায়গায় মেয়ে দশ ছাড়িয়ে এগারয় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মা বাপকে তার বিয়ের সম্বন্ধ দেখ্তে হয়। পনের বছরের মেয়ের বিয়ে না দিলে দেশের লোকে একঘরে কর্বে যে, তাকে জাতে কেউ নেবে না।"

রাখাল সবেগে বলিল, "উঃ, ভারি তো জাত তার আবার জাতে নেবে না।"

শিবানী একটু হাসিয়া বলিলেন, "ও-সবের তুই আর কি বুঝবি বল? দেশের হাল-চাল, সমাজ এ-সবের খবর পেতে তোর এখনও ঢের দেরি; ছেলেমানুষ, এখন কেবল হেসে খেলে বেড়াচ্ছিস্।"

রাখাল হাসিল, "হ্যাঁ, আমি ছেলেমানুষই বটে, আঠার উনিশ বছর বয়েস হল আমার, আজও আমি ছেলেমানুষ কি যে বল মা।"

মায়ের মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল, তিনি পূর্ণ নেত্রে রাখালের সুদীর্ঘ

শরীরের পানে তাকাইলেন, তাই বটে, আঠার বছরের ছেলে কে বলে? ঠিক তাঁহার স্বামীর মত—তেমনই লম্বা চওড়া আকৃতি, তেমনই সুন্দর মুখ, গায়েও জোর তেমনি। মনে মনে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মাতা প্রার্থনা করিলেন, আর বছরখানেকের মধ্যেই একটি বউ যেন আনতে পারি।

ইহারই কয়দিন পরে সপ্তমীর বিবাহে রাখাল নিমন্ত্রণ খাইতে গেল।

সপ্তমীর পিতার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। দুইটী পুত্র চাকরী করে, বিদেশে থাকে, দেশের সহিত কোনও সম্পর্ক নাই। জ্যেষ্ঠ বলাইদাস এখানে থাকিয়া জমীজমা দেখাশুনা করে, পিতামাতাকে সাহায্য করে, নিজের দিক্‌টার দিকে তাহার বিশেষ দৃষ্টি। এরূপ অবস্থায় বৃদ্ধ অবিনাশ চৌধুরী যে অতি সহজেই সুন্দরী সপ্তমীকে পত্নীরূপে লাভ করিতে পারিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য নাই।

বিবাহ দেখিয়া, প্রচুর পরিমাণে লুচি তরকারী সন্দেশ রসগোল্লা খাইয়া,—বাসরে খানিকটা সকলকে জ্বালাতন করিয়া, মধ্যরাত্রে রাখাল বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া তোফা একঘুমে রাত্রি কাটাইয়া দিল।

সকালে মা বলিলেন, "বিয়ে কেমন দেখলিরে রাখাল?"

রাখাল বলিল, "ভালোই দেখ্‌লুম, কিন্তু মা, বুড়ো অবিনাশ চৌধুরীর পাশে সপ্তমীকে কি রকম দেখাচ্ছিল জানো—ঠিক যেন—"

বলিতে বলিতে সে হাসিয়াই অস্থির হইল। শিবানী বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওর অদৃষ্ট, নইলে রাণীর মত রূপ যার, সে কিনা ওই ঠাকুরদার বয়সী লোকটার হাতে পড়ল। কয়দিন বা সিঁথেয় সিঁদুর ভোগ করবে? জেনে শুনে হাতে করে' মেয়েটাকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া বই আর কি?"

বেলা একটু বাড়িয়া উঠিল,—নদীর কালো জলে নৌকা ভাসিতেছিল, অশ্রুমুখী সপ্তমী স্বামীর সহিত নৌকায় গিয়া উঠিল।

সকলের সঙ্গে মিলিয়া রাখালও সপ্তমীর বিদায় দেখিতে আসিয়াছিল। দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের ফাঁকে সপ্তমীর দৃষ্টি তাহার উপর কতবার আসিয়া পড়িল, তাহা সে জানে না। যদিও তাহার জানিবার, বুঝিবার, মানুষ চিনিবার বয়স যথেষ্ট হইয়াছিল, তথাপি সে এ সকল বিষয়ে কোনদিন তাকায় নাই, বুঝিবার চেষ্টাও করে নাই।

৮

ছুটির দীর্ঘ দিনগুলো সোঁ সোঁ করিয়া ফুরাইয়া আসিল।

রাখাল ভাবে আবার তাহাকে যাইতে হইবে, তাহার প্রাণটা কেমন শিহরিয়া উঠিয়া সঙ্কুচিত হইয়া যায়। সেখানকার সেই কষ্ট, অবহেলা, আর তো সহ্য হয় না।

আচ্ছা, এখানে থাকিতে দিনগুলা এত শীঘ্র ফুরাইয়া যায় কেমন করিয়া? মামার বাড়ী থাকিতে দিনগুলা যে আসে সেগুলা কি দীর্ঘ, কিছুতেই ফুরাইতে চায় না। প্রত্যহ যখন সকাল হইত, সেই সুন্দর আলোর পানে তাকাইয়া তাহার অন্তর কোনদিনই আনন্দে ভরিয়া উঠিত না; মনে হইত, না জানি দিনটা কি অশুভবার্ত্তা বহিয়া আনিয়াছে। কোনক্রমে দিনটা কাটাইয়া রাত্রিতে সে বিছানার উপর ক্লান্ত দেহখানা এলাইয়া দিয়া ভাবিত—যাক্—একটা দিন কাটিয়া গেল, রাত্রিটা নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইবে।

মামা পত্র দিলেন রাখাল যেন আম কাঁটাল লইয়া আসে, মামী ভগিনীর বাড়ী পাঠাইবেন।

প্রথমে পত্রখানা পড়িতে পড়িতে রাখালের সমস্ত অন্তরটা জ্বলিয়া গেল, সে সবটা না পড়িয়াই পত্রখানা মায়ের কোলে ফেলিয়া দিয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, ভারি দায় পড়েছে আমার, এখান হতে পাঁচ ক্রোশ রাস্তা ইষ্টিশনে আম কাঁটাল বয়ে নিয়ে যাই, তারপর এই একবেলার রেলের পথ সেই বোঝা টানি!"

মা পত্রখানা কুড়াইয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "না হয় গোটাকতক আমই নিয়ে যাস্ রাখাল, কাঁটালের বোঝা আর বইতে হবে না। দাদা

যখন লিখেছেন, তখন একেবারে শুধু হাতে গেলে আবার যদি কিছু মনে করেন—”

জ্বলিয়া উঠিয়া বিকৃতমুখে রাখাল বলিল, “ওঃ, মনে করলেন তো আমার ভারি বয়েই গেল। তা বলে’ বল দেখি—এই পাঁচ ক্রোশ আট ক্রোশ পথ আমি হেঁটে ও বোঝা বইব কি করে? না হয় ট্রেণে করে সহজে নিয়ে যাব, কিন্তু এখান হতে যাওয়া তো বড় কম কথা নয়।”

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সে আবার পত্রখানা লইয়া পড়িল।

মামা পত্রের শেষের দিকে লিখিয়াছেন আম যদি নাও হয় অন্ততঃপক্ষে একটা খুব বড় কাঁটাল চাই-ই, তাঁহার শ্যালী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন।

আস্তে আস্তে মনের উগ্রভাব নরম হইয়া আসিতে লাগিল। মামীমার বোনের বাড়ী এই কাঁটাল যাইবে, ইথারও দেখিবে, এবং সে জানিতে পারিবে এই কাঁটাল রাখাল তাহার দেশ হইতে আনিয়াছে।

রাখাল নরম হইয়া বলিল, “যাক গে, একটা বড় দেখে কাঁটাল নিয়ে গেলেই হবে কি বল মা? মামা লিখেছেন, ওঁর শালীর বাড়ীতে দেওয়া হবে। সত্যি মা, তাঁরা বড্ড ভাললোক। সেই সেবার এসেছিলেন মামীমাদের বাড়ী, এত সুন্দর দেখতে কি বল্‌ব? মামীমার ভগ্নিপতির এক বোন এসেছিল, তার নাম ইথার, সে এত সুন্দর দেখ্‌তে তা আর তোমায় কি বলব! কিন্তু সে কলেজে পড়ে, পায়ে জুতো দেয়, চশমা পরে—”

মা শিহরিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ওমা, সেকি কথা রে, মেয়েমানুষ চশমা পরে, জুতো পরে—”

রাখাল মায়ের অজ্ঞতায় একটু করুণামিশ্রিত হাসি হাসিয়া বলিল,

"তুমি তো সহরে কখনও যাও নি মা, কি করে দেখ্‌বে বল। ওরা যে কলেজে পড়ে, ওরা পর্‌বে নাতো কি ?"

শিবানী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "কলেজে পড়্‌লেই বুঝি জুতো, চশমা পরে ? তবে ওরা খৃষ্টান বল। সেই যে সেবারে সব খৃষ্টানেরা এসেছিল না—জুতো পায়ে, বই হাতে নিয়ে, লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুর্‌ছিল, কত গান গাইলে। ওদের মন্ত্রণায় কত ছোটলোক খৃষ্টান হয়ে গেল, তারা আর সমাজে চল্‌ল না। না, তুই যেন ওসব খৃষ্টানদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা কর্‌তে যাস্‌নে রাখাল, কোনদিন কে টের পাবে আর সমাজে থাক্‌তে দেবে না।"

রাখাল মায়ের বুদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল, রাগ করিয়া বলিল, "বারে, তারা খৃষ্টান হ'ল কি করে? মামা মামী কি খৃষ্টান যে তাঁরা খৃষ্টানকে বাড়ীতে আন্‌বেন ? আমি তো দেখ্‌লুম মামীমার বোন সন্ধ্যে-আহ্নিক কর্‌লেন, আমি নিজে গঙ্গাজল এনে দিলুম।"

বলা বাহুল্য, রাখাল মায়ের মনে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য অসঙ্কোচে এমন মিথ্যা কথাটা বলিতেও এতটুকু ভাবিল না।

মা চুপ করিয়া রহিলেন।

রাখাল কাঁটালের খোঁজে বাহির হইল এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একটা বৃহৎ আকারের কাঁটাল লইয়া উপস্থিত হইল।

রাত্রে মায়ের পাশে বিছানায় শুইয়া রাখালের মনে হইতেছিল, কাল এতক্ষণ সে কোথায় থাকিবে ? মনে করিতেও যেন চোখে জল আসিয়া পড়িল।

মা তাহার পার্শ্বে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "হ্যাঁরে, কাল সকালের গাড়ীতে না গিয়ে দুপুরের গাড়ীতে গেলে কি হয় ?"

রাখাল বলিল, "দুপুরে যে ভয়ানক রোদ, অত রোদে এই ভারি

কাঁটাল নিয়ে এই পথ হাঁট্‌ব কি করে? সকালে বেণেদের গাড়ী ইষ্টিশনে যাবে, ওদের গাড়ীতে তবু যেতে পার্‌ব।"

মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যাতে সুবিধে হয় তবে তাই করিস্ বাবা।"

রাতটা কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়া গেল; সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিতেই ভোরের আলো চোখে পড়িল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রাখাল ভাবিল, আজ এখনই তাহাকে যাইতে হইবে।

মা আগেই উঠিয়া গিয়া তাহার যাত্রার উদ্যোগ করিয়া দিতেছেন। রাখাল তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইল।

অনুগত ছেলেগুলি সবাই আসিয়া জুটিয়াছিল। কাঁটাল ষ্টেশনে লইয়া যাইবার লোকের ভাবনা হইল না।

মা গ্রাম্য দেবীর পূজার নির্ম্মাল্য পুত্রের কোঁচার খুঁটে সযত্নে বাঁধিয়া দিতে দিতে বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন, "গিয়েই পত্র দিস্ রাখাল, শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিস্। যে রকম আপনভোলা ছেলে তুই তাতে আমার মনে সর্ব্বদা ভয় হয়, কে জানে কখন কি করে বস্‌বি তার ঠিক নেই। আমার মাথা খাস্ রাখাল, ঝোঁকের মুখে যেন যা তা কর্‌তে যাস্‌নে কোন দিন, যা কর্‌বি ভেবে চিন্তে ভবিষ্যৎ বুঝে করিস।"

মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া, গিয়াই পত্র দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সাশ্রুনয়নে রাখাল বিদায় লইল।

৯

দিনের পর দিন কাটিয়া যায়। মাসের পর মাস কাটিতে লাগিল। বর্ষা এবার প্রথমে নামে নাই, শ্রাবণের শেষে ভীষণ ভাবে নামিল। তাহাতে কেবল যে পথ ঘাট কর্দ্দমাক্ত হইল, শীর্ণা নদী ভরিয়া উঠিল, তাহা নহে; দরিদ্রের জীর্ণ চালা ভেদ করিয়া ঝর ঝর করিয়া গৃহমধ্য প্লাবিত করিতে লাগিল।

শিবানী আর গৃহে বাস করিতে পারেন না, দিনে তবু একরকম ভাবে কাটিয়া যায়, রাত্রে হয় বড় মুস্কিল। মেঝের বিছানা পাতার জায়গাটুকু আজ যে কোণ আশ্রয় করেন, কাল সে কোণ ছাড়িয়া দিতে হয়।

আজ কয় বৎসর চালে নূতন খড় পড়ে নাই, চালের আর অপরাধ কি, অথচ বর্ষা তো প্রতি বছরই আছে।

শিবানী কোন দিকে চাহিয়া কূল পান না। যজ্ঞেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, চালের যে যে স্থানে খড় নষ্ট হইয়া গিয়াছে সেই সব স্থানে নূতন খড় দিলে এ বৎসরটা কোনক্রমে ঘরখানি টিঁকিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাতে অন্ততঃপক্ষে টাকা পাঁচ সাত খরচ পড়িবে।

পাঁচ সাত পয়সাই হাতে থাকে না, তা পাঁচ সাত টাকা। সুতা কাটিয়া, পরের বাড়ী ধান ভানিয়া দিয়া, ঘোষেদের বাড়ী পূজার যোগাড় নিত্য করিয়া দিয়া মাসে যাহা কিছু পান তাহাতে অতি কষ্টে ভরণ পোষণই চলে মাত্র। বিশেষ নিত্য অসুখ বিশুখ তো আছেই,—সমস্ত বর্ষাটাই প্রায় জ্বরে কাটে, যে কয়টা দিন ভাল থাকেন তাহাতে কাজ করিবেন কত?

মনে পড়িল, রত্না বাগ্দীর নিকটে তের আনা পাওনা আছে, ঘোষ

গিন্নীর কাছে দুই মাসের পূজার যোগাড় করার দরুণ দেড়টাকা পাওনা আছে, আর যদি কিছু ধার করা যায় তাহা হইলে কোনক্রমে এ বৎসর ঘরখানাকে বাঁচাইতে পারা যায়। কোনক্রমে বৎসর দুই টানাটানি করিয়া চলাইতে পারিলে হয়, ইহার মধ্যে রাখালের পড়া শেষ হইয়া যাইবে। সে বলিয়া গেছে কত লোকে তাহাকে কাজ দিতে চায়, পড়াটা শেষ করিয়া সে কাজে লাগিলে আর ভাবনা কি?

আশার স্বপ্ন মায়ের মনে মোহময় জাল ছড়াইয়া দিল। তিনি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার গৃহ নূতন হইয়া উঠিয়াছে। রাখাল বড় চাকরী করে, বাড়ীতে কোঠা ঘর তুলিয়াছে, বিবাহ হইয়াছে; ছোট্ট বউটি রাঙা পা দু'খানি আলতায় রঞ্জিত করিয়া এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

কতকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জননী জাগিয়া উঠিলেন। না, সুখের স্বপ্ন এখন থাক, আগে কোনক্রমে ঘরখানা বাঁচানো চাই।

কিন্তু পাওনা গণ্ডাও কেহ এ জগতে দিতে চায় না। রত্না বাগ্দী জানাইল, হাতে এখন তাহার একপয়সাও নাই, মাস খানেক পরে ভিন্ন সে কিছুই দিতে পারিবে না। ঘোষ গৃহিণী বলিলেন, "ছেলে আগে খরচ পাঠাক তবে তো দেব, বাছা, খরচ তো কেউ হাতে করে বসে নেই।"

মুখ অন্ধকার করিয়াই শিবানী ফিরিলেন।

রাখালের পত্র আসিল; সে জানাইয়াছে, সে ভাল আছে। এবার পূজায় যে সে বাড়ী আসিতে পারিবে না, তাহা আগেই জানাইয়া রাখিয়াছে। মামা বলিয়াছেন এবার নিজে তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া বায়স্কোপ থিয়েটার দেখাইবেন।

শিবানী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

সে দিন হঠাৎ ঘাটে দেখা হইয়া গেল সপ্তমীর সঙ্গে। পিতার অসুখ, সেই জন্য সে কয়েকদিনের জন্য পিত্রালয়ে আসিয়াছে।

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া শিবানী তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন। এ যেন সে সপ্তমী নয়, মাত্র তিনমাসে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে। সে যেন মাথায় অনেকটা লম্বা হইয়া গিয়াছে, বেশ মোটাও হইয়াছে। তাহার গাত্রবর্ণ আরও উজ্জ্বল হইয়াছে, তাহাকে আরও সুন্দর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত গায়ে গহনা, সিঁথায় সিন্দূর জ্বলজ্বল করিতেছে।

সপ্তমী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, আশীর্ব্বাদ করিয়া শিবানী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছিস্ তো সতী, কার সঙ্গে এলি, ক'দিন থাকৃবি ?"

সপ্তমীর মুখে যে হাসিটুকু ভাসিয়া উঠিল তাহা যে কতখানি করুণ তাহা শিবানী বুঝিতে পারিলেন না।

তাহার পর সে কত কথা! সপ্তমীর শ্বশুরালয় মস্ত বড় প্রাসাদ, তিনতালা বাড়ী, অগণ্য ঘর তাহাতে। স্বামীর তিন পুত্র, চার পাঁচটী কন্যা, নাতি নাতনী ; আর বাড়ীতে কত আত্মীয় স্বজন, দাস দাসী।

শিবানী সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোকে সেখানে তা হলে কোন কাজই করতে হয় না ?"

সপ্তমী মাথা নাড়িল, "কোন কাজ করতে হয় না। আমার একটা ঝি আছে সেই সব করে' দেয়, নিজের পরণের কাপড়খানি পর্য্যন্ত কাচ্‌তে দেয় না, অন্য কাজ ত দূরের কথা।"

শিবানী খুসী হইয়া বলিলেন, "সুখী হয়ে থাক মা, প্রাতর্বাক্যে এই আশীর্ব্বাদ করি। সিঁথার সিন্দুর অক্ষয় থাক, হাতের লোহা ক্ষয়ে যাক—"

সপ্তমী হাসিল, একবার নিজের বামহস্ত খানা তুলিয়া লোহার পানে তাকাইল মাত্র।

কাপড় কাচিতে কাচিতে শিবানী বলিলেন, "হ্যাঁরে সতী, সেই সব নাতি নাতনীরা তোকে কি বলে ডাকে?"

শিবানী বলিল, "তা বেশ ডাকে, ঠাকুর-মা বলে।"

শিবানী বলিলেন, "তুই উত্তর দিস্?"

সপ্তমী হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তা দেই বই কি? আগে বড্ড লজ্জা হতো কাকী মা; এখন আর লজ্জা হয় না, সয়ে গেছে কিনা।"

দুপুরে বেড়াইতে আসিবে বলিয়া সপ্তমী চলিয়া গেল।

বেণেদের মেয়ে ললিতা মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "বাবাঃ, অহঙ্কারে মাটীতে আর পা দেয় না। একটু লজ্জাও করলে না শ্বশুর বাড়ীর কথা, এমনি করে বল্‌তে, আমরা হলে লজ্জায় মরে 'যেতুম।"

বীণা কাপড়ে সাবান দিতেছিল, বলিল, "কোন কালেই বা ওর লজ্জা আছে? চিরদিনই ও নাক কান-কাটা, আজ নতুন করে' ওর লজ্জা হবে নাকি?"

ললিতা বলিল, "তা হোক, তবু শ্বশুর বাড়ীর কথা তো, লজ্জা পাওয়ার বই কি। কি বল কাকীমা, একেবারে অত বেহায়া হওয়া বুঝি ভাল?"

ভালমানুষ শিবানী এই প্রশ্নে বিব্রত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন, "কে জানে মা, লজ্জা যার যা তা নিজের, পরে কি লজ্জা করিয়ে দিতে পারে?"

দুপুরে আহারাদির পর শিবানী পৈতা কাটিতেছিলেন, সেই সময়ে সপ্তমী আসিয়া পড়িল।

"ওমা, ঘরের এই দুরবস্থা হয়েছে, এ ঘরে থাক কি করে কাকীমা? মাগো, এ যে চারদিক আলগা, একটা খড় নেই! হ্যাঁ কাকীমা, ঘরে জল পড়ে না?"

শিবানী সূতা কাটা স্থগিত করিয়া একবার জীর্ণ চালের পানে তাকাইলেন, শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন "পড়লেই বা করছি কি বল দেখি ?"

সপ্তমী বলিল, "তা চালখানা সারিয়ে নাও।"

শিবানী বলিলেন, "সারাতে টাকার দরকার তো, পাই কোথায় ? এখন কোনরকমে গোঁজামিল দিয়ে রাখতে পার্‌লে বছর দুই চলত, তার মধ্যে রাখাল পড়া শেষ করে' একটা চাকরী নিলে ঘর ছাইতে দেরী হতো না। তা এমনি পোড়া কপাল, কয়টা টাকা ধার করতে গেলুম, মিলল না। যা কিছু লোকের কাছে পাব তাও তারা দিচ্ছে না।"

সপ্তমী একটু ভাবিয়া বলিল, "টাকা ধারও পেলে না ?"

শিবানী বলিলেন, "সবারই অবস্থা সমান তো, ধার দেবে কে ?"

সপ্তমী খানিক চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "কতগুলো টাকার দরকার হবে ?"

হাসিয়া উঠিয়া শিবানী বলিলেন, "কতগুলো জান্‌লে তুই দিবি নাকি সতী ?"

আকর্ষণ

গম্ভীর ভাবে সপ্তমী বলিল, "যদি দেই ?"

শেষ দৃষ্টি

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া শিবানী বলিলেন, "তুই দিবি ? পাবি কো

সপ্তমী বলিল, "সে যেখানেই পাই না কেন, তা নিয়ে তোমার ভাবনা হবে না কাকীমা ; মোট কথা এই, তুমি টাকা ধার পাচ্ছ না, আমি তোমাই ধার দেব, এর পর তোমার সময় এলে তুমি আমার টাকা দিয়ে দিয়ো।"

শিবানী বলিলেন, "যজ্ঞেশ্বর ঘরামী বলেছিল টাকা পাঁচ ছয়ের মধ্যে হয়ে যাবে।"

সপ্তমী বলিল, "আমি তোমায় দশটা টাকা ধার দেব এখন, বিকেলে নিয়ে আস্‌ব। তুমি কালই খড় কিনে ঘরের চালা ছাইতে আরম্ভ করে' দাও ; আর দেরী করালে যা আছে তাও থাকবে না।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "রাখাল দা পূজোর ছুটিতে বাড়ী আস্‌বে না কাকীমা? এলে একবার আমাদের ওখানে পাঠিয়ে দিয়ো না কেন? নৌকোয় একবেলার পথ বই তো নয়। আর আমাদের মুকুলের সঙ্গে রাখালদার তো খুবই ভাব আছে, তবে আর যেতে কি? আমাদের বাড়ীতে পূজো হয়, ছেলেরা সব বাড়ী আসে—"

বিষণ্ণ ভাবে শিবানী বলিলেন, "পূজোর ছুটিতে সে আস্‌বে না, লিখেছে। কলকাতায় যাবে ঠিক করেছে, বায়স্কোপ থিয়েটার দেখ্‌বে—"

মায়ের বক্ষভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। ছেলেরা এমনই স্বার্থপর বটে; মা কতখানি আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া তাহাদের প্রতীক্ষা করেন; তাহা তাহারা একবার ভাবিয়াও দেখে না!

সপ্তমী খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "বাপ্‌ রে, ছুটিতে মায়ের কাছে আসার চেয়ে বায়স্কোপ থিয়েটার দেখা বড় হল বুঝি?"

আছে? ী উত্তর দিতে পারিলেন না।

হবে নাকি়ে সপ্তমী একখানি দশ টাকার নোট আনিয়া দিয়া গেল।

ললিভাবে শিবানী বলিলেন, "তুই তো দিচ্ছিস মা, ভগবান জানেন বই ফিরতে পার্‌ব কিনা?"

সপ্তমী একটু হাসিয়া বলিল, "ভারি তো দশটা টাকা, যদি নাই দিতে প্পার তাতে আমার গায়ে বাজ্‌বে না।"

রাখাল হঠাৎ একটী বন্ধু পাইয়া গেল। সে এতদিন এত ছেলের সহিত মিশিয়াছে, ঠিক নিজের আদর্শ কাহারও মধ্যে খুঁজিয়া পায় নাই ; দেবানন্দকে দেখিয়া, তাহার পরিচয় পাইয়া সে একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেল।

দেবানন্দ এতকাল মুঙ্গেরে ছিল, বাংলার সহিত তাহার পরিচয় এতকাল ছিল না। তাহার স্বভাব বাংলার শান্ত-প্রকৃতির ছেলেদের সহিত মোটেই মিলে না, সে যেন একটা ঝড়ো হাওয়া, যাহার উপর দিয়া যাইবে তাহাই বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া যাইবে।

সে আসিয়া স্কুলে ফার্ষ্টক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছিল। স্কুলে সে খুব কম দিনই উপস্থিত হইত, মাসে অর্দ্ধেক দিন আসাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

শীঘ্রই সে স্কুলের ছেলেদের এমন কি মাষ্টারদের পর্য্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। হেডমাষ্টার প্রমথবাবু পর্য্যন্ত এই ছেলেটীর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিলেন।

অনতিবিলম্বে এই ছেলেটী গ্রামের ছোট বড় সকলের কাছে নামজাদা হইয়া উঠিল। কাহারও অন্যায় সে সহিতে পারিত না, এবং এই জন্যই প্রকাশ্য বাজারে একদিন গ্রামের প্রবীণ নেতা রামজয় চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাহার দারুণ বিবাদ হইয়া গেল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্যহই বাজারে আসিয়া দুই পয়সার জিনিস এক পয়সায় গ্রহণ করিতেন, এবং ফাউ হিসাবে আর দুই পয়সার জিনিস নিজহাতে তুলিয়া লইতেন। বেচারা বিক্রেতা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও তাঁহার হাত হইতে নিস্তার পাইত না।

সে দিন দেবানন্দের সম্মুখে এরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। এই বিক্রেতাটী ভিন্ন গ্রামের লোক, প্রত্যহ সে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা উৎপীড়িত হয়। এ-দিন সে তাঁহার হাত হইতে তাহার নিজের জিনিস লইয়াছিল, বিক্রয় করিতে চায় নাই, এই তাহার অপরাধ। এই অপরাধে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রাগিয়া আগুন হইলেন, ছোটলোক হইয়া সে ভদ্র-লোকের হাত হইতে জিনিস কাড়িয়া লয়, এই স্পর্দ্ধার জন্য তাহাকে দুইটা চড়ও বসাইয়া দিলেন।- বাজারস্থ সকল ভদ্রলোক তাঁহার পক্ষ লইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিয়া দিলেন।

দেবানন্দ এ অন্যায় সহিতে পারে নাই। কয়েকটী স্কুলের ছেলে তাহার পক্ষ লইয়া দরিদ্র বিক্রেতার দিকে দাঁড়াইয়া গেল, ইহার মধ্যে রাখালও ছিল একজন। তাহার বুকের মধ্যে তরুণ রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছিল, সে জামার আস্তিন গুটাইয়া দলপতির আদেশের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিল।

সমস্ত বাজারটী চঞ্চল হইয়া উঠিল বড় কম নয়। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রণে ভঙ্গ দিলেন, নায়কবিহীন দলও শীঘ্র ছড়াইয়া পড়িল। বিজিত দেবানন্দের দল 'হুর-রে, হুর-রে' শব্দে বাজার ও চারিদিক্‌কার অনেকখানি জায়গা ভরাইয়া ফেলিল।

অনেক বেলায় সম্পূর্ণ রিক্ত হস্তে রাখাল যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল তখন মামীমা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, শুধু হাতে ফিরে এলি যে, তরকারী মাছ কই?"

রাখাল পয়সাগুলা তাঁহার সামনে রাখিয়া উত্তর দিল, "আজ বাজার হয় নি, কিছু পাওয়া গেল না।"

মামীমা একেবারে তারস্বরে চেঁচাইয়া উঠিলেন, "না, বাজারে নাকি কিছু পাওয়া যায় নি, বাজার নাকি বসে নি? ওসব কথা রাখ্‌ রাখ্‌লা,

বাজার কর্‌বার নাম করে কোন চুলোয় বসে ইয়ারকি করছিলি তাই বল। আজ কি গিণ্ডি গিল্‌বি, শুধু ভাত দেব তাই খাস্।”

রাখাল উত্তর মাত্র না দিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। মামীমা আজ যাহাই বলুন, কিছুই তাহার গায়ে বাজিতেছিল না ; তাহার সমস্ত হৃদয়টা দেবানন্দের অদ্ভুত সাহস ও বীরত্বের প্রভাবে পূর্ণ প্রভাবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। সত্যই কি সাহসী ছেলে সে, একলা অতগুলা লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সে এতটুকু ভয় পায় নাই। রাখাল নিত্য এইরূপ কত অত্যাচার দেখিয়া যায়, নিজেও তো বড় কম লাঞ্ছনা অত্যাচার সয় না ; কিন্তু তাহার সে অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস কই ! সে নীরবে সব সহিয়াই যায়, একদিন একটা কথাও তো বলিতে পারে না !

নরেশ আসিয়া জানাইল, বাজারে আজ ভীষণ মারামারি হইয়া গিয়াছে, দেবানন্দ ও রাখাল দুইজনে মিলিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এমন প্রহার করিয়াছে, যে তিনি একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছেন।

মামীমা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, “ওমা তুই বলিস্ কি রে নরু, ওই দুটো ছোঁড়া বুড়ো চাটুয্যেকে মার্‌লে ?”

নরেশ বলিল, “এতদিন একজন ছিল, এবার দুটো খুনে ডাকাত এক হয়েছে ; দেখ না, এখন ও কত কাণ্ড করে। কোনদিন আমায় না গলা টিপে মারে,—!”

মামীমা বলিয়া উঠিলেন, “ষাট্ ষাট্, তোকে মার্‌বে কেন, তুই ওদের কি করেছিস ?”

নরেশ মুখ বাঁকাইয়া বলিল, “কি করেছি তা ওরাই জানে। পড়াশুনায় আমি ভাল বলে ওরা আমায় দেখ্‌তে পারে না। দেবানন্দ প্রায়

মুখের ওপরই ঠাট্টা করে' বলে হেডমাষ্টার মশাই আমায় নাকি পোষ্যপুত্র নেবেন, আর আমার কোন ভাবনা নেই!"

জ্বলিয়া উঠিয়া মামীমা বলিলেন, "আ মর্, ছোঁড়া কোন চুলো থেকে হাড় জ্বালাতে এদেশে এলো? হ্যাঁরে, তোকে এত কথা বলে, তুই একটা কথা ওকে বল্‌তে পারিস্ নে?"

নরেশ বলিল, "হ্যাঁ, বল্‌তে গিয়ে মার খেয়ে মরি আর কি! এই ঠাকুরদার বয়সী লোকটা'কে মেরে শয্যাশায়ি ক'র্‌লে, আমায় ওরা আস্ত রাখবে কিনা!"

মামীমা ভাবিয়া দেখিলেন, কথাটা অযথার্থ নয়। দেবানন্দ বা রাখালের মত শক্তি পাইতে তাঁহার পুত্রকে আরও কত জন্ম সাধনা করিতে হইবে কে জানে? অথচ তিনি ছেলে মেয়েদের খাওয়ান তো বড় কম নয়, তথাপি তাহারা পুষ্ট হয় না; কিন্তু রাখাল কেবল মাত্র ডাল ভাত খাইয়া দিন দিন যেন হাতীর মত শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে, গায়ের রংও দিন দিন ফুটিতেছে।

সে দিন বাজারে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার জের স্কুল পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছাইল।

পরদিন স্কুলে যাইতেই, ক্লাসের হরিশ সংবাদ দিল—হেডমাষ্টার মহাশয় রাখালকে ডাকিয়াছেন।

দেবানন্দ স্কুলে আসে নাই। স্কুলে সে প্রায়ই আসে না, খুসি মত এক আধদিন আসিয়া থাকে।

রাখাল মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, বলিল, "একটু পরে যাব এখন, ফার্ষ্ট পিরীয়ডের পড়াটা আগে হয়ে যাক।"

শিক্ষক তারানাথবাবু ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "পড়া থাক্, যাও, আগে শুনে এসো হেডমাষ্টার কি বলতে চান।"

রাখাল উঠিয়া ধীরে ধীরে হেডমাষ্টারের অফিস-রুমে চলিল।

প্রমথবাবু প্রায় বাইশ বৎসর এই স্কুলেই কাজ করিতেছেন। বয়স অনেক হইয়াছে, মাথার চুল সব সাদা হইয়া গিয়াছে, গাত্রচর্ম্ম কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। তিনি বড় গম্ভীর ও কঠোর প্রকৃতির শিক্ষক ছিলেন, স্কুলের এতটুকু ত্রুটি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার শিক্ষায় কত ছেলে শিক্ষিত হইয়া আজ মানুষ হইয়া গিয়াছে, তিনি আজও এই স্কুলেই রহিয়াছেন।

দরজার পর্দ্দাটা নড়িবামাত্র তাহার দিকে প্রমথবাবুর দৃষ্টি পড়িল, কঠোর কণ্ঠে গম্ভীর মুখে তিনি ডাকিলেন, "এ-দিকে এসো, রাখাল।"

রাখাল প্রবেশ করিয়া দরজার পাশটীতে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রমথবাবু নিষ্পলকে খানিকক্ষণ তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন। রাখাল নতমুখে দাঁড়াইয়াছিল, হেডমাষ্টারের তীব্র দৃষ্টি সে বেশ অনুভব করিতেছিল; সে দৃষ্টি যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে দারুণ জ্বালা ধরাইয়া দিতেছিল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়াও যখন হেডমাষ্টার মহাশয়ের মুখে কোন কথা শুনিতে পাওয়া গেল না, তখন সে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল; সাহসের উপর নির্ভর করিয়া ডাকিল—"স্যার—"

হেডমাষ্টার মহাশয় মুখ তুলিয়া তাকাইলেন।

রাখাল বলিল, "আমায় কি জন্যে ডেকেছেন—"

সে থামিয়া গেল; গম্ভীর প্রকৃতি হেডমাষ্টার একখানি পত্র তাহার দিকে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "পড়—"

রাখাল পত্র কুড়াইয়া লইল।

কাল বাজারে যে কাণ্ড হইয়া গিয়াছে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহা হেডমাষ্টারকে জানাইয়াছেন। স্কুলের দুইটী ছেলে দেবানন্দ ও রাখালের

নামোল্লেখ তিনি করিয়াছেন; সুধীর, হরেন, নিমাই—এ তিনজন যে তাহাদের সঙ্গে ছিল তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই।

গর্জ্জিয়া উঠিয়া প্রমথবাবু বলিলেন, "এ সব কি ব্যাপার! তোমরা এতটুকু ছেলে, কোথায় তোমরাই প্রবীণ লোকদের প্রেষ্টিজ্ রক্ষা ক'রে চল্‌বে, তা না করে' বাজারে প্রকাশ্য স্থানে তোমরাই তাঁদের অসম্মান কর? এ অপরাধের শাস্তি কি জানো,—স্কুল হতে বার করে দেওয়া, রাষ্টিকেট করা। আমি—"

কম্পিত কণ্ঠে রাখাল বলিল, "কিন্তু স্যার, তিনি একজন দরিদ্র লোককে মেরেছিলেন—"

"চুপ্ চুপ্—" হেডমাষ্টার সিংহের মত গর্জ্জন করিলেন, "আমার মুখের ওপর কথা বলতে যাচ্ছ তোমার এত সাহস? শোন রাখাল, এ পর্য্যন্ত তোমার নামে অনেক নালিস শুনে আস্‌ছি, এতদিন উড়িয়ে দিয়েছিলুম; কিন্তু দেখ্‌ছি তুমি ক্রমেই বাড়িয়ে তুলেছ। আমি তোমায় এবার সাবধান করে' দিচ্ছি, আর যেন আমায় কোন লোকের কাছ হতে আমার স্কুলের ছাত্ররূপে তোমার নামে নালিশ না শুন্‌তে হয়। আবার যদি শুনি, তোমায় সেদিন রাষ্টিকেট কর্‌ব। যাও এখন,—আর কোন কথা নয়, আমায় বিরক্ত করো না, আমার কাজ আছে।"

অনেক কথা বলিবার মত থাকিলেও, রাখাল একটী কথা বলিতে পারিল না; নীরবে মাথা নত করিয়া অফিস-রুমের বাহিরে আসিল।

ছেলেরা তাহার দিকে সোৎসুক নেত্রে তাকাইল—কি ব্যাপার ঘটিল তাহা জানিবার কৌতূহল সকলের মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল, টিফিন আওয়ারের প্রত্যাশায় তাহারা রহিয়া গেল।

১১

রাখাল একটা কথা না বলিলেও, কেমন করিয়া চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল—সে হেডমাষ্টারের কাছে দারুণ অপমানিত হইয়াছে।

কালো মুখ সে আর কাহাকেও দেখাইতে পারিতেছিল না। মামীমা কাজের জন্য অনেক ডাকিয়াও তাহার সাড়া পাইলেন না, রাগ করিয়া তিনি তাহার খাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে এই হুকুম দিলেন, সে যদি দেবানন্দের সহিত আর মিশে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ দূর করিয়া দিবেন।

রাত্রি কাটিয়া গেল, দিন আসিল, রাখাল ঘরের বাহির হইল না।

রমা একবার একখানা রুটি আনিয়া জানালা পথে দিয়া গিয়াছিল, সেই রুটিখানা খাইয়া সে সারাদিন কাটাইল।

কোন দিন নরেশ স্কুলে যাইবার সময়ে তাহাকে ডাকে না, আজ সে তাহাকে ডাকিতেছিল। মামীমা উপরের বারাণ্ডা হইতে চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "তুই চলে' যা নরেশ, ওর জন্যে তোর অত মাথা ব্যথা কেন? না যায় নাই যাবে, তোর তাতে কি?"

রাগে অভিমানে অপমানে রাখালের হৃদয় শতধা হইয়া যাইতেছিল; সে বিছানা আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিল।

সমস্ত দিনটা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময়ে রমার ভয়ত্রস্ত আহ্বান বন্ধ দুয়ারের কাছে শুনা গেল, "দাদা—"

সারা চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিলেও রাখাল সাড়া দিল না, কাঁদিয়া রমা চলিয়া গেল।

দ্বাদশ বর্ষীয় বালক সুরেশ কয়েকবার দরজায় আঘাত দিয়া শেষে

বলিয়া গেল, "উঃ, বাবুর রাগ দেখ একবার। থাক না, মা বলেছে— কয়দিন না খেয়ে থাকতে পার, দেখা যাবে।"

উদর বড় বেশী রকম জ্বলিতেছিল, তাহার উপর এই কথাগুলা তাহার মাথাকেও জ্বালাইয়া দিল, তবু রাখাল কথা বলিল না।

বাহিরে অন্ধকার হওয়ার আগেই রুদ্ধ গৃহ অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া গেল। বাহিরের পথ নিস্তব্ধ হইল, পাশের বাগানে গোটাকতক শৃগাল চীৎকার করিয়া গেল।

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। বাড়ীর সকলে ঘুমাইয়া পড়িল, রাখালের চোখে ঘুম নাই। সারাদিন ঘুমাইয়া সে সন্ধ্যাবেলা জাগিয়াছে, ক্ষুধায় সমস্ত দেহ অবশ হইয়া আসিতেছে।

চোখে জল আসিতেছিল। রাখাল প্রতিজ্ঞা করিল, আর সে পড়িবে না, আর এখানে থাকিবে না, সে কাল সকালেই নিজের জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া বাড়ী রওনা হইবে। মাকে এবার সে সব কথাই বলিবে, মিথ্যা কতকগুলা কথা বলিয়া মাকে আনন্দিত করিতে পারিবে না।

আম বাগানের মধ্যে কে শীষ দিয়া উঠিল। রাখাল চমকিয়া উঠিল। দেবানন্দ আসিয়াছে,—এই শীষই তাহার সঙ্কেত।

তথাপি সে নীরবে রহিল, শীষের সাড়া দিল না।

ক্ষণপরে জানালায় আসিয়া কে আঘাত দিল, ডাকিল, "রাখাল—"

রাখাল দরজা খুলিয়া বাহির হইল, সম্মুখে দেবানন্দ।

বিস্ময়ে সে বলিল, "সর্ব্বনাশ, এত রাত্রে—?"

দেবানন্দ বলিল, "তোকে কাল বলেছিলুম না, আজ শিমূলপুরে রসিক চক্রবর্ত্তীর যাত্রা হবে ; নে, চল, আর দেরী করিস্ নে।"

রাখাল সেই অন্ধকারে মাথা নাড়িল।

দেবানন্দ বলিল, "যাবি নে ?"

শুষ্ককণ্ঠে রাখাল বলিল, "আমার আজ খাওয়া হয় নি।"

মুহূর্ত্তে দেবানন্দ যেন সচেতন হইয়া উঠিল, "খাস্ নি? ওরা তোকে খেতে দেয় নি বুঝি?"

রাখাল বলিল, "না, আমার খাওয়া বন্ধ।"

দেবানন্দ খানিক চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর সবেগে বলিয়া উঠিল, "ওরা খেতে দিলে না বলে তুই চুপ করে থাক্‌বি রাখাল, নিজে জোর ক'রে কেড়ে খেতে পারবি নে? এখন কি আর সেই দিন আছে যে কেউ খেতে না দিলে উপোস করে কেউ থাক্‌বে? যেমন করে হোক, জোর করে' কেড়ে নিয়েও খেতে হবে, বাঁচতে হবে। সেই তিলে তিলে আত্মহত্যার যুগ এখন কেটে গেছে, এখন বাঁচতে হবে, বেঁচে থাকবার জন্যে খুন, চুরি, ডাকাতি—যাই হোক না—করতে হবে। চল্ আমার সঙ্গে- রাম ময়রার দোকান খোলা আছে, সেখানে খাবি চল।"

রাখাল দুই পা অগ্রসর হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, "না, আমি চুরি বা ডাকাতি করা ঘৃণা করি, আমি যাব না।"

তাহার পিঠের উপর একখানা হাত রাখিয়া দেবানন্দ শান্ত কণ্ঠে বলিল, "ভয় নেই, আমি পয়সা দিয়ে তোকে খাওয়াব। এই দেখ আমার কাছে টাকা আছে।"

পকেট হইতে সে টাকা বাহির করিল, অন্ধকারেও রাখাল টাকা দেখিতে পাইল। সে আর দ্বিরুক্তি করিল না; প্রবল ক্ষুধায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখন কাঁপিতেছিল।

রাত্রি এগারটা হইলেও ময়রার দোকান তখনও খোলা ছিল। রাম তখন সবেমাত্র উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল, খরিদ্দার পাইয়া বসিল।

রাখালকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দেবানন্দ ময়রার পয়সা মিটাইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "চল্ এবার।"

রাখাল বলিল, "আমি যাত্রা শুন্‌তে যাব না ভাই, আমার মন আজ ভারি খারাপ হয়ে গেছে, যাত্রা ভালও লাগ্‌বে না।"

দেবানন্দ বলিল, "তা আমি জানি। চল, নদীর ধারে গিয়ে খানিকটা বসা যাক।"

বর্ষার নদী কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়া গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়াছে। নদীর দুই পার শান্ত, নিস্তব্ধ; তীরে নির্ব্বাক্ ভাবে গাছগুলা দাঁড়াইয়া নদীর পানে তাকাইয়া তাহার বিচিত্র লীলা দর্শন করিতেছে।

ঘাটের পাশে একখানা কাঠের উপর উভয়ে বসিল। দেবানন্দ এতক্ষণ নির্ব্বাক্ ছিল, এইবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি ভাব্‌ছিস বল দেখি?"

রাখাল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি বাড়ী চলে' যাব কাল, আর এখানে থাক্‌ব না।"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া দেবানন্দ বলিল, "একেবারে বাড়ী চলে যাবি? এমন কি কারণ ঘট্‌ল যাতে তুই আর এখানে থাকতে পার্‌বি নে?"

রাখাল বলিল, "লোকের কাছে মুখ দেখাতে পার্‌ছি নে, সকল লোকে ঠাট্টা করছে, তার পরে পরশু শনিবারে মামা যখন বাড়ী আস্‌বেন—"

হো হো করিয়া হাসিয়া দেবানন্দ বলিল, "বাপ্ রে, মামাকে তুই কি ভয়ই করিস্ রাখাল, আমি কিন্তু জগতে কাউকে ভয় করি নে। মামা তোর কি করবে বল দেখি, না হয় বড় জোর দুটো গালাগালিই দেবে, কেটে মেরে তো ফেল্‌তে পার্‌বে না। আর তুই কি অন্যায় কাজ করেছিস্? আমায় যদি কেউ বলে, কেন এ কাজ করেছ; আমি বল্‌ব —আমি যে কাজ করেছি এ কাজ আবার কর্‌ব, একশ বার কর্‌ব, হাজার বার কর্‌ব। তুই ঘাব্‌ড়াচ্ছিস্ কেন রাখাল, বুক ফুলিয়ে দাঁড়া দেখি, দেখবি সব কেঁচো হয়ে যাবে, কেউ আর ফণা তুল্‌তে পার্‌বে না।"

রাখাল উত্তর দিল না, বিষণ্ণ ভাবে সম্মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

দেবানন্দ বলিল, "তুই বল্‌ছিস মুখ দেখাতে পারবি নে, কেন কি হয়েছে? আমার কথা শোন, লেখাপড়া না হয় নাই কর্‌বি, ইস্কুল ছেড়ে দে; আর না গেলেই ওরা নাম কাটিয়ে দেবে। তা বলে' যা সত্যি তা কর্‌তে ভয় পাবি কেন?"

রাখাল বলিল, "ইস্কুলে তো যাবই না, কিন্তু এখানেও থাকা হবে না; আমায় কাল সকালে যেতে হবেই।"

দেবানন্দ বলিল, "বলেছিলি যে কলকাতায় যাবি, তবে তাই চল্।"

রাখাল বলিল, "কলকাতাটা দেখবার ইচ্ছে ছিল, তা সে আর আমার কপালে হবে না, থাক, এর পরে—"

দেবানন্দ বলিল, "এর পরে আর কেন? কাল সকালে বাড়ী যাবি বল্‌ছিলি, তার চেয়ে চল কাল ভোরের ট্রেণে আমরা কলকাতায় চলে যাই। আমারও তো সংসারে কেউ নেই। দিদি আছে বটে, দাদাবাবু বড় খিটখিট করে, ইস্কুলে পড়ি তার মাইনে পর্য্যন্ত দিতে চায় না; দিদি দেয় বলে' দিদিকে অনেক গঞ্জনা দেয়। এ রকম ভাবে এখানে পড়ে' থাকার চেয়ে চল দুজনে কলকাতায় যাই, সেখানে গিয়ে যা হোক কাজ যোগাড় করে' নিতে পারব।"

কথাটা ঠিক মনে লাগিল, উৎসাহিত হইয়া রাখাল বলিল, "তাই ভাল। পড়ে' কোন লাভ নেই, তার চেয়ে চাকরী করে' যা দু পাঁচ টাকা পাই সেই ভাল। কিন্তু কাল ভোরেই যাব, আমার কাপড় চোপড় কিছু যে ঠিক নেই।"

হাসিয়া দেবানন্দ বলিল, "তুই কি সব নিয়ে যেতে চাস্ নাকি?

মাত্র দু'খানা কাপড় নিয়ে যাবি, কোথায় থাকতে হবে—গাছতলায় কি ফুটপাতে তারই ঠিক নেই, বেশী জিনিস নিয়ে গিয়ে কি হবে? বরং টাকা-পয়সা যা আছে, তাই সব নিয়ে চল—আর কিছু নয়।"

রাখাল ভাবিয়া বলিল, "বেশী তো নেই, সামান্য, মাত্র দু তিন টাকা আছে।"

দেবানন্দ বলিল, "ওতেই হবে; আমারও মাত্র চারটে টাকা আছে। যাওয়া হোক তো, তারপর যেমন করেই হোক নিজেদের খাওয়া পরা চালানো যাবে। তবে তাই চল্, তুই গিয়ে চট করে' তোর নিয়ে যাওয়ার মত যা কিছু গুছিয়ে নিয়ে আয়; আমিও বাড়ী থেকে আসি, ভোর চারটের ট্রেণ আজ ধরবই।"

সে উঠিল, রাখালও উঠিল।

নিঃশব্দপদে সে ফিরিয়া নিজের গৃহে আসিল; দেয়াশালাই জ্বালিয়া একটা বাতি ধরাইয়া জিনিষপত্র গুছাইতে বসিল।

কলিকাতায় যাইতেছে, এই আনন্দে মনটা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, আনন্দের আতিশয্যে সে গায়ে প্রথমে একটা গেঞ্জি, তাহার পর যথাক্রমে সার্ট ও কোট চাপাইল, পরিষ্কার একখানা কাপড় পরিল, একখানা হাতে লইল। জুতা জোড়াটার পানে তাকাইয়া দুঃখ হইতেছিল, মাথার দিক্‌টা ফাটিয়া গিয়া আঙ্গুল বাহির হইয়া পড়িতেছে, কাল যদি দুইটা পয়সা দিয়া সেলাই করাইয়া লইত। যাক, কাল কলিকাতায় গিয়া সেলাই করাইলেই চলিবে।

ঘরে নিজের ব্যবহার্য্য যেখানে যে জিনিসটী পড়িয়াছিল সবগুলি কুড়াইয়া নিজের মরিচা ধরা রং উঠা ট্রাঙ্কটায় বন্ধ করিয়া চাবি দিল। সব গুছাইয়া, কাপড়খানা হাতে লইয়া দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া সে নিঃশব্দে ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিল।

পরদিন প্রভাতে রাখালের খোঁজ করিয়া জানা গেল, সে গ্রামেই নাই, সঙ্গে সঙ্গে দেবানন্দও অন্তর্হিত হইয়াছে।

নরেশ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "অদৃষ্টে বিস্তর কষ্ট আছে, এইবার মরবেন না খেতে পেয়ে।"

মামীমা নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন, "বাঁচা গেল, ঘাড় থেকে যেন ভূত নাম্‌ল। ওই দস্যি ছেলের জন্যে আমার এতটুকু শান্তি ছিল না, কে জানে কখন সে কোন সর্ব্বনাশ করে বসে। নরুর জন্য আমার দিনরাত্রির ভাবনা ছিল, ওই রোগা ছেলে—কখন গলা টিপ্‌বে অমনি মারা যাবে।"

ললিতবাবু শনিবারে বাড়ী আসিয়া সমস্ত কথাই শুনিলেন। তাঁহার মুখখানা গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ, শিবানীকে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইলেন, রাখাল একটী বদ ছেলের সঙ্গে মিশিয়া অন্যায় কাজ করিয়া তাঁহার কাছে ভৎ‍র্সিত হইবার ভয়ে কোথায় পলায়ন করিয়াছে।

ঘোষ-গৃহিণী কাশী যাইতেছিলেন। সংসারে তিনি একলা মানুষ, দুইটী পুত্র বিদেশে কাজ করেন, তাঁহারাই মাতাকে কাশী লইয়া যাইতে ছিলেন।

বৃদ্ধা নিজে রন্ধন করিতে অপারগ, ইদানীং শিবানী মাসখানেক হইতে তাঁহাকে রন্ধন করিয়া দিয়া আসিতেন।

কাশী যাইবার সময়ে ঘোষ-গৃহিণী প্রস্তাব করিলেন, "তুমিও চলনা বাছা, মাস তিনেক পরেই তো আবার ফিরে আস্‌বে। বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দেখ্‌তে পাবে, মানবজন্ম সার্থক হবে।"

এত বড় প্রলোভন শিবানী সামলাইতে পারিলেন না। রাখাল তো জানাইয়াছে—সে পূজার সময়ে আসিবে না, তাহার আসিতে সেই বৈশাখ মাস; বড়দিনের বন্ধে সে আসে না, তবে এই সুযোগে কাশী দর্শন যদি হয় হোক।

ঘরখানি মোটামুটি ছাওয়া হইয়া গিয়াছিল, দশটাকার মধ্যে দুইটাকা হাতে ছিল। আর যাহার কাছে যাহা পাওনা ছিল কুড়াইয়া লইয়া শিবানী ঘোষ-গৃহিণীর সহিত কাশী যাত্রা করিলেন।

যে দিন তাঁহারা রওনা হইবেন সেইদিনই সপ্তমী পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল। দিনদশ বার হইল সে বিধবা হইয়াছে; স্বপত্নী পুত্র ও বধূগণ তাহাকে নিজেদের কাছে রাখিতে পারিলেন না, পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

রায়বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল; কেবল যাহার সর্ব্বস্ব গেল,

সেই নিরশ্রুনয়নে নির্ব্বাকে রহিল। তাহার চোখে কেহ এক ফোঁটা জল দেখিতে পাইল না, তাহার মুখে কেহ একটী কথা শুনিতে পাইল না।

লোকে গোপনে অনেক কথা বলিতে লাগিল, যাইবার সময় শিবানীও শুনিলেন।

তাড়াতাড়িতে একবার সপ্তমীকে দেখিতে যাইতে পারিলেন না মনে বড় কষ্ট রহিয়া গেল।

গরুর গাড়ী যখন গ্রাম্য পথের উপর দিয়া চলিতেছিল সেই সময়ে পথের উপর সপ্তমীকে দেখিতে পাওয়া গেল; এক ঘড়া জল লইয়া সে বাড়ী আসিতেছে।

ঘোষ-গৃহিণী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "মাগো, দেখেছ, মেয়েটাকে, তবু এখনও পেড়ে কাপড়, গায়ে গয়না দিয়ে রেখেছ। বলি, শুধু মাথার সিঁদূরটা না মুছলেই হোতো, তবু একটা বাহারের জিনিষ থাকত।"

সপ্তমী কি বলিবার জন্য মুখ তুলিয়াছিল, ঘোষ-গৃহিণীর কর্কশ স্বরটা কানে আসিবামাত্র সে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

গাড়ী চলিয়া গেল, ইচ্ছা সত্ত্বেও শিবানী একটা কথা বলিতে পারিলেন না।

শিবানীর চলিয়া যাইবার দিন পনের কুড়ি পরে ললিত বাবুর পত্রখানা আসিল, শিবানী জানিতেও পারিলেন না রাখাল পলাইয়া গিয়াছে।

কলিকাতা হইতে রাখালের একখানি পত্র আসিয়াছিল, শিবানী সে পত্রও পাইলেন না।

তীর্থভ্রমণে গিয়া তিনমাসের স্থানে ছয় মাস অতিবাহিত হইয়া গেল, ঘোষ-গৃহিণী কাশী ছাড়িয়া দেশে আসিতে চান না; বলেন, "আর দেশে গিয়া কি হবে, এখানে বেশ আছি; দেব দেবী দেখে দিব্যি দিন কেটে যাচ্ছে।"

শিবানী অস্থির হইয়া উঠিলেন, একদিন মুখ ফুটিয়া বলিলেন, "আপনি যদি নাই যান গিন্নি মা, আমায় পাঠিয়ে দিন, আমি আর থাক্‌তে পার্‌ছিনে। রাখালের ছুটি হওয়ার সময় হল, সে শীগগীরই দেশে ফিরবে, আমায় তার আসার আগেই যাওয়া চাই।"

ঘোষ-গৃহিণী বিকৃত মুখে বলিলেন, "হবে গো বাছা, পাঠাব না তো তোমায় এখানে আট্‌কে রাখব নাকি? তোমার ছেলের ছুটি হবে তো সেই জ্যৈষ্ঠ মাসে, তার আগে তোমায় পাঠালেই তো হ'ল।"

কথাটা এইখানেই চাপা পড়িয়া গেল। ইহারই দিন তিন চার পরে শিবানী যখন আবার দেশে ফিরিবার কথা তুলিলেন, তখন বৃদ্ধা ঘোষ-গৃহিণী একেবারে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, "জানোই তো বাছা, দূরের রাস্তা, হট্‌ করে আসা যাওয়া চলে না। দুদিন না যেতেই যদি ছটফট কর্‌বে কেন তবে এলে? তখন বল্‌লেই পার্‌তে আমি যাব না, তা হলে আমি অন্য কোন উপায় দেখ্‌তুম।"

শিবানী আর কথা বলিতে পারিলেন না, চুপ করিয়া গেলেন।

অবশেষে সত্যই একদিন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা ঠিক হইয়া গেল। সেদিন শিবানীর কি আনন্দ, তাহা বলিবার নহে।

দীর্ঘ সাতমাস পরে শিবানী যখন ফিরিলেন তখন বাংলায় বসন্ত আসিয়াছে, গাছে গাছে আমের মুকুল ফুটিয়া সুন্দর গন্ধ ছড়াইয়া দিতেছে, শিমূল ফুল ফুটিয়া গাছ আলো করিয়া রহিয়াছে। বাড়ীর সামনে বাতাবী লেবুর গাছটায় অসংখ্য ফুল ফুটিয়া গন্ধ ছড়াইতেছে, সজিনা গাছের তলায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মহোৎসাহে ফুল কুড়াইতেছে। গাছে গাছে কোকিল পাপিয়া, তাহাদের কলতানে বসন্তের সুনীল গগনতল ভরিয়া উঠিয়াছে।

দেশের বুকে পা দিয়া একটা অশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া শিবানী বলিলেন, "বাঁচ্‌লুম।"

জীবনে কোনদিন তিনি নিজের এই গ্রামখানির সীমার বাহিরে পা দেন নাই, নেহাৎ কেবল দেবতাদর্শনের প্রলোভনই তাঁহাকে বহুদূরে কাশীতে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। দীর্ঘ সাত মাসের মধ্যে একটা দিন তিনি শান্তি পান নাই, এই লোকবিরল গ্রামখানার জন্যই তাঁহার অন্তর অতি গোপনে ঝুরিয়াছিল।

গ্রামে আসিয়াই প্রথমেই শিবানী সপ্তমীর খোঁজ লইলেন। কয়মাস কাজ করিয়া তিনি টাকা পনের বোল পাইয়াছিলেন, ইহা হইতে দশটী টাকা সপ্তমীর রাখিয়া বাকি টাকা তিনি নিজের দান-ধ্যানে ব্যয় করিয়াছিলেন।

নবীনদাসের বাড়ী সপ্তমীদের বাড়ীর পার্শ্বে; শিবানীকে দাস-গিন্নি প্রথমে জানাইয়া দিল, সপ্তমী আজ পাঁচমাস হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

শিবানী একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন,—সেকি কথা?

নবীনদাসের স্ত্রী বলিয়া নয়, গ্রামের সকলের মুখেই সেই এককথা শুনা গেল—সপ্তমী কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কলিকাতা হইতে কোন বাবুদের, বজরা আসিয়াছিল, সপ্তমী তাহাদের বজরাতেই চলিয়া গিয়াছে।

শিবানী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

সপ্তমীর চিররুগ্না মাতা গত মাসে মারা গিয়াছেন, পিতা মধ্যম পুত্রের নিকটে চলিয়া গিয়াছেন, জ্যেষ্ঠপুত্র এখানেই সপরিবারে রহিয়াছে। শিবানী সপ্তমীর দশটাকা নিজের কাছেই রাখিয়া দিলেন, যদি কোনদিন সপ্তমীর দেখা পান, যদি সে কোনদিন পূর্ব্বস্মৃতি মনে জাগাইয়া এই

গ্রামের বুকে ফিরিয়া আসে, তাহার টাকা তাহাকেই ফিরাইয়া দিবেন।

রাখালের সংবাদ অনেককাল পাওয়া যায় নাই, শিবানী ভ্রাতাকে পত্র দিলেন।

উত্তরে জানিতে পারিলেন, রাখাল কয়েক মাস আগে একদিন পলাইয়াছে। একদিন ললিতবাবু তাহাকে কলিকাতায় দেখিতে পাইয়াছিলেন, সে কোথায় নাকি কাজ করিতেছে। তাহার সহিত তাঁহার কোন কথাবার্তা হয় নাই, কেন না সে তাঁহাকে দেখিয়াই সরিয়া পড়িয়াছিল। তাহার বাক্সে কাপড় জামা যাহা সে রাখিয়া গিয়াছে, সব তাঁহার কাছেই আছে, তিনি সুযোগ বুঝিয়া সেগুলি পাঠাইয়া দিবেন।

শিবানী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন; সমস্ত পৃথিবী তাঁহার চোখের সম্মুখ হইতে যেন সরিয়া গেল।

১৩

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ক্রমে বৎসরের পর বৎসর আসিয়া গেল। রাখাল ময়দার কলে কাজ করে, খোলার বস্তিতে বাস করে, এও তাহার ভাল।

মা কেমন করিয়া সন্ধান পাইয়াছেন কে জানে। সে যখন হাটখোলায় ছিল তখন মা তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া পত্র দিয়াছিলেন, তাহার মা হইয়াছেন এজন্য নিজেকে ধিক্কার পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। মা তাহার ঘরের ঠিকানা কেমন করিয়া পাইলেন ভাবিয়া রাখাল আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর অনেক ভাবিয়া ঠিক করিয়াছিল ইহা নিশ্চয়ই নরেশের কাজ। হাটখোলার কাছেই একদিন বাবুবেশী নরেশের সহিত কুলিবেশী রাখালের দেখাশুনা হইয়া গিয়াছিল, নরেশ কি একটা কথা ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিয়াছিল, রাখাল তাহা ইচ্ছা করিয়াই শুনে নাই। কিন্তু এ কথা ঠিক নরেশ সেইদিনই যে-কোনসূত্রে তাহার বাসস্থানের নম্বর জানিয়া মাকে জানাইয়াছে এবং তাই মা তাহাকে পত্র দিয়াছেন।

তাহার প্রতিজ্ঞা, সে বড় না হইয়া দেশে যাইবে না, মাকে পত্র দিবে না। মায়ের সংবাদ সে গ্রামের রাইচরণের কাছে পায়। রাইচরণ মাঝে মাঝে বাড়ী যায়, রাখালের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকায় তাহার কথা শিবানীকে বলে না।

রাখাল হাটখোলার ঘর ছাড়িয়া হাতীবাগানে একটা গলির মধ্যে আসিয়াছে। এখানে একটা ঘরে তাহারা চারজন থাকে, এই খোলার

ঘরে দিন তাহার বেশ কাটে। সে এখন নিশ্চিন্ত হইয়া আছে, মা তাহার সন্ধান পাইবেন না।

দেশে মায়ের কাছে একবার যাইবার জন্য সময়ে সময়ে মনটা বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিত। অনেককাল সে মাকে দেখে নাই, মার হাতের তরকারী ভাত খায় নাই, মার কোলে মাথা রাখিয়া শোয় নাই। মায়ের কাছে যাইবার ইচ্ছা মনে জাগিবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িত—মা লিখিয়াছেন, তিনি আর তাহার মুখদর্শন করিতেও চান না। তিনি ভ্রাতার মুখে পুত্রের সম্বন্ধে যে সব কথা শুনিয়াছেন, তাহাতে তাহার মুখদর্শন করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার আর নাই। রাখাল যদি কোনদিন মানুষ হইয়া নিজের পরিচয় দিবার উপযুক্ত হয়, তবেই যেন সে গ্রামে মায়ের কাছে আসে, কুলী পুত্রকে তিনি দেখিতে চান না।

মায়ের পত্র রাখালকে প্রথমটা দমাইয়া দিয়াছিল, প্রথমটা সে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তাহার পর সে আবার দাঁড়াইল, আবার নবোৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

এক ঘরে তাহারা চারজন থাকে। দুইজন—হরেন ও মোহিত পূর্ব্ব হইতেই ছিল, রাখাল আসিবার পরে ভূপাল আসিয়া জুটিয়াছে।

হরেন ও মোহিত জাতিতে কায়স্থ, রাখাল ব্রাহ্মণ, ভূপাল জাতিতে কৈবর্ত্ত। ঘরের পার্শ্বে যে ছোট বারাণ্ডাটী আছে তাহাতে তিনটী উনান। একটীতে রাখাল নিজের ভাত ফুটাইয়া লয়; অপর দুইটীর একটীতে ভূপাল, অপরটীতে, হরেন ও মোহিতের রন্ধন হয়। চারজনেই এক কলে কাজ করে; সকালে একই সময়ে কাজে যায়, দুপুরে বাড়ী ফিরিয়া রাত্রের রন্ধন করা ভাত তরকারী খাইয়া এতটুকু বিশ্রাম করিয়া আবার কাজে যায়। সন্ধ্যায় ফিরিয়া চারজনে খানিকটা বিশ্রাম করিয়া রন্ধন করিতে যায়।

রাখালের এ অভ্যাস নাই,—তরকারী সে মোটেই রাঁধে না, প্রত্যহই ভাতেভাত দিয়া সে দিন চালাইয়া দেয়। হরেন ও মোহিত এবং ভূপাল তিনজনই খুব কর্ম্মঠ ছেলে, তাহারা নিত্য পছন্দ মত নানা তরকারী রন্ধন করে, তৃপ্তির সহিত ভাত খায়। কয়জনে একটু তফাতে তফাতে বসিয়া ভাত খায়, ভূপাল সত্তুঃখে বলে, "দাদাঠাকুর এ রকম করে রোজ ভাতে ভাত খেয়ে মারা যাবে যে! ওই দিয়ে মানুষ তুবেলা ভাত খেতে পারে? তোমার চেহারা যে দিন দিন খুলে যাচ্ছে।"

সত্যই কোন দিন আলু ভাতে, কোন দিন বেগুন ভাতে-ভাত গিলিতে বড় কষ্ট হইত, এই সময়েই মায়ের কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়িত, মনে হইত—তুদিন যদি মায়ের হাতের তরকারী সে খাইতে পাইত।

ভূপালের কথা শুনিয়া সে শুষ্ক হাসিত, বলিত, "এই তো, বেশ খেতে পাচ্ছি, কিছু কষ্ট নেই তো।"

ভূপাল ছেলেটী সত্যই তাহাকে বড় ভালবাসিত। তাহার নিকষ-কালো বিরাট বুকের আড়ালে সত্যকার একটী দরদী হিয়া ছিল। দেশে তাহার মা, অন্ধ পিতা, একটী ভাই ছিল। প্রতি মাসে সে হিসাব করিয়া নিজের জন্য সামান্য কিছু রাখিয়া, যাহা কিছু উপার্জ্জন করিত সবই পিতাকে পাঠাইয়া দিত।

রাত্রিতে অন্ধকারের মধ্যে পাশাপাশি বিছানায় শুইয়া সে নিজের সংসারের কত কথা বলিত। একটী মাত্র ভাই, তার চেয়ে পাঁচ বৎসরের ছোট, সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে, আর বৎসর-তুই পরে সে ম্যাট্রিক দিবে, তাহার পর ভূপাল তাহাকে আই-এ পড়াইবে। ভাইয়ের পড়ার ঝোঁক খুব বেশী, খরচ পাইলে সে পড়িতে পারিবে এবং একটা মানুষ হইতে পারিবে। ভূপাল নিজে লেখাপড়া শিখিতে পারে নাই, এই কষ্ট তাহার

মনে চিরকালের জন্য রহিয়া গিয়াছে ; সেই জন্যই সে ভাইকে মানুষ করিতে চায়।

তাহার কথা শুনিতে শুনিতে রাখাল নিজের কথাই ভাবিত। গ্রামের কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিত, মায়ের কথা মনে পড়িত। চিরদুঃখিনী মা তাহার, কত আশাই না তাঁহার ছিল,—তাঁহার পুত্র লেখাপড়া শিখিবে মানুষ হইবে, তিনি সগৌরবে সকলের নিকটে তাহার পরিচয় দিবেন। তিনি 'বড় কম কষ্টে তাহাকে নিকটে আসিতে নিষেধ করেন নাই। পুত্র তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

সারাদিন সে দেশের ভাবনা, বাড়ীর ভাবনা, মায়ের ভাবনা করিবার সময় পাইত না। রাত্রে আলো নিভাইয়া যখন তাহারা শুইয়া পড়িত, তখন অতীতের কথাগুলাই মনের মধ্যে জাগিত, ছোট ছোট কথাগুলাও খুব বড় হইয়া অন্তরে আঘাত করিত।

হরেন ও মোহিত একলা মানুষ, সংসারে তাহাদের আপনার বলিতে কেহ ছিল না। তাহাদের অতীতের পানে তাকাইবার কোন আবশ্যক ছিলনা, বর্ত্তমান সম্বন্ধে দুই চারটা কথা বলিতে বলিতে শীঘ্রই তাহারা ঘুমাইয়া পড়িত।

রাখাল নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিত, ভূপাল মৃদুস্বরে একঘেয়ে কথা বলিয়া যাইত। মাঝে মাঝে তাহার সন্দেহ হইত, শ্রোতা বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ; তাই ডাকিত—"ঘুমালে নাকি দা-ঠাকুর—?"

রাখাল উত্তর দিত—"না, ঘুমাই নি।"

ভূপাল আরও কতক্ষণ বকিয়া বকিয়া ঘুমাইয়া পড়িত ; রাখালের চোখে ঘুম আসিত না, সে বিনিদ্র চক্ষে বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিত।

দেশ, দেশ—সুন্দর মধুময় দেশ। যে দেশের মধ্যে সে কোনদিন কিছু

দেখিতে পায় নাই, আজ যে সেই দেশই তাহার আরাধনার স্থল হইয়া উঠিবে তাহা কে জানিত ?

দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস যায়, বৎসরের পর বৎসরও কাটিয়া যায়। রাখাল সারাদিনের শ্রান্তি দূর করার মানসে শুইয়া পড়িয়া ভাবে—তাহার হাতে পোঁতা আমের গাছটী কত বড় হইয়াছে, হয় তো এতদিন তাহাতে ফল ধরিয়াছে। গ্রামের আকাশ এখন তেমনি পরিষ্কার, মাঝে মাঝে সেই নীলাকাশের কোণ বহিয়া কালোমেঘ ভাসিয়া উঠে, সারা আকাশ ছাইয়া ফেলে। গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা নদীর ঘাটে খেলা করে, যখন কালো ঢেউয়ের উপর দিয়া—সাদা লাল নানারঙ্গের পাল তুলিয়া ছোট বড় নৌকা গুলি দেশ হইতে দেশান্তরে যায়, তখন তাহারা আজও সমস্বরে চীৎকার করে। আজও গ্রামের বুকে বর্ষা নামে, শুষ্ক পথ ঘাট জলে ভিজিয়া উঠে, শুষ্ক দূর্ব্বার বুকে আবার নূতন দূর্ব্বা জন্ম লয়।

দেবানন্দ নৈহাটী গরীফা কলে কাজ করে, ছুটীর দিনে মাঝে মাঝে আসে। সাহেব নাকি তাহাকে খুব ভালবাসেন, তাহাকে সর্দ্দার করিয়া দিয়াছেন। সে ইহাও বলে—তাহার সাহেব তাহাকে বম্বে লইয়া যাইতে চান, শীঘ্রই সে বম্বে যাইবে। যেমন করিয়াই হোক—দেশভ্রমণ তাহার উদ্দেশ্য, চাকরী করা তাহার উদ্দেশ্য নয়, এ-কাজ তাহার ভালও লাগিতেছে না।

রাখাল চুপ করিয়া শুনে। সে কুলি—দেবানন্দ কুলীর সর্দ্দার, এইটুকু মাত্র প্রভেদ। কুলি আর সর্দ্দারে প্রভেদ কতটুকু? তাহার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছিল, দেবানন্দও যে কুলির কাজ করে, ইহা তাহার মনের ইচ্ছা ছিল না। তাহার আদর্শ অতি উচ্চ, অতি মহৎ, দেবানন্দকেও ধরণীর ধূলার সহিত ধূলা হইয়া মিশিয়া যাইতে দেখিয়া সে আঘাত পাইয়াছিল বড় কম নয়।

একবার ইথারের সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা হইত, কিন্তু সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার সাহস তাহার হয় নাই। ইথার তাহাকে বার বার করিয়া বলিয়া দিয়াছিল মামার বাড়ী থাকিতে পত্রও দিয়াছিল—যদি সে কলিকাতায় আসে, একবার যেন তাহার সহিত দেখা করে কিন্তু দেখা করিবে সে কি করিয়া, সে যে কুলী, ময়দার কলে দিনমজুরী করিয়া তাহার দিন যায়। ভদ্রসমাজে বাহির হইবার মুখ তাহার নাই, পোষাকও নাই। আজ ইথারের সহিত দেখা করিতে যাইবার কথা মনে করিলেও তাহার সারা অন্তর সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে।

দিনের পর দিন আসিতে লাগিল, আবার একে একে গত হইয়া যাইতে লাগিল; রাখালের মনে অনেক কল্পনাই জাগিতে লাগিল, আবার লীনও হইতে লাগিল।

রাইচরণ আসিয়া জানাইল শিবানীর বড় অসুখ, তাঁহার উঠিবার ক্ষমতা নাই, কেহ দেখিতেও নাই, এ সময়ে রাখালের একবার সেখানে যাওয়া বিশেষ দরকার।

মাঘ মাস শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর দুই চারিদিন বাকি আছে মাত্র। এ-বার বর্ষায় শিবানীর যে ম্যালেরিয়া ধরিয়াছে তাহা আর সারে নাই, এ-বারে অসুখের বড়ই বাড়াবাড়ি।

রাখালের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, খানিক সে কথা বলিতে পারিল না; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "ওষুধ বিষুধ খাচ্ছেন না?"

রাইচরণ শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "ওষুধ কোথায়? তুমি তো মাত্র চার পাঁচ বছর দেশে যাওনি রাখাল, এর মধ্যে দেশের কথা কি ভুলে গেছ? দেশে ওষুধ দেওয়ার লোক গুরুমশাই, ওষুধও সেই গাছ-গাছড়া, ওতে কঠিন রোগ হতে মানুষ সারে না।"

রাখাল চুপ করিয়া রহিল।

সেদিন সে কাজেও গেল না। সন্ধ্যার সময়ে শ্রান্ত ভূপাল ফিরিয়া আসিয়া দেখিল রাখাল চুপচাপ অন্ধকার ঘরের দরজায় বসিয়া আছে।

ঘরের কোণ হইতে মাদুরটা টানিয়া লইয়া কোন একরকমে পাতিয়া তাহার উপর শুইয়া পড়িয়া ভূপাল আড়ামোড়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "আজ কাজে গেলে না কেন দা-ঠাকুর?"

দা-ঠাকুরকে ভূপাল যতখানি শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত ততখানি ভালও বাসিত। এমন সুন্দর চেহারা, এতখানি লেখাপড়া জানে, ব্রাহ্মণের ছেলে, সে জগতে এত কাজ থাকিতে কেন যে এই ছোটলোকের কাজ করিতে

আসিয়াছে তাহা ভূপাল ভাবিয়া পায় না, একবার দুবার জিজ্ঞাসা করায় রাখাল নীরব হইয়া যায় দেখিয়া সে আর কোনদিন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসাও করিতে পারে নাই।

ভূপালের প্রশ্নের উত্তরে রাখাল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আজ মোটে কিছু ভাল লাগছে না, শরীরও ভাল নেই, মনও ভাল নেই।"

ভূপাল ব্যস্ত হইয়া বলিল, "অসুখ বিসুখ করেনি তো? আমি তোমায় বার বার বলি—দা-ঠাকুর রোজ রাত্রে এত করে আর স্নানটা করো না, কোনদিন অসুখে পড়্‌বে। তা, তোমরা ভদ্দর লোক, ছোট লোকের কথা কি কানে তোলো। এই দিনকাল, লোকের সহজেই অসুখ বিসুখ হচ্ছে, তোমার যা তিনবার করে রোজ স্নান করা, ওতে আর অসুখ করবে না?"

রাখাল একটু হাসিল, "না অসুখ বিসুখ করে নি, অনেক কাল পরে আজ বাড়ীর খবর পেলুম কি না।"

ভূপাল সোৎসুকে বলিল, "মা ভাল আছেন তো?"

কথায় কথায় সে রাখালের মায়ের কথা জানিয়াছিল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মা, ভাল আর রইলেন কই? খবর পেলুম, তাঁর নাকি খুব অসুখ।"

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া ভূপাল বলিল, "সে কি দা-ঠাকুর, মায়ের এ রকম অসুখের কথা শুনেও তুমি চুপ করে বসে আছ? তোমার এ খবর শোনবামাত্র চলে যাওয়া উচিত ছিল।"

রাখাল একটু হাসিতে গেল, কিন্তু হাসি তাহার মুখে ফুটিল না।

একটু থামিয়া সে বলিল, "মা যে বারণ করেছেন তাঁর কাছে যেতে, সেই জন্যেই না এই পাঁচ বছর দেশে যাই নি, মাকে দেখি নি।"

ভূপাল ব্যগ্র হইয়া বলিল, "কি হয়েছে দা-ঠাকুর, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে।"

রাখাল আজ আর কোন কথা গোপন করিয়া রাখিতে পারিল না, একে একে সব কথা সে আজ বলিয়া ফেলিল।

ভূপাল মাথা নাড়িয়া বলিল, "বুঝেছি, কিন্তু কাজটা মোটেই ভাল করনি দা-ঠাকুর, মা না হয় রাগের ঝোঁকে তোমায় যেতে বারণ করেছেন, তাই তুমিও যাওনি, দেখ দা-ঠাকুর, তোমরা ভদ্দর লোকের ছেলে, যাই হোক লেখাপড়াও শিখেছ তাতেও তোমরা যদি এ-রকম কর তা হলে আমরা ছোটলোকেরা করব না কেন বল তো? তোমার কি রাগ করে তফাতে থাকা উচিত হয়েছে? মার মনে কতখানি আশা ছিল তুমি পড়েশুনে একটা মানুষ হবে, তা না করে তুমি যে পালিয়ে এসে কুলিগিরি কাজ করছো এতে তাঁর রাগ তো হবারই কথা, তা বলে তোমার রাগ করে থাকা উচিত হয় নি। যাই হোক, তুমি যখন মার অসুখের খবর পেয়েছ কাল সকালেই চলে যাও, আর একটুও দেরী করো না।"

সমস্ত রাতটা রাখাল ছটফট করিয়া কাটাইল। একটী বার মাত্র তাহার চোখ দুইটা বুজিয়া আসিয়াছিল, মাকে স্বপ্ন দেখিয়া সে জাগিয়া উঠিল, রাখাল আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া চুপ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া রহিল।

ও-ধারে বিছানার উপর ভূপাল ঘুমাইতেছে তাহার নাসিকা গর্জ্জনে সমস্ত ঘরটা শব্দায়িত। কি শান্তিপূর্ণ ঘুম তাহার,—আর রাখাল?

কে জানে কয়টা বাজিয়াছে? দ্বারের ফাঁক দিয়া জানালার ছিদ্র দিয়া প্রভাতের আলো এখনও তো গৃহমধ্যে পড়ে নাই, পথে এখনও ময়লার গাড়ীও তো চলে নাই।

হঠাৎ ভূপালের নাসিকাধ্বনি থামিয়া গেল, পাশ ফিরিতে গিয়া সে সচেতন হইয়া উঠিল।

"ওখানে কে—দা-ঠাকুর নাকি ?"

রাখাল উত্তর দিল, "হ্যাঁ আমিই। তুমি ঘুমাও ভূপাল, উঠছো কেন ?"

ভূপাল হাই তুলিয়া বলিল, "পূরো ঘুম হয়ে গেছে, ভোর প্রায় হল আর কি ? ওই শোন, ধাঙড়েরা বার হয়েছে, এখনি ফরসা হবে। কিন্তু তুমি যে বসে আছ দা-ঠাকুর, রাত্রে বোধ হয় ঘুমাও নি ?"

রাখাল উত্তর দিল "না।"

ভূপাল তিরস্কারের সুরে বলিল, "সবই বাড়াবাড়ি। এই তো বেশ ছিলে দা-ঠাকুর, হঠাৎ একেবারে এত চঞ্চল হয়ে উঠলে যে আর রাত্রে ঘুম পর্য্যন্ত চোখে নেই।"

রাখাল বলিল, "ভোর হতেই আমি রওনা হব ভূপাল, সাড়ে পাঁচটায় একখানা ট্রেণ আছে শুনেছিলুম, ওইখানাই ধরব।"

ভোরের আলো জানালা পথে ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল, ঘরের পাশে নারিকেল গাছে কাক গুলা চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল।

ভূপাল বলিল, "তবে ওঠো, আর দেরী করো না। সাড়ে পাঁচটার ট্রেণ ধরতে হলে তোমায় এখনই ইষ্টিশানে যেতে হবে।"

রাখাল উঠিয়া পড়িল।

বাক্সটা খুলিয়া টাকাগুলি লইল, তাহার পর ভূপালকে আলিঙ্গন করিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

তখন পথের আলোগুলি সবেমাত্র নিভিয়াছে, পূব আকাশ সবেমাত্র রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ম্লান আলো ধরার মুখে চুম্বন দিয়াছে মাত্র। অন্ধকার এখনও জড়সড় ভাবে কোণ ঘেঁসিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছে।

পার্শ্বের বাড়ীর প্রৌঢ় ভদ্রলোকটী গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন, তাঁহার মুখে গঙ্গাস্তোত্র।

রাখাল ছুটিয়া চলিল, কোনদিকে তাহার দৃষ্টি নাই, যেমন করিয়াই হোক্ এ ট্রেণ তাহাকে ধরিতেই হইবে।

ট্রেণ ছাড়িতে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় ছিল, একখানি টিকিট কাটিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে রাখাল ট্রেণে আসিয়া উঠিল।

এত ভোরে ষ্টেশনে বেশী লোক নাই, রাখাল নিশ্চিন্তভাবে একখানা শূন্য কামরা দখল করিয়া বসিল।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল, একে একে দু'পাশে ষ্টেশন রাখিয়া খুসিমত ষ্টেশনে ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া ট্রেণ ছুটিয়া চলিল।

প্রভাতের নূতন সূর্য্য উঠিয়া লাল আলো ছড়াইয়া দিল। বাঁশ গাছের মাথায়, অন্য গাছের পাতায় সে আলো পড়িয়া চিকমিক করিতেছিল।

ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহ। দু'পাশের মাঠ হইতে ফসল সব উঠিয়া গিয়াছে, শূন্য মাঠগুলি ধূ ধূ করিতেছে, তাহার উপর প্রভাতের সূর্য্যালোক আসিয়া পড়িয়াছে।

ট্রেণ যখন চাঁদ পাড়ায় থামিল তখন বেলা প্রায় আটটা বাজিয়াছে।

রাখাল নামিয়া পড়িল।

আজ এই ষ্টেশনের পানে চাহিয়া পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা মনে পড়িল। সেই সে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে চলিয়া গেছে, আর আসে নাই। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে সে আবার ফিরিয়াছে।

পথের দু'ধারে আম গাছগুলি মুকুলে ভরিয়া উঠিয়াছে, সুন্দর গন্ধে চারিদিক ছাইয়া গিয়াছে। সেই গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কত পাখী কত মধুকর আসিয়া জুটিয়াছে। গ্রামের শান্ত বুক কোকিল পাপিয়া শ্যামা দোয়েলের কলগীতিতে ভরিয়া উঠিয়াছে।

পথের ধারে শিমূল গাছ, কত শিমূল ফুল ঝরিয়া পথের উপর পড়িয়াছে, পথ চলিতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আনন্দে লাল ফুল কুড়াইতেছে, কত ফুল মানুষের নিষ্ঠুর পায়ের চাপে, গরুর গাড়ীর চাকার তলায় পড়িয়া দলিত পিষ্ট হইতেছে।

রাখাল আজ কোনদিকে তাকাইল না, হন হন করিয়া সে ছুটিল।

শিয়ালদহ হইতে সে বেদানা আঙুর কিনিয়াছে মাকে খাওয়াইবে; সেই ঠোঙ্গাটী সযত্নে বুকে ধরিয়া সে দ্রুত চলিয়াছে।

গ্রামে প্রবেশের পথে দেখা হইল রতনা জেলের সহিত। সে প্রথমে রাখালকে চিনিতেই পারিল না, পাঁচ বৎসরে রাখালের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে।

যখন সে চিনিতে পারিল তখন সানন্দে বলিয়া উঠিল "এই যে বামন ঠাকুর এসেছ।"

রাখাল সঙ্কুচিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মা কেমন আছে রতন দা ?"

রতন উত্তর দিল, "আজ একটু কথা বলেছে, কয়দিন কথা বন্ধ হয়েছিল। আজ দেখে সবাই বলছে আর ভয় নেই, এ যাত্রা বেঁচে গেলেন।"

রাখালের চক্ষু দুইটী অকস্মাৎ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, সে কৃতজ্ঞহৃদয়ে সজলনেত্রে একবার আকাশ পানে তাকাইল।

প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও রাখাল মাকে বাঁচাইতে পারিল না।

যাইবার সময় শিবানী পুত্রের মাথায় হাত দিয়া অস্ফুটস্বরে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন যেন সে সুখী হয়।

মায়ের মৃত্যুর পরও রাখাল যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না তাহার মা নাই। মাঁ যেন কোথায় বেড়াইতে গিয়াছেন, এখনই ফিরিবেন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রাখাল মায়ের শ্রাদ্ধ শেষ করিল। যতগুলি টাকা সে এ পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিল সে সবই সে ব্যয় করিয়া অনেক লোককে খাওয়াইল এবং মায়ের আত্মার তৃপ্তি হইয়াছে মনে করিয়া শান্তি পাইল।

পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মামা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর বিদেশে পড়ে থেকে কি হবে রাখাল, এখন দেশে এসে বসো, বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হও।"

শুষ্ক হাসিয়া রাখাল বলিল, "দিন চলবে কি করে বলুন? আমাদের তো জমিজমা কিছু নেই যাতে দিন কাটাতে পারব?"

ভট্টাচার্য্য হাত নাড়িয়া বলিলেন, "আরে রেখে দাও তোমার দিন চালানো। গাঁয়ে কোন লোকটা না খেয়ে মরছে বল দেখি? এই যে এত লোক রয়েছে সবাই খেতে পারছে, কেউ তো শুকিয়ে নেই। তুমি এক কাজ কর, ঘোষ-গিন্নির অনেক জমি আছে, এগুলো ভাগে নাও না কেন? নিজে চাষ বাস কর, স্বচ্ছন্দে দিন কেটে যাবে।"

রাখাল খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কি হবে আমার সংসার

পাতিয়ে, জমিজমা চাষ করে? একলা মানুষ, দিন যেমন করেই হোক কেটে যাবে, তার জন্যে আমি ভাবিনে।”

বিস্মিত হইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, “সেকি, বিয়ে থাওয়া করবে না?”

রাখাল শুধু হাসিয়া বলিল, “না, এই অবস্থা, এর উপর বংশবৃদ্ধি করে দারিদ্র্য আরও বাড়িয়ে তুলতে আমি চাইনে।”

গ্রামের সঙ্গে এখনকার মতন সম্পর্ক উঠাইয়া সে আবার কলিকাতায় ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

এতদিন এখানে আসিয়া সে সপ্তমীর কথা কাঁহাকেও জিজ্ঞাসা করে নাই। সেদিন যখন শুনিতে পাইল পাঁচ বৎসর আগে সপ্তমী কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আর তাহার কোন সন্ধান মিলে নাই, তখন কে জানে কেন সে বড় বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

এতদিন সে অন্তরের পানে চাহে নাই। এ পর্য্যন্ত অনেক মেয়েকেই সে দেখিয়া আসিয়াছে তাহাদের শুধু দেখিয়াছে তাহার চিত্তফলকে কাহারও মূর্ত্তি অঙ্কিত হইতে পারে নাই, সে সুযোগ দিবার সময়ও সে পায় নাই। একএক দিন দিনের কার্য্যাবসানে শ্রান্ত দেহে সে যখন বসিয়া ভাবিত; অতীতের ছবি যখন তাহার মনে ভাসিয়া উঠিত, তখন সপ্তমীর মুখখানা তাহার মনে জাগিয়া উঠিত। কিন্তু সপ্তমীকেও সে বড় একটা আমল দেয় নাই, কারণ সে বিবাহিতা, পরস্ত্রী। কচিৎ কখনও মনে জাগিয়া উঠিত সপ্তমীর সেই কথাগুলি—আচ্ছা রাখাল দা, বিয়ে না করলে কি হয়, আমার তো বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই।”

কেন সে এ-কথা বলিয়াছিল রাখাল এক এক সময় তাহাই ভাবিত, কিন্তু বেশী ভাবিতে গেলে তাহার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হইয়া যাইত; অবশেষে সে সব চিন্তা দূর করিয়া সরাইয়া দিবার জন্যই জোর করিয়া

বলিয়া উঠিত—"সে তো সুখীই হয়েছে, বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে, আমার কথা নিশ্চয়ই সে এখন ভুলে গেছে, তবে আমিই বা তার কথা ভাবি কেন?" সপ্তমী বিধবা হইয়াছে এবং কোথায় চলিয়া গিয়াছে এই সংবাদটা তাহার মনের কোন গোপন স্থানে প্রচণ্ড আঘাত দিল; সে একবার অন্তরের পানে তাকাইয়া দেখিল সেখানে আর কাহারও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত নাই—দেখিল সপ্তমী সমস্ত অন্তরটা জুড়িয়া লইয়া বসিয়া আছে।

না, সে কখনও সুখী হয় নাই, সে তাহার বৃদ্ধ স্বামীকে এতটুকুও ভালবাসিতে পারে নাই; যদি যথার্থ ভালবাসিতে পারিত তাহা হইলে ভালবাসার এইরূপ অপমান সে করিতে পারিত না।

ভালবাসা, একি কেবল বিবাহের দুইটা মন্ত্রোচ্চারণের ফলে জন্মিতে পারে? সেই সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ কেবলমাত্র দুইটা মন্ত্রোচ্চারণের ফলে এই তরুণী কিশোরীর সমস্ত অন্তরটা জয় করিয়া লইতে পারিয়াছিল? কেহ কোনদিন যাহা পারে নাই, যাহা কোনদিন সম্ভব হয় নাই, সপ্তমীর বেলায় কেমন করিয়া তাহা হইবে?

আজ প্রথম রাখালের মনে হইল সপ্তমী তাহাকে ভালবাসিয়াছিল। এই কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে কবে কোনদিন সপ্তমী তাহার জন্য কি করিয়াছিল সবই রাখালের মনে পড়িয়া গেল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রাখাল উঠিল, কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ঘোষ-গৃহিণী তাহাকে কাল ডাকিয়া পাঠাইয়া ছিলেন, আজ বিদায় লইবার জন্য রাখাল তাঁহার বাড়ীতে গেল।

শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "চললুম দিদিমা, আবার কবে ফিরব তা কে জানে। ঘরের চাবিটা তোমার কাছে দিয়ে যাচ্ছি, মাঝে মাঝে এক আধবার খুলে দেখা-শোনা করো।"

ঘোষ-গৃহিণী সদুঃখে বলিলেন, "তুই আর আসবি নে রাখাল, দেশের মায়া একেবারে কাটাচ্ছিস ?"

রাখাল মাথা নাড়িল, "তাই কি হয় দিদিমা, দেশের মায়া কেউ কখনও কাটাতে পারে ? যেখানে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন দেশের কথা মনে জাগেই, দেশকে কেউ ভুলতে পারে না। আমার দেশকে আমি যে কতখানি ভালবাসি, আমার দেশের লোকদের আমি যে কতখানি ভালবাসি, তা আর তোমায় কি বলে বুঝাব দিদিমা। কিন্তু ভালবাসলেও আমার তো এখানে থাকলে চলবে না, কি নিয়ে এখানে থাকব ?"

ঘোষ-গৃহিণী বলিলেন, "তোর মা-ই না হয় গেছে রাখাল, দেশ আছে, ঘরও আছে। বিয়ে-থাওয়া কর—সংসারী হ। বিদেশে কাজকর্ম্ম করলি—ছুটির সময় বাড়ী এলি, তবু একটা সংসার বজায় থাকবে তো।"

রাখাল হাসিল,—আবার সেই ঘর-সংসার বিবাহ ; সে বলিল, "তার তো এখনও সময় আছে দিদিমা, এর পর বিয়ে করব বই কি। সেই জন্যেই তো ঘর রাখা নইলে কোন দরকারই ছিল না, দেশের সঙ্গে সব সম্পর্ক তুলে দিয়ে চলে যেতুম। ঘর-দোর রইল, এর পর বিয়ে করে বউকে এখানেই রাখা যাবে। নিজে যেখানে খুসি—গাছতলায় ফুটপাতে পড়ে থাকি বলে বউকে তো রাখা চলবে না।"

গ্রামের পরিচিত সকলের নিকট বিদায় লইয়া রাখাল কলিকাতা যাত্রা করিল।

গ্রাম ছাড়াইয়া সে যখন মাঠের পথে পড়িল, তখন একবার পিছন ফিরিয়া চাহিল।

চির পরিচিত গ্রাম, চির পরিচিত গাছপালা—পথ ঘাট সবই যেন এক সুরে সুর মিলাইয়া তাহাকে ডাকিতেছে আয় রাখাল আয়।

কাহার জন্য সে আর ফিরিবে? যাহাদের জন্য গ্রাম তাহার নিজের ছিল আজ তাঁহারা কেহ নাই। একজন ইহজগৎ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, আর একজন এই জগতে যদি আজও আছে—এতদূরে সরিয়া গেছে আজ তাহার নাগাল পাওয়া যাইবে না।

তথাপি রাখালের দুইটী চোখ জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে চলিতে চলিতে কতবার পিছন ফিরিয়া চাহিল, আবার চোখ ফিরাইল।

ভূপাল জিজ্ঞাসা করিল, "এত দেরী হল কেন দা-ঠাকুর ?"

রাখাল শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "কাজ তো বড় কম নয় ভূপাল ? মায়ের কাজ করতে হল, ঘর-দোরের ব্যবস্থা করতে হল---"

ভূপাল কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না, তাই বিস্মিতনেত্রে রাখালের পানে তাকাইয়া রহিল।

রাখাল আপন মনেই বলিয়া চলিল, "দেশে যাওয়ার দু'দিন পরেই মা মারা গেলেন, দশদিন পরে তাঁর কাজ করতে হল, তার পরে---"

বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল। ভূপালও চুপ করিয়া রহিল, ইহার উপরে কথা কহিবার ইচ্ছা তাহার আর হইল না।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাখাল বলিল, "কাজটা আছে না গেছে ?"

ভূপাল যেন অকস্মাৎ চমকাইয়া উঠিল, বলিল, "কার কাজ ?"

রাখাল বলিল, "আমার। কোন খবর দিয়ে তো যাই নি, কাজেই মনে হচ্ছে হয় তো গেছে।"

ভূপাল কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না যে তাহার সে কাজ ঘুচিয়া গেছে ; একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল, "তুমি কাল তো কাজে যাবে, গিয়ে শুনো ম্যানেজার মশাই কি বলেন। আমাদের কাছে তো কোন কথা বলেন নি, কি করে জানব তুমি সে কাজ আর পাবে কিনা।"

তাহার বিবর্ণ মুখখানার পানে তাকাইয়া রাখাল বেশ বুঝিল সে কথা গোপন করিতেছে। সে বলিল, "কিন্তু কাজে যাওয়ার আগেই

আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার কাজ আর নেই। দেখা যাবে কাল কাজে গিয়ে ম্যানেজারবাবু কি বলেন।"

কোন রকমে রাত্রিটা কাটাইয়া সকালেই সে ভূপালের সহিত কলে গেল।

তাহার কার্য্যে আর একজন বাহাল হইয়াছে দেখিয়া রাখাল খানিক স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। চাকরীর বাজার আজ এমন হইয়াই দাঁড়াইয়াছে বটে, তাহার আঠার টাকা বেতনের পদবীতে সঙ্গে সঙ্গে লোক আসিয়া লাগিয়াছে।

রাখাল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। জানে তাহার এখানকার অন্ন উঠিয়াছে, তবু সে একবার ম্যানেজার বাবুর হাতে পায়ে ধরিল, এই কাজটি গেলে তাহাকে অনাহারে মরিতে হইবে এ কথাও জানাইল, ম্যানেজার বাবু তাহার সে অনুনয় বিনয়ে কর্ণপাত করিলেন না। শেষটায় দারুণ বিরক্ত হইয়া দ্বারোয়ানকে আদেশ দিলেন ইহার কান ধরিয়া বাহির করিয়া দাও। দারুণ অপমানে রাখালের সুগৌর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে ক্রুদ্ধ নেত্রে ম্যানেজার বাবুর পানে তাকাইয়া নিজেই বাহির হইয়া আসিল।

ফুটপাতে দাঁড়াইয়া রাখাল ভাবিতে লাগিল এখন সে কি করিবে, কোথায় যাইবে? হাতে যাহা কিছু ছিল মায়ের কাজে সে সব খরচ করিয়া ফেলিয়াছে,—হাতে এখন একটী পয়সা নাই। একটা হাঁড়িতে কিছু চাল ও গোটাকতক আলু পড়িয়া আছে, সিদ্ধ করিয়া কোনমতে দু-তিন দিন চলিবে, তাহার পর? ঘরের ভাড়া দিতে হইবে, ও-মাসেরটা এখনও দেওয়া হয় নাই, সে দেড় টাকাই বা সে পায় কোথায়?

ভাবনার কূল কিনারা নাই। অন্যমনস্ক ভাবে সে চলিতে চলিতে কখন পথের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, একখানা মোটর চকিত বেগে

আসিয়া এখনই তাহার উপর পড়িয়াছিল আর কি, মাত্র দুই অঙ্গুলী ব্যবধান থাকায় সে বাঁচিয়া গেল।

অবসন্ন পা দুখানা অবসন্ন দেহটাকে টানিয়া ঠিক নিজের ঘরের সামনেই লইয়া আসিল। ঘরের চাবি খুলিয়া রাখাল মেঝেয় বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল এখন সে কি করিবে, কোথায়—কাহার কাছে হাত পাতিয়া দাঁড়াইবে?

দেবানন্দের কথা মনে হইল। সে বড় কাজ পাইয়াছে, তাহাদের কলে যদি সে একটা কাজ জুটাইয়া দেয়।

রাখাল সামনে আশার আলো দেখিতে পাইল। তাড়াতাড়ি উনান ধরাইয়া আলু সিদ্ধ ভাত করিয়া খাইয়া লইল এবং বারটা বাজিবার অনেক আগেই আবার বাহির হইয়া পড়িল।

সোজা একেবারে শিয়ালদহ ষ্টেশন, সে দেবানন্দের সন্ধানে হুগলী চলিয়াছে, দেবানন্দ উপস্থিত হুগলীতে আছে।

ট্রেণের একখানা কামরায় উঠিয়া বসিয়া সে বাহির পানে তাকাইয়াছিল। কত লোক আসা-যাওয়া করিতেছে, সবাই অচেনা, ইহারাই মধ্যে একজন পরিচিতকে দেখিয়া রাখাল একেবারে চমকাইয়া উঠিল।

ও কে, ইথার নয় কি? হাঁ, সেই তো। সে একা, সঙ্গে কেহ নাই। সম্ভব যে ট্রেণখানি এইমাত্র আসিয়া দাঁড়াইল সেইখানি হইতেই সে নামিল; তাহার হাতে একখানা বই মাত্র, আর কিছু নাই।

রাখাল তাকাইয়া রহিল,—বহুদিন পূর্ব্বের একটী দিনের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। ইথার নিজের হাতে ফুলের তোড়া তৈয়ারী করিয়া তাহাকে উপহার দিয়াছিল সে কথা রাখাল ভুলে নাই। ধনী কাহাকেও কিছু দিয়া ভুলিয়া যায় কিন্তু যে দরিদ্র সেই দানটী পায় সে

জীবনে কোনদিনই তাহার কথা ভুলে না, ভুলিতে পারে না, দরিদ্রের বৈশিষ্ট্য এইটুকু।

"এ কি, রাখালদা যে—কোথায় চলেছ ?"

হঠাৎ এই কথায় রাখাল অত্যন্ত সচকিত হইয়া উঠিয়া দেখিল ট্রেণের সামনে ইথার। ও-দিকে অত্যন্ত ভিড় বলিয়া সে এই প্ল্যাটফর্ম্ম দিয়া চলিয়াছে, রাখালকে দেখিয়া সেও বড় কম বিস্মিত হয় নাই।

রাখাল কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। লজ্জায় তাহার বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল—ধরা, তুমি দু-ফাঁক হও আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। তাহার হীনবেশভূষা তাহাকে ইথারের কাছে কতখানি হীন প্রতিপন্ন করিতেছে তাহাই মনে করিয়া সে মাথা নত করিল।

ইথার চলিয়া গেল না, দরজা ধরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "এ রকম দেখছি কেন, মাথার চুল কোথায় গেল, কি হয়েছে রাখালদা ?"

একটা হেতু খুঁজিয়া পাইয়া রাখাল যেন বাঁচিয়া গেল, মুখ তুলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার মা নেই সেই জন্যে—"

"বুঝেছি, আর বলতে হবে না।"

সমবেদনায় ইথারের হৃদয়টা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সে দয়ার্দ্র নেত্রে এই হতভাগ্য মাতৃহারার পানে তাকাইল। সেই জন্যই এমন অবস্থা, এমন চেহারা।

ইথার জিজ্ঞাসা করিল, "এখন যাচ্ছো কোথায় ?"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রাখাল বলিল, "হুগলি যাচ্ছি, দরকার আছে। তুমি কোথা হতে আসছ ?"

ইথার একটু হাসিয়া বলিল, "অনেকদূর হতে, আমি কুষ্টিয়ায় গিয়েছিলুম, আজ ফিরছি। কিন্তু এই তো তুমি কলকাতাতেই আছ, একদিন আমাদের বাড়ী যেতে পারলে না রাখালদা ? তোমায় কতবার

না বলেছিলুম একবার আমাদের বাড়ী যেয়ো, তুমি যে কি রকম মানুষ বুঝি নে,—একটীবার গেলে না।"

অস্ফুটস্বরে রাখাল কি বলিল তাহা ইথার বুঝিল না, বলিল, "কবে ফিরছ বল দেখি, কোথায় থাক বলে দাও।"

কোথায় যে সে থাকে তাহা রাখাল বলিতে পারিল না। সেই তো নোংরা অন্ধকার ঘর, যদিই কোন দিন এই অসমসাহসিকা মেয়েটী সেখানে গিয়া উপস্থিত হয়।

বলিল, "আজও ফিরতে পারি, আবার দুই এক দিন দেরীও হতে পারে। থাকি হাতীবাগানে—সে যাক, আমি ফিরে এসে একদিন তোমাদের বাড়ী নিশ্চয়ই যাব কথা দিচ্ছি।"

গার্ড হুইসাল দিল, ইঞ্জিনে বাঁশী বাজিল, সমস্ত ট্রেণখানা দুলিয়া উঠিল।

ইথার তফাতে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আবার যেন গা ঢাকা দিয়ো না। আমি কিন্তু তোমার আশায় থাকব, একদিন অতি অবশ্য করে এসো ভুলো না যেন।"

ট্রেণ ছুটিল, রাখাল জানালা পথে মুখ বাড়াইয়া দেখিল ইথার তখনও দাঁড়াইয়া আছে, যেন সে কি ভাবিতেছে।

বাঁকের মুখে গিয়া গাড়ী ঘুরিয়া গেল, ইথারকে আর দেখা গেল না, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রাখাল মুখ ফিরাইল।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে ইথারকে সে দেখিয়াছিল, তখন ইথার ছিল তরুণী কিশোরী, বয়স ষোল সতের মাত্র, আজ সে পূর্ণ যুবতী, তাহার বয়স বাইশ তেইশ। সৌন্দর্য্য তাহার দেহের কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে, আজ তাহার মধ্যে চপলতা নাই, গাম্ভীর্য্য আসিয়াছে। তথাপি সে সেই ইথারই আছে, রাখালকে সে আজও ভুলে নাই।

রাখাল ভাবিতেছিল—কই, ইথার তো, তাকে ঘৃণা করিল না,—একটী দৃষ্টিপাতেই সে তো তাহাকে চিনিয়া ফেলিল।

ট্রেণ একে একে কয়টা ষ্টেশন পার হইয়া গেল, এইবার রাখাল সচেতন হইয়া উঠিল—হুগলী আসিতেছে, তাহাকে নামিতে হইবে।

ট্রেণ গঙ্গা-ব্রীজ পার হইয়া গেল; রাখালের কামরা তখন যাত্রীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

দেবানন্দের সন্ধানে সে হুগলী যাইতেছে, কিন্তু সে যদি সেখানে না থাকে।

মাসখানেক আগে দেবানন্দের সন্ধান সে পাইয়াছিল, সে নাকি স্বদেশী ব্যাপারে মিশিয়াছে। দেবানন্দকে সে পত্র দিয়াছিল কিন্তু তাহার কোনও উত্তর সে পায় নাই।

হুগলী ষ্টেশনে ট্রেণ থামিতেই সে নামিয়া পড়িল।

দেবানন্দের বাড়ীর সন্ধানে একঘণ্টা পূর্ণ চেষ্টা করিয়া সে ব্যর্থ হইয়া গেল। ঠিক দুপুর বেলা পথে বেশী লোকজনও নাই, যা দুই একজন দেখা যাইতেছে তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলে কথা কানে দেয় না; যদিও উত্তর দেয়, সে দারুণ বিরক্তিব্যঞ্জক—"দেখে নিনগে মশাই, কে আপনার দেবানন্দ, আমরা ওকে চিনি নে।"

অবশেষে একটী ছেলের কাছে সে সন্ধান পাইল,—"আপনি দেবানন্দ বাবুর খোঁজ করছেন, তিনি তো জেলে রয়েছেন।"

জেলে—দেবানন্দ জেলে,—কথাটা শুনিয়া রাখাল যেন আকাশ হইতে পড়িল।

সে শুনিতে পাইল সত্যই দেবানন্দ জেলে গিয়াছে; চুরি জুয়াচুরী অথবা ডাকাতির অপরাধে নহে—স্বদেশী মামলায়। এখনও তাহার বিচার শেষ হয় নাই, আগামী সোমবারে তারিখ পড়িয়াছে।

স্বদেশী মামলায়—রাখালের দুইটী চক্ষু দৃপ্ত হইয়া উঠিল। দেবানন্দ কি যে সে ছেলে, সে আগুন কি ছাই চাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখিবার? কতক্ষণ তাহা চাপা থাকিবে, এক সময় না এক সময় দৃপ্ত হইয়া উঠিবেই যে।

রাখালের অন্তর পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আজ প্রথম তাহার মনে হইল সেও যদি দেবানন্দের মত কাজ করিতে পারিত।

চাকরী রসাতলে যাক; চাকরী করা মানেই দাসত্ব করা। দেবানন্দ সার বুঝিয়াছে, সে তাই অত বড় কাজ ছাড়িয়া দিয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল।

সন্ধ্যার ট্রেণে রাখাল আবার রওনা হইল। একবার মনে হইল—সে এখন কি করিবে, কেমন করিয়া সে দিন চালাইবে? চাকরী ছাড়া আর উপায় কি, শুকাইয়া কেমন করিয়া সে মরিবে?

রাত্রি দশটায় সে শিয়ালদহে নামিল, বাসায় পৌছিতে সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল।

ঘরের তিনটী অধিবাসীর মধ্যে দুইজন গভীর নিদ্রাগত, কেবলমাত্র ভূপাল একা জাগিয়া আছে। সে এই ছেলেটীকে যথার্থ ভালবাসিত, কাহাকেও কিছু না বলিয়া হঠাৎ সে এইরূপে অদৃশ্য হইয়া যাওয়ায় একমাত্র ভূপালই চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল।

রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া রাখাল ডাকিল, "ভূপাল—"

"কে, দা-ঠাকুর—"

ভূপাল লাফাইয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাখাল।

ভূপাল বলিল, "তোমার তো বেশ আক্কেল দা-ঠাকুর, একটা খবর না দিয়ে কাউকে কিছু না বলে চুপ চাপ কোথায় সরে গেছলে বল দেখি? ভাবনায় মরি আর কি? যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই

হাসে, বলে—তোমার দা-ঠাকুর তো কচি খোকা নয় যে পথে ঘাটে হারিয়ে যাবে।"

পৃথিবীতে যদি কেহ তাহাকে ভালবাসে তবে সে একমাত্র ভূপাল তাহা রাখাল জানিত; সে একটু হাসিল, বলিল—"কাজটা গেল শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেল, সেই জন্যে দেবানন্দের কাছে হুগলীতে গিয়েছিলুম।"

ভূপাল বলিল, "কাজের চেষ্টায়?"

রাখাল বলিল, "উদ্দেশ্যটা তাই ছিল বটে, তা আর হয়ে উঠল না, সে জেলে রয়েছে।"

অবাক হইয়া গিয়া ভূপাল বলিল, "জেলে রয়েছে কেন?"

রাখাল বলিল, "স্বদেশী মামলায়।"

বিরক্ত হইয়া ভূপাল বলিল, "ওই তো, ওতে যে কত ছেলে গেল তার ঠিক নেই। কেউ বা সত্যি মন্দ কাজ করে জেলে যাচ্ছে, কেউ বা কিছু না করেই জেলে যাচ্ছে। আর কষ্টও তো বড় কম নয়। কেন রে বাপু, বাইরে দিব্যি খেয়ে বেড়িয়ে বেড়াস, ইচ্ছে করে সরকারের শত্রুর কাজ করে জেলে যাওয়ার দরকার কী? ওইতে বলে না—সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, এ হয়েছে ঠিক তাই।"

রাখালের তর্ক-প্রবৃত্তিটা অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিল, সে বলিল, "ও কথাটী বলো না ভূপাল, দেশের কাজ করা এমন কিছু পাপ নয় যার জন্য এত বড় শাস্তি পেতে হবে। দেশের কাজ অর্থে সরকারের—"

ভূপাল অকস্মাৎ তাহাকে থামাইয়া দিল, "থাক থাক, আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজে আমাদের কোনও লাভ নেই। এখনকার যা কথা আমাদের মধ্যে তাই হোক। এ-বেলার খাওয়া-দাওয়া

কিছু হয়েছে না ও-বেলার সেই দুটো ভাতে ভাত খেয়েই রাতটাও কাটাবে ?"

লজ্জিত হইয়া রাখাল বলিল, "এ-বেলা আমার জন্যে কে খাবার নিয়ে বসেছিল সেখানে যে যাওয়া মাত্র খাবার দেবে ? এত রাত্রে আর কি উপায় করব বল, এমনিই থাকা যাক, কাল ভোরে উঠে যা হয় রেঁধে খেলেই চলবে।"

ভূপাল জিজ্ঞাসা করিল, "খিদে হয়নি বুঝি ?"

রাখাল বলিল, "খিদে বেশই আছে, উপায় নেই যখন তখন আর কি করা যাবে ? আর কতটুকুই বা রাত আছে, এ রাতটুকু ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাবে এখন।"

ভূপাল বলিল, "আমি আজ ভাত করিনি, রুটি করে রেখেছি, তাই দু'চারখানা খেয়ে নাও দা-ঠাকুর, কি বল ?"

চমৎকৃত হইয়া গিয়া রাখাল বলিল, "হঠাৎ রুটি করবার মানে ? তা'হলে বোধ হয় ভেবে রেখেছিলে আমি রাত্রে আসব ?"

কথাটা সত্যই, ঠিক তাহার কথা ভাবিয়াই ভূপাল আজ ভাত রাঁধে নাই, রুটি কিছু বেশী করিয়াই প্রস্তুত করিয়াছিল। নিজের প্রস্তুত তরকারী তাহাকে দিতে পারিবে না বলিয়াই দুই পয়সার চিনি ও একটা সন্দেশ কিনিয়া আনিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু মুখে সে কিছুতেই তাহা স্বীকার করিল না, বলিল, "কেন গরীব বলে আমার কি একদিন রুটি খেতে নেই দা-ঠাকুর, রোজই ভাত খেতে হয় ? নাও, আর কথা বলো না, হাত পা ধুয়ে খেতে বসো, ওরা আবার ঘুমুচ্ছে, ঘুম ভেঙ্গে যাবে।"

হাত পা ধুইয়া রাখাল খাইতে বসিল। শুধু চিনি ও সন্দেশ রুটির উপাদান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তরকারি নেই বুঝি ?"

সঙ্কুচিত হইয়া ভূপাল বলিল, "আছে কিন্তু তোমাকে আমার তরকারি দেব কি ক'রে দা-ঠাকুর? তুমি বামন আর আমি জাতে কৈবর্ত্ত, আমার রান্না জিনিস খেলে তোমার জাত যাবে না?"

রাখাল হাসিয়া বলিল, "জাত যাবে না ভূপাল, জাত যেত যদি আমার মা বেঁচে থাকতেন, বিধর্ম্মী ছেলের হাঁতের জল তাঁর মুখে পড়বার ভয়ে এতদিন এত কষ্ট করেও কাটিয়েছি। আর সে সব ভয় নেই, আমি পৃথিবীতে একলা, কাজেই আমার জাত নেই। তুমি তোমার তরকারী নিয়ে এসো ভূপাল আমি খাব।"

তাহার জিদে পড়িয়া অগত্যা সঙ্কুচিতভাবে ভূপাল তাহার প্রস্তুত তরকারী আনিয়া দিল।

১৭

প্রকাণ্ড গেটযুক্ত বড় বাড়ীটার সামনে দাঁড়াইয়া রাখাল যেন দিশাহারা হইয়া গেল।

দ্বারে দ্বারোয়ান দাঁড়াইয়া ছিল, লোকটাকে চুপ-চাপ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাও, কাকে দরকার?"

সাহসে ভর করিয়া রাখাল বলিয়া ফেলিল, "ইথার নামে একটী মেয়ে এখানে থাকে না, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

ইথার—দ্বারোয়ান ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রাখালের পানে তাকাইল; বলিল, "কাগজে নাম লিখে দাও।"

রাখাল তাহারই নিকট হইতে কাগজ পেন্সিল চাহিয়া লইয়া নিজের নাম লিখিয়া দিল, দ্বারোয়ান তাহাকে দাঁড়াইতে বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

রাখাল বড় বাড়ীটার পানে তাকাইয়া দেখিতেছিল, একবার দৃষ্টি ফিরাইয়া নিজের পানে তাকাইল। আজ সে যথাসম্ভব যত্নে ভদ্রলোক সাজিয়া আসিয়াছে। নিজের জুতা নাই, হরেনের জুতা জোড়াটা তাহার পায়ে ঠিক হইয়াছিল; এবেলার মত তাহা ধার করিয়া লইয়াছে।

কাপড় ও সার্টটী কাল সাবান দিয়া শুকাইয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহাই পরিয়া আসিয়াছে। নাঃ, নেহাৎ ছোটলোক—কুলি মজুরের মত দেখাইতেছে না, ভদ্রলোকের মতই দেখাইতেছে।

দ্বারোয়ান ফিরিয়া আসিল, বলিল, "এই সামনের ঘরে যান বাবু, দিদিমণি এখনই আসছেন।"

তাহার নির্দ্দেশে গেটের ভিতর দিকে সামনেই যে বড় বসিবার ঘরটী ছিল রাখাল সেই ঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল।

লেসের স্ক্রীন সরাইয়া ঘরের ভিতর দিকে তাকাইয়া সে একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেল। ঘরের মেঝে বহুমূল্য কার্পেটে আচ্ছাদিত, তাহার উপর মূল্যবান টেবল চেয়ার কৌচের সংখ্যাধিক্য, গৃহের দেয়ালে বড় বড় আয়না, দেয়ালে কি সুন্দর কাজ করা।

দরিদ্র রাখাল জুতাসুদ্ধ কার্পেটে পা দিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিল, সে বাহিরে জুতা খুলিয়া সন্তর্পণে ভিতরে প্রবেশ করিল। চেয়ারে বসিতে পারিল না, টেবলে ভর দিয়া চারিদিকে মাথা ফিরাইয়া সে কেবল দেখিতে লাগিল।

"এই যে এসেছ রাখালদা, যাক, তোমার কথা ঠিক হয়েছে দেখছি—"

ইথারের কথা শুনিয়া রাখাল মুখ ফিরাইল, তাহার বুকের মধ্যে তখন ঢিপ ঢিপ করিতেছিল। ইথার বলিল, "দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, একখানা চেয়ারে বসে পড়।"

রাখাল একখানা চেয়ারে বসিল, ইথার টেবলের অপর পার্শ্বস্থিত চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, "তার পর, কবে এলে হুগলী হতে?"

রাখাল বলিল, "সেই দিনই এসেছি।"

ইথার বলিল, "সেও তো আজ ঠিক এক সপ্তাহের কথা, এ এক সপ্তাহের মধ্যে আসবার সময় পাওনি বুঝি?"

রাখাল একটু হাসিল, বলিল, "সময় তোমাদের যতটা মেলে আমাদের মত গরীবদের ততটা মেলে না সে কথা বোধ হয় কোনদিন মনেও কর না ইথার।"

অপ্রস্তুত হইয়া ইথার বলিল, "ঠিক কথাটাই বলেছ রাখালদা, আমরা নিজেদের সময়ের ওজন বুঝে অন্যেরটা দেখি, অন্যের দেখে নিজের দেখিনে। যাক গিয়ে, কি কাজ করছ?"

রাখাল ঠিক করিয়া আসিয়াছিল কোন কথা সে গোপন করিবে না, তাহার প্রকৃত পরিচয় সে নিজেই দিবে। মিথ্যা কথা সে বড় একটা বলিত না আজও বলিল না, বলিল,—"আমার কাজ কুলিগিরি, আর কি?"

"কুলিগিরি—" ইথার অবাক হইয়া তাহার পানে তাকাইল।

শুষ্ক হাসিয়া রাখাল বলিল, "আর কি করব বল? লেখাপড়া শিখতে পারলুম না যে ভদ্রলোকের উপযুক্ত কাজ করতে পারব কাজেই কুলিগিরি কাজ করা ছাড়া আর উপায় কি?"

ইথার খানিকটা চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "কেন, লেখাপড়া তো শিখছিলে, ছেড়ে দিয়ে পালালে কেন?"

রাখাল সোজা হইয়া বসিল, বড় বড় দুইটী চোখের দৃষ্টি ইথারের মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, "কেন যে পালিয়েছিলুম তা আর কেউ না জানুক তুমি তো জানো ইথার, আর সেই জন্যেই কি তুমি আমায় এখানে আসবার কথা বল নি? আমার মত নির্য্যাতন কয়জন সহ্য করেছে বল দেখি? তবু তুমি কতটুকু জানো—কতটুকু দেখেছ, তার চেয়েও অনেক বেশী আমি সহ্য করেছি, পেটে খেতে পর্য্যন্ত পাই নি। বড় কম নির্য্যাতনে আমি পালাইনি ইথার, সহ্যের অতীত হওয়াতেই পালিয়েছি।"

ইথার বলিল, "পালিয়ে আমাদের এখানে এলে না কেন, আমি তোমার পড়ার ব্যবস্থা করে দিতুম।"

রাখাল আবার হাসিল, বলিল, "অদৃষ্টে আছে মজুরের কাজ,

লেখাপড়া শিখব কি করে? লেখাপড়া শেখা অদৃষ্টে না থাকলে হয় না, এ যে মন্দ কপাল, অত ভাল কি হয়?"

সে একবার নিজের কপালে হাত দিল।

ইথার নিঃশব্দে তাহার মলিন মুখখানার পানে তাকাইয়া রহিল।

রাখাল খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমার কথা তো অনেক জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কথা এ পর্য্যন্ত একটাও জিজ্ঞাসা করিনি। তুমি কি এখনও পড়ছ? বিয়ে তো হয় নি দেখতে পাচ্ছি।"

বিমর্ষতাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া ইথার বলিল, "কি করে জানলে আমার বিয়ে হয়নি?"

রাখাল বলিল, "বিয়ে হলে মাথায় সিঁদূর থাকত যে।"

ইথার হাসিমুখে বলিল, "আজকাল অনেকে ইচ্ছে করে সিঁদূর পরে না তা বোধ হয় জানো না?"

রাখাল কেবল তাকাইয়া রহিল, কথা বলিল না।

ইথার বলিল, "না না, তোমার কথাই সত্যি রাখালদা, আমার আজও বিয়ে হয় নি, বিয়ে যে করব সে ভরসাও নেই। কি করছি তাই জিজ্ঞাসা করছ, আমি এইবার এম-এ, পরীক্ষা দিয়েছি।"

রাখাল মাথা নত করিল।

ইথার এম-এ, ডিগ্রিধারিণী, আর সে?

তাহার মনের ভাব ইথার সহজেই ধরিতে পারিল, শান্তকণ্ঠে বলিল, "তাতে কি হয়েছে রাখালদা, বেশ বুঝেছি তুমি লেখাপড়া না শেখার জন্যে লজ্জা পাচ্ছো। না হয় লেখাপড়া শেখনি কিন্তু মানুষ তো তুমিও বটে, ভাল মন্দ বোধ করবার শক্তি আমার যেমন আছে তোমারও তেমনি আছে, এম-এ, পাস করছি বলে আমার কিছু চারখানা হাত পা বার হয় নি।"

রাখাল মুখ তুলিল, শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "না সেজন্যে নয়, তবে—"

বেহারা একখানা কার্ড লইয়া প্রবেশ করিল এবং টেবলের উপর রাখিয়া দাঁড়াইল ; ইথার সেখানা তুলিয়া লইয়া মুখ বিকৃত করিল।

রাখাল তাড়াতাড়ি বলিল, "আমি এখন যাই, এর পরে আর একদিন না হয়—"

বাধা দিয়া ইথার বলিল, "হ্যাঁ ; তুমি আর একদিন যা আসবে তা জানাই যাচ্ছে।—বেয়ারা, বাবুকে জানাও, আমার এখন দেখা করবার সময় হবে না, ওবেলা আসতে বলে দাও।"

"আমি এখানেই আছি ইথার, হয়তো চলে যেতুম, কিন্তু এর পর চলে যাওয়া হলনা আমায় এখানেই আসতে হল—"

দরজার উপর দণ্ডায়মান নরেশকে দেখিয়া রাখাল একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আরক্তমুখে ইথার বলিল, "এ তোমার ভারি অন্যায় যে তুমি—"

বাধা দিয়া নরেশ বলিল, "থামো আগে আমায় কথা বলতে দাও। এই যে ভদ্রলোকটীকে তুমি সাদরে চেয়ারে বসিয়েছ, যার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে আমায় সরিয়ে দিতে চাচ্ছিলে, তার সম্পূর্ণ পরিচয় তুমি জানো কি?"

রাখাল কথা বলিতে উদ্যত হইবামাত্র ইথার বাধা দিল,—চুপ—

তাহার পর নরেশের পানে তাকাইয়া সে বলিল, "হ্যাঁ, পরিচয় আমি বেশ জানি।"

দৃপ্তকণ্ঠে নরেশ বলিল, "আমি বলছি তুমি জানো না। ছয় বছর আগে যে রাখালকে তুমি দেখেছিলে তার পরিচয় তুমি জানতে, কিন্তু এখন যে ভদ্রলোকের বেশে তোমার সামনে বসে আছে সেই অসচ্চরিত্র মাতাল রাখালের পরিচয় তুমি পাওনি।"

"অসচ্চরিত্র—মাতাল ?"

রাখাল গর্জ্জিয়া উঠিয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিল।

ইথার পাংশুমুখে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, নরেশ রাখালের গর্জ্জনে ভয় পাইল না ; বলিল, "হ্যাঁ, আমি বলছি ইথার আমার কথায় বিশ্বাস কর। তুমি শিক্ষিতা মেয়ে, জেনে শুনেও একজন অসচ্চরিত্র মাতালের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না বলেই জানি, আর সেই জন্যেই তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি। এ রকম প্রকৃতির লোককে বাড়ীতে আসতে দিলে তোমাদের—বিশেষ করে তোমার নামে—"

ইথার ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "লোকের কথা আমি কোনদিনই ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিনে এ-কথা তুমি বেশই জানো, কাজেই ও-কথা তুলে তুমি আমায় ভয় দেখাতে পার না।"

অকস্মাৎ আহত হইয়া নরেশ থতমত খাইয়া গেল, বলিল, "না, তোমায় আমি ভয় দেখাচ্ছি নে, তবে অনেকে অনেক কথা বলতে পারে কেবল তাই বলছি।"

ইথার বলিল, "সে আমি বুঝে নেব, তা নিয়ে তোমায় এখন মাথা গরম করতে হবে না।—রাখালদা—"

রাখাল তখনও ক্রোধে কাঁপিতেছিল, সে কোন উত্তর দিল না, কেবল মাত্র চোখ তুলিয়া ইথারের পানে তাকাইল।

ইথার বলিল, "তোমায় আমি জবাবদিহী করতে বলব না, কারণ তুমি যাই হও, যে অপমান আজ আমার বাড়ীতে এসে আমারই সামনে নিঃশব্দে সহ্য করলে তাই যথেষ্ট, এর পরে এর সত্য মিথ্যা নিয়ে আমি যাচাই করে তোমায় আরও অপমান করব না। তুমি চলে যেতে চাচ্ছিলে, আমি যদি যেতে দিতুম তাই ভাল হত। তুমি যাও, আর কোনদিন এদের সম্পর্কের জের নিয়ে আমাদের বাড়ী এসো না। যে-দিন আমি

বুঝব আমি আত্মীয়তার দাবী কাটাতে পেরেছি সেইদিন তোমায় ডাকব—তার আগে নয়।"

তাহার কণ্ঠস্বরে যে বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা রাখালের অন্তরকে আঘাত দিল। তাহার চোখ দুইটী একবার দৃপ্ত হইয়া উঠিল, মনে হইল—সগর্জ্জনে সে জানাইয়া দেয় নরেশের সব কথা মিথ্যা, সে অশিক্ষিত হইতে পারে, শ্রমজীবির কার্য্য করিয়া নিজের জীবিকার্জ্জন করিতে পারে, তাহা বলিয়া সে মাতাল নয়, সে অসচ্চরিত্র নয়।

কিন্তু সে একটা কথাও বলিল না, বলিতে পারিল না, অভিমানে ক্রোধে ক্ষোভে তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সে ধীরপদে বাহির হইয়া গেল।

যেদিন হরিশ রাখালকে ডাকিয়া সহজেই তাহার নাগাল পাইল সেদিন ভূপাল বাসায় ছিল না। শনিবার দিন সে কালিঘাটে যাইত, প্রতি শনিবার তাহার কালী দেখা চাই-ই।

আসলে সে ছিল পূরামাত্রায় আস্তিক হিন্দু, নিজে সে কৈবর্ত্ত বলিয়া তরকারী ভাত কোনদিন রাখালকে দিতে পারে নাই, পাছে তাহার পাপ অর্শে।

রাত্রি নয়টার সময় ভূপাল ফিরিয়া আসিল, তখনও রাখাল হরিশ ফেরে নাই, মোহিতও তাহাদের সঙ্গে গিয়াছে।

পার্শ্বের ঘরের অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা করিয়া ভূপাল জানিতে পারিল, রাখাল হরিশ ও মোহিতের সহিত গিয়াছে; কখন ফিরিবে তাহার ঠিক নাই।

ভূপাল এ সংবাদে বিস্মিত হইল বড় কম নয়। রাখালের মত ছেলে আজ হরিশ মোহিতের সঙ্গী হইল ইহাই আশ্চর্য্যের কথা। হরিশ মোহিতের স্বভাব-চরিত্র কাহারও নিকটে অজ্ঞাত ছিল না, ভূপাল সেইজন্য ইহাদের সহিত মিশিত না, রাখালকেও সর্ব্বদা আড়াল করিয়া চলিত।

অনেক রাত্রে দরজায় করাঘাতের শব্দে ভূপালের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, জড়িত-কণ্ঠে হরিশ ডাকিতেছে—"ভূপাল, দরজাটা খোল না ভাই,—বাবা, কি ঘুমই ঘুমচ্ছিস, এত ডাকেও ঘুম ভাঙ্গে না।"

আলো জ্বালিয়া দরজা খুলিয়া সম্মুখে তিনটী বন্ধুকে দেখিয়া ভূপাল সরিয়া দাঁড়াইল; উগ্র বিকট গন্ধ পাইয়া সে নাকে কাপড় চাপা দিল।

আজ রাখালের কি আনন্দ, যেন সে কোনদিনই দুঃখ-কষ্ট কি তাহা জানে না। হরিশ মোহিত ও রাখাল তিনজনে কত অলৌকিক গল্প জুড়িয়া দিল, ভূপাল নিজের বিছানাটা এক পাশে সরাইয়া আনিয়া তাহার উপর শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল এ মাতালদের সংস্রবে আর নয়, এইবার তাহাকে আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িতে হইবে।

রাত্রিটা কেমন করিয়া পোহাইয়া গেল কে জানে। রবিবার সকালে স্নান করিয়া ভূপাল যখন বাহির হইতেছিল তখন রাখালের ঘুম ভাঙ্গিল। রবিবার ছুটির দিনে এত ভোরে ভূপালকে উঠিয়া স্নানাদি সারিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতে দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত ভোরেই চলেছ কোথায় ভূপাল ?"

ভূপাল উত্তর দিল, "আমার এক আত্মীয় এসেছেন বেলেঘাটায়, সেখানে যাচ্ছি।"

রাখাল বলিল, "খাওয়া দাওয়া সেখানেই হবে বোধ হয় ?"

ভূপাল বলিল, "না, ফিরে এসে খাওয়ার যোগাড় দেখা যাবে।"

সে আর বিলম্ব না করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বেলা এগারটার সময় ভূপাল যখন ফিরিল তখন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, হরিশ একসঙ্গে রন্ধন করিয়াছে ও তিনবন্ধু একই স্থানে আহারে বসিয়াছে।

ভূপাল নিষ্পলকে শুধু চাহিয়া রহিল, একটী কথাও বলিল না।

দুপুরের দিকে হরিশ ও মোহিত বাহির হইয়া গেল, ঘরে রহিল কেবল রাখাল ও ভূপাল।

রাখাল ঘুমাইবার চেষ্টায় খানিক চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল, কিন্তু চোখে ঘুম আসিল না। বিরক্ত হইয়া সে উঠিয়া বসিল।

অদূরে ভূপাল পত্র লিখিতেছিল। তাহার পানে তাকাইয়া রাখাল বলিল, "বাড়ীতে পত্র লিখেছ বুঝি ভূপাল ?"

ভূপাল মুখ তুলিয়া উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

খানিকক্ষণ কলমটাকে হাতে লইয়া সে স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "যাই বল দা-ঠাকুর, তোমার এ সব কাজ মোটেই ভাল হচ্ছে না। এ রকম করলে শরীর কয়দিন টেঁকবে বল দেখি?"

রাখাল সব জানিয়াও জিজ্ঞাসা করিল, "কি করছি ভূপাল, কি করলে শরীর টেঁকবেনা?"

ভূপাল বলিল, "আমার কথা শোন দা-ঠাকুর, ওই হরষে আর মোহিতটার সঙ্গে মিশো না। একদিন যা করেছ তা সুধরাবার উপায় এখনও আছে, এখনও সময় আছে এর পরে একেবারে ডুবে গেলে আর কিছুতেই উঠতে পারবে না দা-ঠাকুর।"

রাখাল হাসিল, বলিল, "আমি ডুবলেই বা কার ক্ষতি হবে ভূপাল? সত্যি যা নই দশচক্রে পড়ে যখন তাই হতে হল, তখন সত্যিই হয়ে দেখি না। লোকে মদ খায় কেন তা আমি এইবার বেশ বুঝেছি ভূপাল, মদ খেলে সব ভাবনা মন হতে মুছে যায়, কি আনন্দই না এতে পাওয়া যায়। আমায় ভাল হতে বলো না, ভাল আমি ইচ্ছে করলেই থাকতে পারতুম, কিন্তু আমি ভাল হব না, আমি মন্দ হয়েই থাকতে চাই। কার কি হল না হল, কে কি ভাবলে না ভাবলে তা দেখবার দরকার আমার নেই, আমি নিজে যাতে আনন্দ পাই, তা কেন করব না বল দেখি?"

সত্যই ইহার পর হইতে রাখাল দ্রুত অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাখাল টাকা পায় কোথায়—ভূপাল তাহাই ভাবিতেছিল।

সে আর কোনদিন একটী কথাও বলে নাই, বলিবার আবশ্যকতাও বোধ করে নাই। সে বেশ জানিত মানুষ যখন পিচ্ছিল পথে নামিতে আরম্ভ করে তখন তাহাকে কিছুতেই ধরিয়া রাখা যায় না, সে সরিয়া পড়িবেই।

সে দিন রাখাল আসিল না, তাহার পর দিনও আসিল না। ব্যগ্র ভাবে ভূপাল হরিশকে জিজ্ঞাসা করিল, "রাখাল কোথায়, দুদিন সে যে বাড়ী এল না।"

হরিশ মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "রাখাল তো এবার নবাব হয়ে গেল হে, আর কি এখন রাখালের পাত্তা পাওয়া যাবে ?"

ভূপাল জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম ?"

হরিশ বলিল, "সে একজন খুব বড় লোকের চোখে পড়ে গেছে ; তিনি রাখালের জোয়ান চেহারা দেখে নিজের কাজে বাহাল করেছেন।"

খুসি হইয়া ভূপাল বলিল, "এতো ভাল কথাই। ভদ্রলোক, বামুনের ছেলে, তার কি আমাদের মত লোকের সঙ্গে মিশে ছোট লোকের কাজ করা পোষায় ? এ তবু ভদ্রলোকের ছেলের মতই কাজ হয়েছে, দা-ঠাকুর এবার ভালই থাকবে।"

হরিশ ক্রূর হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ভদ্দর লোকের কাজই বটে। কাজটা কি জানো—বড়লোকের মোসাহেবী করা, তার পদসেবা করা। বাবা, তার চেয়ে বেশ আছি, কারও প্রসাদী খেতে হয় না, নিজে খেটে আমোদ করি, কারও মতে মত মিলাতে হয় না। সে বাবু যা মাতাল, দিনরাত তার বাগান বাড়ীতেই পড়ে থাকেই। রাখালও তো তাই চায় কিনা, তাই না ডাকতে কুকুরের মত ছুটে গেছে। মাইনের বন্দোবস্ত নেই, কিছুনা, কেবল ওই যে মদ খেতে পাবে—ওই লোভেই গিয়ে জুটেছে।"

ভূপাল নীরবে রহিল, তাহার শোনার বাসনা চরিতার্থ হইয়াছিল, ইহার উপর আর কিছু সে প্রশ্ন তুলিল না।

সেই রাখাল—কিন্তু তাহাকে দেখিলে আর সহজে চেনা যায় না। এক বৎসর আগে যে রাখাল হাতীবাগানে খোলার ঘরে বাস করিত তাহার সহিত ইহার সাদৃশ্য থাকিলেও ধরা যায় না।

রাখাল এখন ঘোর বাবু, তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি দুইয়েরই যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শারীরিক কষ্টে তাহার গায়ের উজ্জ্বলবর্ণ কালো হইয়া গিয়াছিল, দেহ রোগা হইয়া গিয়াছিল, এখন সে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে, তাহারা সুন্দর চেহারা আরও সুন্দর হইয়াছে।

দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ এই ছেলেটীকে দেখিয়া প্রসাদবাবুর বড় পছন্দ হইয়াছিল, তাই রাখাল যখন তাঁহার কাছে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তিনি তাহাকে কার্য্যে লইয়াছিলেন।

কাজ বিশেষ কিছুই না, প্রসাদ বাবুর শিশু পুত্র সুকুমারকে দেখা-শুনা করা মাত্র। ছেলেটী মাত্র ছয় সাত বৎসরের, পড়া শুনার জন্য একজন মাষ্টার আছেন, রাখাল এই ছেলেটীর নিকটে নিয়ত থাকিবে, তাহাকে লইয়া বেড়াইবে এই তাহার কাজ।

রাখালের মনিব বাস্তবিকপক্ষে এই ছেলেটী, প্রসাদ বাবুর সহিত তাহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না বলিলেও চলে। বাগবাজারে গঙ্গার ধারে প্রসাদ বাবুর বিশাল অট্টালিকা, লোকজনে পূর্ণ; ভিতর বাটী দেখিবার সৌভাগ্য রাখালের কখনও হয় নাই, কিন্তু ভিতর বাটীও যে পরিপূর্ণ তাহা রাখাল বাহির হইতেই বেশ বুঝিতে পারিত।

বাবু বাড়ীতে খুব কম সময়ই থাকিতেন, বেলা তিনটার সময় তিনি সেই যে মোটর হাঁকাইয়া বাহির হইতেন, সারারাত্রি তাঁহার দেখা মিলিত

না, সকালে আবার ফিরিয়া আসিতেন। শুনা যায় দমদমায় তাঁহার বাগান বাড়ী আছে, সেইখানেই তিনি থাকেন।

প্রসাদ বাবুর সঙ্গী বড় কম ছিল না, তাহারা এ বাড়ীতেও যথেষ্ট যাতায়াত করিত।

সুকুমার রাখালকে ভালবাসিত। এতটুকু ছেলের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া রাখাল আশ্চর্য্য হইয়া যাইত, জ্ঞানের কথাও সে বড় কম বলিত না।

রাখাল এখানে আসিয়া অবধি মদ্যপান একেবারে কমাইয়া দিয়াছিল। এ বিষয়ে যদিও প্রসাদবাবু তাহাকে সতর্ক করেন নাই, তাহার নিজের বিবেক তাহাকে সংযত করিয়াছিল। রাত্রে সেও কতদিন প্রসাদবাবুর বাগানবাড়ীতে গিয়াছে, মদও খাইয়াছে, রাত্রেই আবার সে ফিরিয়াছে, প্রসাদবাবুর অনুরোধ সত্ত্বেও সে বাগান বাড়ীতে থাকে নাই।

শত উপদেশে যাহা হয় নাই, একদিন শিশু সুকুমারের একটী কথায় তাহা হইয়াছিল। সুকুমার একটী মাতালকে পথে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়াছিল—"লোকে মদ খায় কেন বলুন তো—এমনি করে রাস্তায় পড়ে কাদা ধূলো মাখার জন্যেই কি? ছি, আমি মাতালকে বড্ড ঘেন্না করি সরকার মশাই।"

রাখাল যদিও বাজার সরকার ছিল না তথাপি বাড়ীর সকলেই তাহাকে সরকার মশাই বলিয়া ডাকিত।

অন্ততপক্ষে এই শিশুর সম্মুখে নিজের হেয় চরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়া নিজেকে দাগি করিয়া তুলিবে না—রাখালের একমাত্র সঙ্কল্প ছিল তাহাই। সুকুমারকে সে গল্পচ্ছলে যখন পাপ পুণ্যের কথা শুনাইত, তখন সে নিজেই ভুলিয়া যাইত নিজে সে কত পাপ করিয়াছে, এখনও প্রবৃত্তির তাড়নায় সে ছুটিয়া চলে, নিজেকে সামলাইতে পারে না। তখন তাহার মনে হইত, সে ধার্ম্মিক গুরু, এই ক্ষুদ্র ছেলেটী তাহার শিষ্য—তাহার ছাত্র। ইহাকে

গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহাকেই, ইহাকে মানুষ করিতে হইবে তাহাকেই, ইহার পিতাকে নহে।

সে দিন অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিলেও সুকুমার বড় অন্যমনস্ক হইয়াছিল, যেন সে কি ভাবিতেছিল। তাহার অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ্য করিয়া রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে খোকাবাবু?"

খোকাবাবু কোন উত্তরই দিল না।

কিন্তু শিশুর অন্তরে বেশীক্ষণ কোন কথা গোপন থাকে না, তাই বেড়াইতে বেড়াইতে এক সময় সুকুমার বলিয়া ফেলিল আজ তাহার পিতা মাকে খুব বকিয়াছেন, প্রহার পর্য্যন্ত করিতে গিয়াছিলেন, কেবল সুকুমার কাঁদিয়া উঠায় তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গিয়াছেন।

বউরাণী যে এ সংসারে লক্ষ্মীস্বরূপা তাহা রাখাল এ বাড়ীর ছোট বড় সকলের মুখেই শুনিতে পাইয়াছে। অন্তঃপুরের কোনখানে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া এই দয়াবতী নারী বাহিরের সকলের খোঁজ লইতেন, কাহার কি আবশ্যক, কাহার কোনদিন আহারের ত্রুটী হইয়াছে এ সব সংবাদ লইতেন এবং তাহার প্রতিবিধান করিতেন।

এই লক্ষ্মী বধূটীর এই লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া রাখালের মনটাও খারাপ হইয়া গেল।

সুকুমার হঠাৎ এক সময় প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা সরকার মশাই, বলুন তো, বাবা মদ খান কেন? মদ খেলে মানুষের পাপ হয়, তা জেনেও বাবা কেন মদ খান?"

কেন যে খান তাহা রাখাল বলিতে পারিল না। আরও কতদিন সুকুমার এই একই প্রশ্ন করিয়াছে, সে উত্তর দিতে গিয়া দিতে পারে নাই, তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

সে দিন বৈকালে যখন সে সুকুমারকে লইয়া বাহির হইতেছিল সেই

সময় প্রসাদবাবু ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে রাখাল, কাল সকালে আমরা শিকার করতে আমার জমীদারিতে যাব, একটু সকাল সকাল উঠে তৈরী হয়ে নিয়ো, সেখানে দু-চার দিন থাকতে হবে।"

সম্মতি জানাইয়া রাখাল বাহিরে আসিল। মোটর প্রস্তুতই ছিল। প্রত্যহ বৈকালে স্থকুমারকে লইয়া গঙ্গার ধারে গড়ের মাঠে হাওয়া খাইতে যাইতে হইত।

"সরকার মশাই—"

স্থকুমারের করুণকণ্ঠ শুনিয়া রাখাল চমকাইয়া তাহার পানে চাহিল।

স্থকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিও শিকার করবেন সরকার মশাই?"

রাখাল একটু হাসিয়া বলিল, "আগে করতুম না, এখন করব বই কি খোকাবাবু?"

"না সরকার মশাই, আপনি শিকার করবেন না,"—বলিয়া সে আর্ত্ত-ভাবেই রাখালের হাতখানা চাপিয়া ধরিল।

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া রাখাল বলিল, "কেন খোকাবাবু, শিকার তো বেশ ভাল জিনিস, ওতে তোমার এত ভয় হয় কেন? এর পরে বড় হয়ে তুমিও তো শিকার করবে, তোমার বাবার মত শিকারী নাম পাবে।"

স্থকুমার সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আমি শিকারী হব না, আমি রক্ত দেখতে পারি নে, আমার বড্ড ভয় হয়—কান্না পায় সরকার মশাই। বাবা যে এত জীবজন্তু মারেন, বলুন দেখি তিনি একটা জীব-জন্তুকে বাঁচাতে পেরেছেন কি? মানুষ যা তৈরী করতে পারে না কেন তা নষ্ট করে সরকার মশাই?"

বালকের মুখে এ কি জ্ঞানের কথা? রাখাল স্তব্ধ হইয়া স্থকুমারের পানে তাকাইয়া রহিল।

সত্যই মানুষ ভাঙ্গিতে পারে গড়িতে পারে না, জীব-প্রাণ নষ্ট করিতে পারে, একটী প্রাণ দিতে পারে না। তাহার ক্ষমতার অতীত যাহা তাহা করিবার জন্য তবু সে প্রাণপণ করে, কিন্তু তাহা করিতে সমর্থ হয় কি?

নৃশংস পিতার এ কি মহাপ্রাণ পুত্র, এ যে সম্পূর্ণ বিপরীত। রাখালের মনে পড়িয়া গেল, কবে সে প্রহ্লাদ-চরিত্র যাত্রা দেখিয়াছিল, তাহাতে এমনই পিতার এমনই পুত্র।

এ শিক্ষা বউরাণীর, তাহা বুঝিতে রাখালের বিলম্ব হয় নাই এবং এই নারীটির ব্যর্থ জীবনের কথা ভাবিয়া সে কিছুতেই দীর্ঘশ্বাস গোপন করিতে পারে নাই।

এই অত্যাচারী অসচ্চরিত্র স্বামীর স্ত্রী হইয়া বউরাণী কতখানি সুখী তাহা বেশই বুঝা যায়। কোন দিন প্রকৃতির—মতের মিল হয় নাই তথাপি তিনি স্ত্রী, তথাপি এই স্বামীর নিকটে তাঁহাকে থাকিতে হয়, ইঁহার মতের বিরুদ্ধে সত্য যাহা তাহা প্রকাশ করিতে গেলে তাঁহাকে নির্য্যাতনও সহিতে হয়।

রাখাল বউরাণীর পরিচয় জানিয়াছিল। তাঁহার পিতা বম্বেতে বাস করেন, সেখানে ব্যবসায়ে তিনি কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। তিনটী ভাই, একটী আমেরিকা গিয়া আর ফিরে নাই, জ্যেষ্ঠ পিতার ব্যবসায়ে সাহায্য করেন এবং কনিষ্ঠ বিখ্যাত ডাক্তার। তাঁহারা প্রসাদ বাবুকে উপযুক্ত জানিয়াই কন্যা দিয়াছিলেন। বাহির হইতে দেখিয়া এমন একজন ধনী সুপুরুষ ধনী জমীদারের বিচার কেহ করিতে পারেন নাই।

হয় তো এখনও তাঁহারা কেহই প্রসাদ বাবুর পরিচয় পান নাই। মধ্যে মিঃ বসু—বউরাণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুই দিনের জন্য ভগিনীকে দেখিতে

আসিয়াছিলেন, এই দুই দিন চক্ষুলজ্জার জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক প্রসাদবাবু মুহূর্ত্তের জন্য বাড়ী ছাড়েন নাই, নিয়ত মিঃ বসুর সঙ্গে ছিলেন। রাখাল শুনিয়াছে, বউরাণীর পিতা বা দুই ভ্রাতা যখন এখানে আসেন তখন প্রসাদবাবু খুব শান্তশিষ্ট হইয়া দিন কাটান। তাঁহারা বউরাণীর মুখে স্বামীর কথা কিছুই শুনিতে পান নাই ইহা জানা কথা, বউরাণীর মত সহ্যশীলা নারী নিজের কষ্ট নিজের মধ্যেই রাখিয়া দিবেন, মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলিতে পারিবেন না।

বউরাণীর পিতা বৈষ্ণবধর্ম্ম লইয়াছিলেন। তাঁহারই একমাত্র কন্যা বাল্যকাল হইতে কখনও জীবহিংসা দেখেন নাই, এই স্বামীর হাতে পড়িয়াও তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্য এ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন ও প্রধানতঃ এই কারণেই বোধ হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যথার্থ মিলন হয় নাই, স্বামী-স্ত্রীরূপে পরিচিত হইয়াও তাঁহারা পরস্পরের নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া আছেন।

মাতার শিক্ষা একমাত্র বংশধর পুত্রের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে দেখিয়া প্রসাদবাবু উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং সেই জন্যই নিজের অন্তরঙ্গ রাখালের হস্তে পুত্রের ভারার্পণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না, রাখাল ক্ষুদ্র সুকুমারের মনের গতি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিল না, বরং নিজেই এই ছেলেটীর নিকট নত হইয়া পড়িতেছিল।

গ্রামখানি নেহাৎ ছোট নহে, নাম মল্লিকপুর। প্রসাদবাবুর কোন পূর্ব্বপুরুষ এই গ্রামখানি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং নিজেদের উপাধি মল্লিক হইতে মল্লিকপুর নাম রাখেন।

বিরাট অট্টালিকাটি ঠিক নদীর উপরে অবস্থিত। প্রসাদ বাবু মাঝে মাঝে প্রায়ই এখানে আসেন, তাঁহার স্ত্রী-পুত্র মাত্র দুই একবার ছাড়া আর আসেন নাই।

রাখাল এই এক বৎসর প্রসাদ বাবুর আশ্রয়ে আছে, মল্লিকপুরের নাম সে কানে শুনিয়াছে, চোখে দেখে নাই। কারণ প্রসাদ বাবু এক বৎসর এখানে আসেন নাই।

মল্লিকপুরে পৌছাইয়া রাখালের মনে হইল সে যেন তাহার বাল্যকালের পরিচিত পল্লীগ্রামে ফিরিয়া আসিল। গ্রামের পথে চলিতে চলিতে রাখাল বাল্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল।

সেই তেমনই পথের দুধারে গাছগুলি নত হইয়া পথের উপর আসিয়া পড়িতেছে, নারিকেল গাছগুলি মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া। পথের ধারে সবুজ লতাপাতায় ঢাকা মাঝে মাঝে এক একখানি বাড়ী, ধনীর প্রাসাদের পার্শ্বে গরীবের পর্ণ-কুটীর—সবই আছে। পল্লীর বুক কত পাখীর গানে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ একটা আর্ত্ত-কণ্ঠস্বরে রাখাল চমকাইয়া উঠিল। একটী কিশোরী কলসী পূর্ণ করিয়া জল লইয়া যাইতেছিল, এই দলের সম্মুখে পড়িয়া সে সঙ্কুচিতা হইয়া পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রসাদ বাবুর

প্রিয় বন্ধুর দল মেয়েটীকে লক্ষ্য করিয়া কুৎসিত বিদ্রূপ করিতেছিল, অবশেষে দুই তিন জন সাহস করিয়া তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

প্রসাদ বাবু আগেই হাতীতে করিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সঙ্গে থাকিলে ভদ্র কুলকন্যাকে বিদ্রূপ করা এবং তাহার পথ রোধ করা বোধ হয় ইহাদের সাহসে কুলাইত না।

রাখাল এ বেয়াদপী সহ্য করিতে পারিল না, সে তাহাদের ধাক্কা দিয়া সরাইয়া বলিল, "ছিঃ তোমাদের এতটুকু চোখের চামড়া নেই, তাই ভদ্রলোকের মেয়েদের ওপর অত্যাচার করতেও চাও।"

নরেন্দ্রনাথ মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "বাহোবা, আমাদের রাখালচন্দ্রের কর্ত্তব্যজ্ঞান যে বেশ টনটনে আছে দেখতে পাই। বেঁচে থাক বাবা, পথে ঘাটে মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা করতে পারবে।"

রাখাল তাহাদের টানিয়া সরাইয়া দিতে দিতে রূঢ় কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, তা যদি পারি নিজের জন্ম সার্থক মনে করতে পারব। সরে যাও, মেয়েটীকে যেতে পথ দাও।"

মেয়েটী সজল দুইটী চোখ তুলিয়া রাখালের পানে একবার তাকাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। বন্ধুরা ক্রোধে ফুলিতেছিল, কিন্তু বলবান রাখালের সহিত শক্তিতে পারিবে না বলিয়াই তাহারা তখনকার মত চুপ করিয়া গেল, একজন শাসাইল—"চল আগে বাবুর কাছে, তোমায় দেখে নেব।"

রাখাল বলিল, "সেই ভাল, বাবু কি করেন দেখবে চল। এটুকু সত্যি—না হয় তিনি আমার কাছে রাখবেন না, তা বলে মাথাটা তো কেটে নিতে পারবেন না।"

ইচ্ছা করিয়াই সে এই দল হইতে অনেক পিছাইয়া গেল।

গ্রামে প্রবেশের মুখে তাহার মনে যে আনন্দ উৎসাহ ছিল তাহা এই

ব্যাপারে নষ্ট হইয়া গেল, তাহার মনে হইতে লাগিল—এখানে না আসিলেই হইত।

সে যখন জমীদার বাড়ী পৌছাইল তাহার প্রায় আধ ঘণ্টা আগে বাবুর বন্ধুরা আসিয়া পৌছিয়াছেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বাবু আসিবেন বলিয়া ম্যানেজার অনেক আগেই ইলেক্ট্রিক লাইটের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সমস্ত বাড়ীটা লাইটের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সম্মুখের বড় হলঘরে তখন চা পানের ব্যাপার চলিতেছিল, প্রসাদবাবুও সেখানে ছিলেন। রাখাল প্রবেশ করিবামাত্র তিনি ডাকিলেন, "এই যে রাখাল, এতক্ষণ ছিলে কোথায়, এত দেরী হল কেন? এদিকে এসো, বসো, চা দিতে বলি।"

নিজের পার্শ্বস্থ চেয়ারখানা তিনি যে রাখালের জন্য রাখিয়াছিলেন তাহা দুই একজন জানিলেও সকলে জানে নাই। রাখালের এতটা সম্মানে অনেকেই ঈর্ষান্বিত হইল।

রাখালকে চা দিবার আদেশ দিয়া প্রসাদ বাবু বলিলেন, "তার পর, আজ আসতে আসতে পথে হঠাৎ বিভ্রাট বাধিয়েছিলে কেন?"

কথাটা ইহারই মধ্যে যাহারা প্রসাদ বাবুর কানে তুলিয়া দিয়াছে তাহাদের পানে তীব্রদৃষ্টে তাকাইয়া রাখাল বলিল, "আমি বাধাই নি হুজুর, ওরা বাধাবার চেষ্টায় ছিল, আমি ঘটতে দেই নি।"

আনুপূর্ব্বিক ঘটনা শুনিয়া প্রসাদ বাবু বলিলেন, "তাই তো, ভদ্রলোকের মেয়েছেলেদের ওপর এ-রকম ব্যবহার করা তোমাদের ভারি অন্যায় হয়েছে নরেন। এর পর লোকে বলবে এখানকার জমীদার বাড়ীর মেয়েদের মান-ইজ্জত রাখেন না। আশা করছি এ রকম ব্যবহার তোমরা আর কেউ করবে না, আমার মুখ যাতে না হাসে তাই করবে।"

অনুচরদের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

প্রসাদবাবু প্রতিবৎসর যখনই গ্রামে আসিতেন গ্রামের লোকের জন্য যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতি দিতেন।

এবারও কলিকাতা হইতে একটী বিখ্যাত থিয়েটার আনার ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গেল।

মানুষ টাকা থাকিলে কিরূপে অবাধে খরচ করিয়া উড়াইয়া দেয় রাখাল তাহাই দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতেছিল। প্রসাদবাবু যে ভাবে টাকা খরচ করিতেছেন তাহাতে তাঁহার একমাত্র পুত্রের জন্য ভবিষ্যতে যে কিছুই রাখিয়া যাইবেন না ইহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। প্রসাদবাবুর এতগুলি বন্ধু আছে কেহই একদিনও তাঁহাকে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয় নাই। ইহার পরে হয় তো তাঁহাকে ভিক্ষাপাত্র হাতে লোকের দ্বারে দাঁড়াইতে হইবে সে কথাও কেহ বলে নাই। বরং যাহাতে বেশী খরচ হয় সেই দিকেই সকলে তাঁহাকে টানিতেছে।

গ্রামের যে কেহ আসিয়াছিল প্রসাদবাবু কাহাকেও রিক্তহস্তে ফিরান নাই। তাহারা যখন আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছিল তখন প্রসাদ-বাবুর মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল মাত্র।

বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন মহাশয় গ্রামের চণ্ডীতলায় একটী মন্দির তুলিয়া দিবার জন্য প্রসাদবাবুকে বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিলেন।

প্রসাদবাবু গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "দেখুন ও-সব পুণ্যের কাজ আমার দ্বারা হবে না, ও-কাজ বরং আমার ছেলের জন্যে থাক। আর বছর দশেক পরেই সে মানুষ হবে তখন বরং তাকে ধরলে সে আপনাদের এই সব কাজ করে দেবে। আমার ছেলে বলে ভয় পাবেন না যেন, সে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ জন্মেছে, পরম বৈষ্ণব, একটা মাছি মরলে তার জন্যে কাঁদতে বসে।"

বলিতে বলিতে তিনি হাসিয়া উঠিলেন। ন্যায়রত্ন বলিলেন, "আপনাকে যখন ধরেছি তখন সহজে আর ছাড়ছিনে। আপনার ছেলের জন্যে এখনও ঢের কাজ রইল, আপনিও না হয় পুণ্যের কাজ দুই একখানা করে দিন।"

চমকাইয়া প্রসাদবাবু বলিলেন, "পুণ্য কাজ আমার ধাতে সয় না মশাই কাজেই—"

ন্যায়রত্ন চাপিয়া ধরিলেন,—"তা বললে হবে না মশাই, আপনি না হয় অর্দ্ধেক দিন, বাকি অর্দ্ধেক আমরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা করে তুলব।"

মাথা নাড়িয়া প্রসাদবাবু বলিলেন, "সেটী হবে না ন্যায়রত্ন মশাই, দেই যদি আমিই সব দেব, আর কারও একটা পয়সা নেব না। আচ্ছা নিন, আমি তিন হাজার টাকা দিচ্ছি, এতে একটা ছোট মন্দির হবে না, না হয় আর যদি কিছু লাগে আমার ম্যানেজারকে জানাবেন, তিনি আমায় জানালেই টাকা পাঠাব।"

তৎক্ষণাৎ একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া তিনি ন্যায়রত্নের হাতে দিলেন।

এতটা আশা ন্যায়রত্ন করেন নাই। আনন্দে হাসিয়া বলিলেন "যে আজ্ঞে, মন্দিরটা আপনার নামেই প্রতিষ্ঠা হবে তো?"

প্রসাদবাবু যেন জ্বলিয়া উঠিলেন, "আমার নামে,—কেন, আমি টাকা দিচ্ছি বলে? না না, আমার নামে হবে না, কিছু লিখতে হবে না, সাধারণের নামে করবেন।"

"যে আজ্ঞে—" ন্যায়রত্ন চলিয়া যাইতেছিলেন, প্রসাদবাবু তাঁহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন, "আচ্ছা, এক কাজ করবেন, আমার ছেলে স্থকুমারের নামে মন্দির করবেন, তার নামটাই দেবেন। আর দেখুন, তার মঙ্গলের জন্যে একটা স্বস্ত্যয়ন করে দেবেন, সে জন্যে একশটা টাকা নগদই আপনি আজ পাবেন এখন।"

স্থায়রত্ন বলিতে গেলেন, "আর আপনার জন্যে—"

চটিয়া উঠিয়া প্রসাদবাবু বলিলেন, "আমার জন্যে কি ? আমার ও-সব দেব-দেবীতে মোটেই ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই মশাই। মিথ্যে কথা বলব না, আমার বিশ্বাস না থাকায় আমি এ পর্য্যন্ত কোন ঠাকুর দেবতা দেখি নি, নমস্কারও করি নি। তবে ছেলেটার জন্যে—হ্যাঁ, সে বড় বিশ্বাসী কিনা, সেই জন্যেই যা, নইলে—"

বলিতে বলিতে তিনি থামিয়া গেলেন, স্থায়রত্ন মহাশয় বিদায় লইলেন।

এই নৃশংস অসচ্চরিত্র লোকটীর হৃদয়ে স্ত্রীর ছায়া নাই, পুত্র তাঁহার সমস্ত হৃদয়টা দখল করিয়াছে। নিজের জন্য তিনি কিছুই চাহেন না, পুত্রের জন্যই যেটুকু ভাবনা।

রাখাল পার্শ্বেই ছিল, তাহার পানে ফিরিয়া প্রসাদবাবু বলিলেন, "তুমি কিন্তু এখানে বেশী দিন থেকো না রাখাল, দুদিন পরেই চলে যেয়ো। আমার এখনও দিন পনর কুড়ি দেরী লাগবে। নরেন প্রিয়দেরও পাঠিয়ে দেব, ওরা এখানে থেকে বড় অত্যাচার চালায়। আমার জমীদারির কাজ, হিসেব নিকেশ দেখা—"

রাখাল বলিল, "একটা কথা যদি বলি হুজুর, রাগ করবেন না তো ?"

হাসিয়া উঠিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া প্রসাদবাবু বলিলেন, "বিলক্ষণ, রাগ কিসের! সত্যি কথা বললে রাগ করব এমন লোক আমি নই রাখাল। এক বছর আছ, আমায় দেখছ, নিশ্চয়ই জেনেছ আমি কি ধরণের লোক। আমি মাতাল চরিত্রহীন, কিন্তু তা বলে এ পর্য্যন্ত কথার খেলাপ করি নি, কিছু না বুঝে হঠাৎ চটেও উঠি নি। তুমি নিশ্চিন্ত হয় কথা বল।"

সাহসে ভর করিয়া রাখাল বলিল, "আপনি যে রকম খরচ করছেন, তাতে আমার মনে হয় বেশী দিন আপনার জমীদারি থাকতে পারবে না—"

বলিতে বলিতে সে থামিয়া প্রসাদবাবুর মুখের দিকে তাকাইল, প্রসাদবাবুর মুখখানা একবার বিকৃত হইয়া উঠিয়া তখনই স্বাভাবিক হইয়া গেল।

শুষ্ক হাসিয়া তিনি বলিলেন, "ঠিক কথাই বলেছ রাখাল, তুমি জানো না—আমার সব যেতে বসেছে, সেই জন্যেই আমি তোমাদের সব বিদায় করে এখানে আর পনের কুড়ি দিন থাকতে চাই।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি আবার বলিলেন, "তুমি কেন, আমার আত্মীয় স্বজন স্ত্রী কেউই জানে না আমি পথের ভিখারি হয়েছি, আমার আর কিছু নেই। তাসের ঘর তবু আজও সাজানো রয়েছে, পশ্চিমে মেঘ উঠেছে, একটা বাতাসের ধাক্কা এ ঘর সইবে না। আমার বিশাল জমীদারি, আমার বাড়ী ঘর মোটর, সব অন্যের, আমার কিছু নেই। শেষ সেই জন্যেই গ্রামে এলুম, ওদের শেষ আনন্দ দিতে থিয়েটার যাত্রা আনছি, যে যা চাচ্ছে তাকে তাই দিয়ে যাচ্ছি। জানি, এই আমার শেষ আসা—মল্লিকপুর মল্লিক গোষ্ঠির হাত হতে খসে পড়েছে।"

শূন্য গৃহমধ্যে প্রসাদবাবুর বেদনাপূর্ণ কথাগুলো ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ক্লিষ্টকণ্ঠে রাখাল বলিল, "কেন এ-রকম করলেন? আপনার স্বকুর জন্যে কিছু রেখে যেতে পারলেন না যাতে সে—"

হাসিয়া প্রসাদবাবু বলিলেন, "না, তার জন্যে কি তার মায়ের জন্যে আমি এতটুকু ভাবিনি রাখাল, স্বকুর মামারা আছে, দাদামশাই আছেন,—স্বকুর নামে তাঁরা লক্ষ টাকা জমা রেখেছেন। তুমি জানোনা, এবারে স্বকুর বড় মামা এসে সব জেনে গেছেন, তিনি যে দুদিন ছিলেন আমার

সঙ্গে কথা বলেন নি, আমার মুখ দেখেন নি। তিনি তাঁর বোন আর ভাগিনেয়কে তখনই নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ওরা কেউ আমায় ছেড়ে গেল না। আজ যদি আমি চোখ মুদি, কাল ওদের যেতেই হবে, আমার অত বড় বাড়ীর এককোণে একটা ঘরও তারা পাবে না, কারণ ওসব বন্ধক পড়েছে, আমার বলতে কিছু নেই। কিন্তু এ সব কথা এখন থাক রাখাল, এই কয়টা দিন আমায় আনন্দে কাটিয়ে নিয়ে আমি যেন যেতে পারি। আমার চাকরটাকে ডেকে দিয়ে যাও, আমি খানিকটা শুয়ে থাকি।”

রাখাল উঠিল।

কি নিদারুণ পরিণাম? বিখ্যাত জমীদার, এই বিস্তৃত জমীদারি, পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা তিলে তিলে বৃদ্ধি করিয়াছেন, প্রসাদবাবুর অবিমৃশ্য-কারীতায় সব ঘুচিয়া গেল, তাঁহার স্ত্রী পুত্রের দাঁড়াইবার জন্য এতটুকু স্থান তাঁহার এত বড় জমীদারিটার মধ্যে নাই।

রাখাল বারাণ্ডায় রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

বিখ্যাত অভিনেত্রী মৈত্রেয়ীর অভিনয় দেখিতে কেবল মাত্র গ্রামের নয়, বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতেও বহুলোক আসিয়াছে। প্রকাণ্ড বড় উঠানে স্থান ধরে না, চারিদিককার বারাণ্ডা গুলি লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, উপরের বারাণ্ডা গুলিতে পর্য্যন্ত স্থান নাই।

মৈত্রেয়ীর নাম নাট্যজগতে বিখ্যাত, অনেকগুলি ফিলমেও সে ছবি দিয়াছে। তাহার নাম কেবল বাংলায় নয়, দেশে দেশে সকল লোকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়।

মৈত্রেয়ীর অসামান্য রূপ, নৃত্য ও গীত, অভিনয়ের গল্প দূর পল্লী-প্রান্তেও গিয়া পৌছাইয়াছিল। অভিনয় আরম্ভ হইবে রাত্রি আটটায়, বৈকাল হইতে দলে দলে লোক আসিয়া জুটিতেছিল।

রাখালও মৈত্রেয়ীর নাম শুনিয়াছিল কোনদিন তাহাকে চোখে দেখে নাই। বাবুর বাগান বাড়ীতে সে মাঝে মাঝে আসিত, বাবু তাহার একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। কতদিন বন্ধুবান্ধব লইয়া কেবলমাত্র মৈত্রেয়ীর অভিনয় দেখিতে থিয়েটারে যাইতেন, রাখাল কোনদিন যায় নাই।

থিয়েটার বায়স্কোপ সে মোটেই পছন্দ করিত না, অনেকদিন বন্ধুদের অনেক টানাটানিতে পড়িয়াও সে যায় নাই।

সেদিন প্রসাদবাবুর দক্ষিণে একখানা চেয়ারে সে বসিয়াছিল। প্রসাদবাবুর অনুরোধে সেও যথেষ্ট মদ খাইয়াছিল—মন তাহার তখন কোন বৈকুণ্ঠে ভ্রমণ করিতেছিল কে জানে।

প্রথম দৃশ্যে দেখা গেল একটী বালক ও একটী বালিকা,—একত্রে খেলা

করিতেছে, পাঠশালে পড়িতেছে, বালকের দোষ বালিকা নিজের স্কন্ধে লইয়া অম্লানমুখে শাস্তি গ্রহণ করিতেছে।

এ যেন রাখালের বাল্যকাল। মনে পড়িল সেই সপ্তমী আর সে। সপ্তমী ও সে একই পাঠশালায় পড়িত ; দুষ্ট রাখাল নিত্য গুরুমহাশয়কে নিগৃহীত করিতে কত উপায়ই না উদ্ভাবন করিত, যখন ধরা পড়িত তখন সপ্তমী সেই সকল অপরাধ নিজের মাথায় লইত, নিজেই শাস্তি গ্রহণ করিত।

তাহার পর সপ্তমী যে দিন স্বেচ্ছায় পাঠশালা ছাড়িয়া দিল, তাহার মূলে ছিল কতখানি আত্মত্যাগ,– তাহা সেই জানে—আর জানিত সপ্তমী।

বালিকা সপ্তমী কি চমৎকার গান গাহিত। এ পর্য্যন্ত রাখাল কত জায়গায় কত গান শুনিয়াছে, সপ্তমীর কণ্ঠস্বরের মত কণ্ঠস্বর সে আর কাহারও শুনে নাই।

হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল ; ষ্টেজের উপর দাঁড়াইয়া নায়িকা নীলিমা—সে গান গাহিতেছে, কি করুণ গান তাহার মুখে। দরজায় হাত রাখিয়া একটু বামে হেলিয়া সে দক্ষিণ হাতে অঞ্চলে চোখ মুছিতেছে।

বালিকা নীলিমা আজ কিশোরী, দয়িত তাহার কোথায়, তাহার ঠিকানা সে তাহার চলার পথে পাইতেছে না, সে তবু চলিয়াছে, যদি তাহার দেখা মিলে।

রাখাল চমকাইয়া উঠিল, সে বিস্ফারিত নেত্রে নীলিমার পানে তাকাইয়া রহিল। এ কে, এ মুখ তাহার চেনা নয় কি? ওই মুখ, ওই চোখ, ওই অপ্রশস্ত ললাট, ওই দাঁড়াইবার সুন্দর ভঙ্গি—এ যে তাহার সুপরিচিত।

চট করিয়া নেশা ছুটিয়া গেল, রাখাল বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া রহিল।

গায়িকার গান যখন থামিল—সে মুখ যখন স্পষ্ট এদিকে ফিরাইল, তখন রাখালের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাহার পানে তাকাইয়া প্রসাদবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "উঠছো যে রাখাল ?"

"আসছি—"

বলিয়া রাখাল তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল। নিজের ঘরে আসিয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল।

সপ্তমী,—হাঁ, এই তো সেই সপ্তমী তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আট বৎসর পূর্ব্বের সপ্তমী আজও ঠিক তেমনই আছে, তাহার পরিবর্ত্তন কিছুমাত্র হয় নাই।

কোথায় ছিল সে, আজ কোথায় সে আসিয়াছে। সে হয়তো স্বপ্নেও ভাবে নাই তাহার দেশের লোক কেহ এখানে আছে।

কিন্তু তাহাতেই বা কি ? সে যদি জানিতেও পারে রাখাল এখানে আছে তাহাতেই বা তাহার কি হইবে ? সে যে পথে দাঁড়াইয়াছে, যে ব্যবসা গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে লজ্জাসঙ্কোচ কিছুই থাকে না।

সমস্ত রাত্রি রাখাল ঘুমাইতে পারিল না। রাত্রি দুইটায় থিয়েটার ভাঙ্গিয়া গেল, লোকজন সব চলিয়া গেল, প্রসাদবাবু নিজের ঘরে ত্রিতলে চলিয়া গেলেন, বন্ধুরা যে যেখানে পারিল শুইয়া পড়িল। শেষ রাত্রের দিকে চারিদিক নিঝুম হইয়া গেল, সকলেই ঘুমাইল, ঘুমাইতে পারিল না শুধু রাখাল।

রুদ্ধদ্বার গৃহের মধ্যে সে কতক্ষণ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়া শেষে আবার আসিয়া বিছানায় বসিল।

কিন্তু এর চেয়ে—এই যশ, মান, অর্থলাভ করার চেয়ে সপ্তমীর মরিয়া

যাওয়াই ভাল ছিল। তাহার পিতার কুলে এখনও সকলে বর্ত্তমান, স্বামীর কুলেও সকলেই বর্ত্তমান, সকলের মুখে কলঙ্ককালিমা লেপন করিতে সে বাঁচিয়া রহিল কেন, কেন এ পথে পা দিবার আগে সে আত্মহত্যা করিয়া মরিল না ?

সকালবেলায় সে সকলের আগে উঠিয়া স্নান সারিয়া আসিল। বেলা নয়টার সময় প্রসাদবাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন।

সম্মুখেই রাখালকে দেখিতে পাইয়া তিনি বলিলেন, "বাঃ,—বেশ লোক তো তুমি রাখাল, সেই যে উঠে এলে আর তোমায় দেখতে পেলুম না। কাল তোমার কি হয়েছিল বল তো ?"

রাখাল সবিনয়ে জানাইল, একে সে থিয়েটার দেখিতে তত ভালবাসে না, তাহার উপর কাল তাহার নেশাটাও বড় বেশী রকম হইয়া গিয়াছিল সেই জন্যই সে আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল।

বিস্মিত হইয়া প্রসাদবাবু বলিলেন, "এমন থিয়েটার দেখতে তোমার ভাল লাগে না ? মৈত্রেয়ীর গান শুনেছ তো, কি রকম গান আর কি রকম চেহারা দেখলে একবার ?"

রাখাল কেবলমাত্র জানাইল শুনিয়াছে। সে জানিতে পারিল এই থিয়েটারটী এখানে আরও দুচার দিন থাকিবে, বৈকালের দিকে বাবুর নিকটে জানাইল সে কলিকাতায় যাইতে চায়, খোকাবাবুর জন্য সে শান্তি পাইতেছে না।

সুকুমারের জন্য রাখাল এতখানি অসস্তি ভোগ করে জানিয়া স্নেহশীল পিতার মন বড় খুসি হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "বেশ কথা, কাল দুপুরেই তুমি চলে যেয়ো, আমি তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। আজ থিয়েটারটা দেখে নাও, এরপর আমার দ্বারা তো আর দেখানো চলবে না, আমার এই শেষ আনন্দ।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাখাল প্রসাদবাবুর অনুমতি লইয়া নদীর ধারে বেড়াইতে চলিয়া গেল।

নদীর ওপারে সূর্য্য তখন ডুবিয়া যাইতেছে মাত্র, পশ্চিম আকাশ লাল হইয়া উঠিয়াছে, সেই লাল আভা পূবের গায়ে পড়িয়া সব জিনিসই রঙিন করিয়া তুলিয়াছে। পাখীরা বিদায়গান গাহিয়া নীড়ের সন্ধানে চলিয়াছে।

নদীর কালো জলে বাবুর বাড়ীর নৌকা ভাসিতেছিল, ছইয়ের মধ্যে কে কে ছিল দেখা যায় নাই, ছইয়ের বাইরে থিয়েটারের ম্যানেজার মহাশয় আলবোলায় তামাক টানিতেছিলেন।

ঘাটের উপর বসিয়া রাখাল অন্যমনস্ক ভাবে নদীর ছোট বড় ঢেউ-গুলার পানে তাকাইয়াছিল। নদীর ধারের গাছের ছায়াগুলা জলের উপর পড়িয়া ঢেউয়ের তালে তালে নাচিতেছিল, লাল আকাশের ছায়া নদীর বুকে কাঁপিতেছিল। পল্লীর ভিতর হইতে সন্ধ্যার শঙ্খনাদ ভাসিয়া আসিতেছিল, ও-পারে ও এ-পারের দেবমন্দির হইতে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরের শব্দ শুনা যাইতেছিল।

সপ্তমীর কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহারই পাশে আর একখানি অনিন্দ্যসুন্দর মুখ ভাসিয়া উঠিল, সে মুখ ইথারের।

মনে হইল সেদিনকার সেই লাঞ্ছনার কথা,— কিন্তু ইথার তো সে কথা বিশ্বাস করে নাই। তাহার মুখে সে কি বেদনাই না ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে বলিয়াছিল—সে আবার রাখালকে ডাকিবে—কিন্তু এখন নয়, যখন সে স্বাধীন হইবে তখন।

নিকটেই একটা শব্দ শুনিয়া সে চমকাইয়া উঠিল। নৌকাখানি ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে এ শব্দ তাহারই।

অন্ধকার তখন বেশ গাঢ়ভাবেই ধরার বুকের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে,

তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদখানা নদীর উপরে আকাশের গায়ে যেন সোনার টিপ পরাইয়া দিয়াছে। ও-পারে ঘন ঝোপের মধ্যে কোথায় গা লুকাইয়া একটা পাপিয়া ডাকিতেছিল চোখ গেল, চোখ গেল।

কোথায় রে পাখী কোথায়, কবে কাহার রূপ দেখিয়াছিলি যাহাতে তোর চোখ দুইটী ধাঁধিয়া গিয়াছে? আজও সেদিনের কথা তুই ভুলিস নাই, তাই বসন্তের আগমনে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে, আকাশ নির্ম্মল হয়, তখন সেই পুরাতন দিনের কথা তোর মনে হয়,—যাতনায় অস্থির হইয়া আকুলকণ্ঠে চীৎকার করিস—চোখ গেল—চোখ গেল।

অদূরে শ্মশানে একটা চিতা জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া আসিয়াছিল। আর একটী শব বোধহয় এই সময়ে আসিল, পাখীর কলতান, নদীর কলকলতান ডুবাইয়া একটী শব্দে চারিদিক ভরিয়া উঠিল—বল হরি হরি বল।

নৌকা হইতে দুইটী মেয়ে উপরে উঠিতে থমকিয়া দাঁড়াইল—

"কে এখানে—"

রাখাল বুঝিল তাহারা ভয় পাইয়াছে। ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে সে দেখিল মেয়ে দুইটীর মধ্যে একজন মৈত্রেয়ী।

ধীরকণ্ঠে সে উত্তর দিল—"আমি রাখাল গাঙ্গুলী।"

"রাখাল গাঙ্গুলী—?"

মৈত্রেয়ী স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

স্থূলকলেবর লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ম্যানেজার বলিলেন, "চল, আবার দাঁড়ালে কেন?"

শান্তকণ্ঠে মৈত্রেয়ী বলিল, "আপনি যান, আমি পাঁচমিনিট পরেই যাচ্ছি।"

অসন্তুষ্ট ম্যানেজার মিনিট খানেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া উপরে গেলেন, আবার ডাকিলেন, "প্লে আটটায় আরম্ভ মৈত্রেয়ী, সে কথা বোধ হয় মনে আছে ?"

"আছে, আপনি রমাকে নিয়ে যান, আমি এখনি আসছি।"

ম্যানেজার চলিয়া গেলেন, একা মৈত্রেয়ী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

২২

অদূরে শ্মশানে আবার ভীষণ শব্দ হইল—বল হরি হরি বল—

উপরে শান্ত নীলাকাশ, তৃতীয়ার চাঁদ আস্তে আস্তে নীচের দিকে ওপারে নামিয়া যাইতেছে, পাখীটা তখনও অবিশ্রান্ত চীৎকার করিতেছে। পায়ের কাছে ঘাটের উপর নদীর ঢেউ আসিয়া পড়িয়া শব্দ করিতেছিল—ছল ছলাৎ, ছল ছলাৎ।

রাখাল মুখ ফিরাইয়া দেখিল পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটী নারীমূর্ত্তি।

ব্যঙ্গপূর্ণকণ্ঠে সে বলিল, "তুমি গেলে না মৈত্রেয়ী, ম্যানেজার যে ডেকে গেলেন।"

মেয়েটী দিব্য শান্তভাবে উত্তর দিল—"আমি মৈত্রেয়ী নই, আমি সপ্তমী।"

রাখাল কেবলমাত্র বলিল, "তা আমি জানি।"

উভয়েই নীরব, কাহারও মুখে একটী শব্দ নাই। মাথার উপর দিয়া একটা নাম না জানা পাখী ডাকিয়া গেল, সেই শব্দে উভয়েই চমকিয়া উঠিল।

রাখাল বলিল, "হ্যাঁ, একটা কথা আছে। আমার মা নাকি তোমার কাছ হতে দশটাকা ধার নিয়েছিলেন ঘর সারানোর জন্যে, সে দশ টাকার কথা আমায় তিনি মরবার সময় বলে গেছেন। আমি তোমার খোঁজ করেছিলুম, কিন্তু তোমার কোনও সন্ধান পাই নি। সে টাকা আমার কাছেই আছে, নিয়ে আজ হতে আমায় ঋণমুক্ত করে দাও।"

পকেট হইতে একখানা নোট সে বাহির করিল।

মৈত্রেয়ী একপা পিছাইয়া গেল, বলিল, "ও টাকা আমি তাঁকে ঋণস্বরূপ দেইনি, স্বত্বত্যাগ করেই দিয়েছিলুম।"

রাখাল দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা হতে পারে না, তোমার টাকা নিয়ে আমার পুণ্যবতী মায়ের দেনা আমি রাখতে পারব না। এতে তাঁর গতি হবে না, আবার তাঁকে নেমে আসতে হবে।"

মৈত্রেয়ীর চোখ দুইটী জ্বলিয়া উঠিল, সে বলিল, "আমার ঋণ রাখলে তাঁকে নরকে যেতে হবে?"

রাখাল বলিল, "তা হবে বই কি? জানোই তো তোমাদের অর্থ কোন সৎলোকে নেন না, নিলে পতিত হতে হয় বলেই লোকের বিশ্বাস।"

মৈত্রেয়ী দাঁতে ঠোঁট চাপিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু এ-টুকু তোমার মনে করা উচিত রাখালদা—টাকা দিয়েছিল সপ্তমী—মৈত্রেয়ী নয়। সপ্তমীর টাকা সপ্তমীকে আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না, সে মরে গেছে, কাজেই ও-টাকাটা কোন সৎকাজে দান করে দিয়ো।"

"বেশ, তাই ভাল," বলিয়া রাখাল নোটখানা পকেটে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মৈত্রেয়ী বলিল, "এখনই উঠলে যে।"

রাখাল বলিল, "আমার কাজ আছে।"

মৈত্রেয়ী বলিল, "কাজ তো আমারও আছে রাখালদা, কিন্তু দাঁড়াও, দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমার বাপ মা, ভাই—"

তীব্রকণ্ঠে রাখাল বলিল, "তোমার মা বাপ ভাই কেমন করে মৈত্রেয়ী? সপ্তমীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল, সপ্তমী মরে গেছে, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক নেই।"

মৈত্রেয়ী আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাখাল বলিল, "তারপর তুমি তা হলে স্বীকার কর—এখনও সপ্তমী মরে নি, মৈত্রেয়ীর বুকের আড়ালে সপ্তমী এখনও আছে ?"

মৈত্রেয়ী ম্লান হাসিল,—"বোধ হয় আছে, নইলে কাল যখন তোমার দিকে দৃষ্টি পড়ল তখন হঠাৎ গানের তাল কেটে গেল কেন, সুর হারিয়ে ফেললুম কেন ? কিন্তু রাখালদা—"

সে চুপ করিয়া গেল।

রাখাল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "গ্রামের খবর, তোমার বাপ মায়ের খবর জানতে চাও ?"

মৈত্রেয়ী উত্তর দিল না।

রাখাল বলিল, "আমি আজ সাত আট বছর দেশ ছাড়া, এটুকু জানি তোমার মা মারা গেছেন, তোমার বাপ তোমার ছোড়দার কাছে গিয়েছেন।"

মৈত্রেয়ীর চক্ষু দিয়া দুইফোঁটা জল নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে— প্রসাদবাবুর কাছে কি কাজ কর রাখালদা ?"

রাখাল উত্তর দিল—"মোসাহেবি করি।"

মৈত্রেয়ী কোন কথা বলে না দেখিয়া সে হাসিল, "ভাবছ যে রাখালদার সম্বন্ধে অনেকখানি উচ্চ আশা করে রেখেছিলে তার এ রকম অধঃপতন হল কেন ? সে বড়লোকের মন যোগায়—মদ খায়, এ রকম ছন্নছাড়া ভাবে জীবন কাটায় কেমন করে ? কিন্তু সবই সম্ভব হয় মৈত্রেয়ী, আমি পুরুষ, আমার এতে বড় একটা নিন্দে নেই। আমি পেটের দায়ে কুলির কাজ করেছি, এখন মোসাহেবী করছি—সবই আমার সাজে, কারণ আমি রাখাল, যাই করি না, তিন পা চললেই আমি শুদ্ধ, আমি পবিত্র। কিন্তু তুমি শুদ্ধ নও, তুমি পবিত্র হতে পার না—কেননা তুমি মেয়ে। তোমার এতটুকু অনাচার কেউ সইবে না, এ তো এতবড় একটা কাণ্ড।"

মৈত্রেয়ী বলিল, "আমি তো সেজন্যে কারও দরজাতেও দাঁড়াচ্ছিনে রাখালদা, কাঁরও কাছে কোনদিন বলবও না—আমার কৃতকাজের জন্যে আমায় ক্ষমা কর। আমি জানি আমি যা করেছি এর জের আমায় আজীবন কাল টেনে চলতে হবে, এর কবল হতে আমার মুক্তি নেই। তোমরা জেনে শুনে কত পাপ করে যাও, কিন্তু আমরা যদি মুহূর্ত্তের ভুলে কোন পাপ করে বসি—জানি, তা পাথরের মতই আমাদের বুকে জেঁকে বসে থাকবে, সহস্র চেষ্টাতেও তা সরাতে পারব না।"

রাখাল চুপ করিয়া রহিল।

একটু পরে বলিল, "এ অবস্থায় তুমি সুখী হয়েছ তো মৈত্রেয়ী?"

মৈত্রেয়ী বলিল, "মৈত্রেয়ী নই—সপ্তমী।"

রাখাল বলিল, "না হয় সপ্তমী, কিন্তু কি জিজ্ঞাসা করলুম?"

মৈত্রেয়ী বলিল, "তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যাতীত, কারণ আমিই এখনও ঠিক করতে পারিনি আমি সুখী হয়েছি কিনা। একটা দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমি যে সুখী এ কথা বলতেই হবে। আমি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করতে পারছি,—অর্থের আকাঙ্ক্ষা আর আমার নেই, আমার মনের এ বাসনার তৃপ্তি হয়েছে।"

রাখাল বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "মানুষের জীবনে অর্থ ইতো একমাত্র উদ্দেশ্য সপ্তমী। মানুষ টাকার জন্যেই না সব কাজ করতে পারে? নরহত্যা, চুরি ডাকাতি, অত্যাচার সবই তো টাকার জন্যে, সেই অর্থ তুমি যখন অপর্য্যাপ্ত পেয়েছ তখন তুমি নিশ্চয়ই সুখী এ কথা বলতেই হবে।"

চাঁদ ততক্ষণে পশ্চিমে নামিয়া গিয়াছিল, ক্ষীণ আলো তখনও এতটুকু পূবের মুখে লাগিয়াছিল, সেই আলোয় মৈত্রেয়ী বিষণ্ণনেত্রে রাখালের পানে তাকাইল, বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, টাকা থাকলে যদি

সুখী হয় তা হলে আমি সুখীই বটে। কিন্তু তবু কি জানো রাখালদা, তোমার টাকা নেই বলেই তুমি ভাবছ টাকাতেই একমাত্র সুখ শান্তি সব আছে, কিন্তু আমি সময় সময় ভাবি তা হয় না; টাকায় আর সব পাওয়া যায়, সুখ শান্তি পাওয়া যায় না। টাকায় বাহ্যিক আনন্দের অভিনয় করতে পারা যায়, অন্তরে প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায় না।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে বলিল, "যাক, তুমি আর এখানে বসে থেকো না, বাড়ী যাও। চাঁদ ডুবে গেল, ভয়ানক অন্ধকার হয়ে আসছে।"

রাখাল পিছনের জমাট বাঁধা অন্ধকারের পানে তাকাইয়া বলিল, "অন্ধকার আমায় ভয় দেখাতে কোনদিনই পারেনি তাতো তুমি জানোই। ঘন মেঘের তলায় রাত্রে যে অন্ধকার জমাট বাঁধে, আমি সেই অন্ধকারেও বেড়াতে ভয় পাইনি, আজও পাব না। তুমি যাও, তোমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

"চললুম—"

ধীর পদক্ষেপে মৈত্রেয়ী উঠিয়া গেল।

সেই সপ্তমী, সে ছিল কতটুকু মেয়ে। রাখালের মনে বহু পুরাতন দিনের কথাগুলাই জাগিয়া উঠিতেছিল।

গ্রামে সপ্তমীর মত অনেক মেয়েই ছিল, সপ্তমী ছিল তাহাদের মধ্যে যেন প্রস্ফুটিত গোলাপ। সকল ছেলেই এই সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটীকে ভালবাসিত, সকলেই কোন না কোন জিনিস দিয়া তাহার ভালবাসা, স্নেহ দখল করিতে চাহিত। রাখাল কেবল একলা এই দল ছাড়া ছিল, কোনদিনই সে সপ্তমীকে কোন জিনিস দেয় নাই, বরং তাহার নিকট হইতে সে যথেষ্ট জিনিস পাইয়াও তাহাকে অবহেলা দেখাইত।

যে দিন সপ্তমীর পলায়নের সংবাদ সে জানিতে পারিয়াছিল তাহার পূর্ব্বে কোনদিনই সে অনুভব করে নাই সপ্তমীকে সে ভালবাসে। সেইদিন প্রথম সে আপনার পানে তাকাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। সপ্তমী তাহার অন্তর কতখানি পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল এবং কতখানি খালি করিয়া গেল তাহা সে সেইদিন বুঝিতে পারিয়াছিল।

অদূরে শ্মশানে শব জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া আসিল, দাহকারিগণ হরিবোল দিয়া চিতা ধুইয়া চলিয়া গেল।

রাখাল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

সকল মানুষের পরিণামই এই, শেষ এইখানেই বিশ্রাম।

অদূরে জমীদার বাড়ীতে তখন কনসার্ট বাজিতেছিল, লোকজনের অস্ফুট কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছিল।

রাখাল উঠিল না, সেই স্থানেই বসিয়া রহিল।

২৩

রাখাল কলিকাতায় রওনা হইবার উদ্যোগ করিতেছিল, থিয়েটার পার্টির জনৈক ভৃত্য সেই সময় একখানি পত্র আনিয়া তাহার হাতে দিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

নৃপেন মৃদু হাসিয়া বলিল, "কি হে রাখাল, ডুবে জল খাচ্ছ নাকি ?"

রাখাল উত্তর দিল না, জানালার কাছে সরিয়া গিয়া সে পত্রখানি দেখিয়া লইল, ফিরিয়া বলিল, "তুমি যাও, বল গিয়ে আমি এখনি যাচ্ছি, তাঁর সঙ্গে দেখা করেই আমি যাব।"

ভৃত্য চলিয়া গেল।

সোমেশ্বর বলিল, "কোথায় চলছো হে ?"

রাখাল গম্ভীরভাবে বলিল, "মৈত্রেয়ীর কাছে।"

পিছনে অজস্র হাসি বিদ্রূপ রাখিয়া রাখাল বীরের মতই অগ্রসর হইয়া গেল।

থিয়েটারপার্টির থাকার জন্য একটা বাড়ী দেওয়া হইয়াছিল, সেই বাড়ীরই দ্বিতলের একটী সুসজ্জিত ঘরে মৈত্রেয়ী একা চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

দলের একজন লোক রাখালকে তাহার দরজায় পৌছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

দরজার কাছে পায়ের শব্দ পাইয়া মৈত্রেয়ী মুখ ফিরাইল; রাখালকে দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, মলিন মুখে একটু হাসির রেখা টানিয়া আনিয়া সে বলিল, "এসো—"

সঙ্কুচিত ভাবে রাখাল প্রবেশ করিল; মৈত্রেয়ী একখানা আসন পাতিয়া দিল।

"দিনের বেলা এত লোকের সুমুখ দিয়ে আমার এখানে যে এলে, তোমার একটু লজ্জা করল না রাখালদা?"

মৈত্রেয়ী যুগল চক্ষু দুইটী সকৌতুকে রাখালের মুখের উপর তুলিয়া ধরিল।

রাখাল গম্ভীরভাবে বলিল, "লজ্জা সরম অনেকদিন পুড়িয়ে খেয়েছি। আজ তোমার পত্রখানা যখন পেলুম তখন অনেক উপহাসের কথাও শুনতে পেলুম। অনেকে হেসেছিল, তখন তাদের সুমুখ দিয়ে আসতে তবু একটু পা কেঁপেছিল এ কথা বলতেই হবে।"

মৈত্রেয়ী বলিল, "তবে যে বলছ লজ্জা সরম পুড়িয়ে খেয়েছ।"

রাখাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহার মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "তা বলে এমন ভাবে দিনের বেলায় এ রকম জায়গায় কোনদিন যে আসিনি সে কথা সত্যি।"

বিদ্রূপের ভঙ্গীতে মৈত্রেয়ী বলিল, "সত্যি?"

রাখাল দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, মুখখানা বিকৃত করিয়া সে বলিল, "সত্যি কি না তা আমি তোমায় জানাতে চাইনে সপ্তমী। আমিও অসচ্চরিত্র, মাতাল কিন্তু অধঃপতনের শেষ সীমায় এখনও ওদের মত নামতে পারিনি। নামতুম—কিন্তু একটী শিশু আমায় রক্ষা করেছে, একটী দেবী আমায় বাঁচিয়েছে।"

মৈত্রেয়ীর মুখখানা কালো হইয়া গেল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তারা?"

রাখাল উত্তর দিল, "এই প্রসাদ বাবুর ছেলে সুকুমার, আর—আর একজন—"

বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল—

"আর একজন—সে ইথার।"

ইথারের নামটা মুখে আনিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখটা যে দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা মৈত্রেয়ীর দৃষ্টিতে এড়াইল না।

সে কতকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "ইথার কে?"

রাখাল উত্তর দিল—"ইথার একটী মেয়ে।"

সে ইথারের সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিল না; মৈত্রেয়ীও সে সম্বন্ধে আর কোন কথা জানিতে চাহিল না, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে একটা দাগ রহিয়া গেল।

অন্যমনস্কভাবে রাখাল পার্শ্বে পতিত একখানা মাসিক পত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, মৈত্রেয়ী জানালা পথে বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় কি জন্যে ডেকেছ সপ্তমী?"

মৈত্রেয়ী ফিরিল, একটা লঘুনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "শুনলুম তুমি নাকি আজই কলকাতায় চলে যাচ্ছো?"

রাখাল উত্তর দিল, "হ্যাঁ, ঘণ্টাখানেক মধ্যেই রওনা হব।"

মৈত্রেয়ী বলিল, "জিজ্ঞাসা করতে পারি কেন হঠাৎ চলে যাচ্ছো?"

রাখাল বলিল, "আমার এখানে আর ভাল লাগছে না।"

শুষ্ক হাসিয়া মৈত্রেয়ী বলিল, "না, হয় তো ভাল লাগত, থাকতে পারতে,—কেবল আমার জন্যেই চলে যাচ্ছো, তাই নয় কি?"

রাখাল চুপ করিয়া রহিল, ক্ষণপরে বলিল, "কতকটা তাই বটে; সপ্তমীকে মৈত্রেয়ীরূপে ষ্টেজে দাঁড়িয়ে হাজার মুখের প্রশংসা লাভ করতে—সত্যিই আমি দেখতে পারছিনে, এ আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে।"

মৈত্রেয়ী উষ্ণ হইয়া বলিল, "এর চেয়ে চিরকাল সেই গ্রামে পড়ে থেকে দাদা বউদির লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করাও ভাল ছিল, না রাখালদা ?"

রাখাল বলিল, "তা ভাল ছিল বই কি। নেহাৎ যদিই সহ্য করতে না পারতে নদীর বুকে তো জলের অভাব ছিল না সপ্তমী ; একটা সূঁচেও যখন মানুষের মুক্তি এনে দিতে পারে, তোমার মুক্তির কোন ভাবনাই তো ছিল না।"

মৈত্রেয়ী মাথা নত করিল।

খানিক বাদে সে যখন মুখ তুলিল, তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রাখাল বিস্মিত হইয়া গেল। মৈত্রেয়ীর মুখখানা শবের মতই মলিন হইয়া গেছে, কখন সে গোপনে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়াছে, চোখের পাতা তাহার এখনও ভিজা, চকচক করিতেছে।

শান্তকণ্ঠে মৈত্রেয়ী বলিল, "আজ তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছি রাখালদা, সেদিনে তা অনুভব করি নি। সেদিন বর্ত্তমান ভাবি নি, দেখি নি, কেবল সামনের দিকে চেয়ে ছিলুম, অন্ধ হয়ে ছুটেছিলুম। আজ চোখের সামনের সে মোহের বর্ণজাল মুছে গেছে, আজ দেখছি যা দেখে এগিয়েছিলুম তাতে আছে শুধু জ্বালা—শান্তি আনন্দ ওতে নেই। রাখালদা, আমার বর্ত্তমান দিনগুলো যদি কোন রকমে ডুবিয়ে দিতে পারতুম—সত্যিই কেউ আমার মত সুখী হতে পারত না। তুমি তোমার জীবনপথে চলার উদ্দেশ্য পেয়েছ, কিন্তু আমি কিছুই পাই নি।"

রাখাল নির্নিমেষনেত্রে ক্ষণকাল তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, ধীর-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এই সব কাহিনী শুনাবার জন্যেই কি আমায় ডেকেছ সপ্তমী ?"

মৈত্রেয়ীর মুখখানা নিমেষে কঠিন হইয়া উঠিল, তাহার চোখের পাতা

শুকাইয়া গেল ; শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "না, সে সব অতীত বা বর্ত্তমানের কথা আলোচনা করতে তোমায় ডাকিনি, ডেকেছিলুম শেষ দেখা করবার জন্যে। প্রসাদবাবুর মুখে শুনলুম তুমি আজ চলে যাচ্ছ, সেইজন্যে তোমায় ডাকলুম। জানিনে আবার কতকাল পরে দেখা হবে, দেখা হবে কিনা তারও ঠিক নেই। না ; তুমি যাও রাখালদা, তোমার দেরী হয়ে যাচ্ছে, ট্রেণের সময় হয়ে এল।"

নড়িয়া চড়িয়া ভাল হইয়া বসিয়া রাখাল বলিল, "থাক, এর পরে আর একখানা ট্রেণ আছে তিনটেয়, না হয় সেইখানাতেই যাব।" তুমি এক কাপ চা খাওয়াতে পার সপ্তমী, যদি দাও তা হলে—"

"দিচ্ছি—" বলিয়া মৈত্রেয়ী উঠিয়া পড়িল।

ঘরের এককোণে ষ্টোভ কেটলী প্রভৃতি ছিল ; ষ্টোভ ধরাইতে ধরাইতে সে হঠাৎ মুখ তুলিয়া চাহিল—"কিন্তু এখন যদি আমার কাছে চা খাও তাতে তোমার জাত যাবে না তো ?"

দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া রাখাল বলিল, "জাতের কথা তুলো না সপ্তমী, জাত আমি মানিনে।"

তাহার গলার পৈতাটা দেখাইয়া মৈত্রেয়ী মৃদু হাসিয়া বলিল, "তবে গলায় ওটা রেখেছ যে ?"

রাখাল উত্তর দিল, "নির্ব্বিষ খোলস, অনেক সময় থাকায় উপকার পাওয়া যায়। জানো সপ্তমী, সময় সময় এই সাদা সুতো গাছটার জোরেও অনেক কাজ পাওয়া যায়—"

মৈত্রেয়ী বলিল, "যেমন লক্ষ্মীপূজো, ষষ্ঠীপূজো ইত্যাদি—"

বলিতে বলিতে হঠাৎ সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল, মনে পড়িল ছোটবেলায় তাহাদের খেলা ঘরে লক্ষ্মীপূজা করিতে পুরোহিত হইত এই ছেলেটী। তখনও তাহার পৈতা হয় নাই, কেবলমাত্র পূজার অধিকার

লাভ করার জন্যই সে কয়েকগাছি সূতা গলায় ঝুলাইয়া আসিত। প্রকৃত ব্রাহ্মণের ভাণে সে সন্ধ্যাহ্নিক করিত, আসন করিত।"

রাখাল বলিল, "লক্ষ্মীপূজো ষষ্ঠীপূজোর সময় দরকার তো লাগেই, তা ছাড়া রামনের মড়া বইবার যখন লোক পাওয়া যায় না সেই সময়েও দরকার পড়ে নেহাৎ মন্দ নয়।"

মৈত্রেয়ী নির্ব্বাকে জ্বলন্ত ষ্টোভের পানে তাকাইয়া রহিল। এক কাপের উপযুক্ত সামান্য জল ফুটিয়া কেটলির ছিদ্রপথে ধূম বাহির হইতেছিল, সেদিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না।

চোখ ফিরাইয়া সেইদিকে তাকাইয়া রাখাল বলিয়া উঠিল, "বাঃ, জল ফুটে গেল যে, ওদিকে দৃষ্টি আছে ?"

চমকাইয়া উঠিয়া মৈত্রেয়ী বলিল, "ও হরি, তা আমি দেখতে পাই নি।"

তাড়াতাড়ি সে ষ্টোভ নিভাইয়া জলে চা ছাড়িয়া দিল।

"কিছু খাবার দেব রাখালদা ?"

রাখাল মাথা নাড়িল, "না শুধু চা দাও।"

মৈত্রেয়ী চা ছাঁকিয়া কাপটা সরাইয়া দিল।

রাখাল চা খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর—তুমি তা হলে এই থিয়েটারের দলেই চিরকাল থাকবে—কেমন ?"

মৈত্রেয়ী উদাসভাবে বলিল, "আর কোথায় যাব বল ? যে পথে দাঁড়িয়েছি তাতে আর উপায় কই ?"

রাখাল তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সে কোন কাজের কথা নয় সপ্তমী, ইচ্ছা থাকলে ঢের উপায় হয়। একবার যদি কেউ পাপের পথে পা দেয় সে কি আর সাধু পথে যেতে পারে না—সৎ হতে পারে না ?"

মৈত্রেয়ী একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সৎ হয়ে ধর্ম্মপথে ফিরে

আমার কি লাভ হবে রাখালদা? এই খানিক আগে তুমিই বলেছ না তোমরা পুরুষ—তাই যতই কেন না অপবিত্র হও, তিন পা চললেই শুদ্ধ হয়ে যাবে, সমাজ তোমাদের কোথাও দোষই কোনদিন দেখবে না, কিন্তু আমরা মেয়ে তাই একবার একটু ভুলের জন্যে পা পিছলে গেলে সারাজীবন তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করলেও আমাদের কেউ ক্ষমা করবে না।"

রাখাল জোরের সহিত বলিল, "তা তো করবেই না।"

মৈত্রেয়ী শান্তভাবে বলিল, "তবে আমার সাধু হয়ে কি লাভ? আমি কি জানিনে রাখালদা,—আমায় ব্যবস্থা দেবে অনেকেই কিন্তু হাত ধরে কেউ সোজা পথে নিয়ে যাবে না, কেউ তাদের পাশে আমায় এতটুকু জায়গা দেবে না। আজ আমায় বড় বড় পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দেবেন, আমি বিনিময়ে তাঁদের অর্থ দেব, আমার অর্থ নিতে তাঁরা কেউ দ্বিধা বোধ করবেন না, কিন্তু আমায় স্থান দেবেন কোথায়? সমাজের কেউ কি আমায় গ্রহণ করবে—তাদের পাশে আমায় স্থান দেবে? আমি যা তাই থাকব—তবে অনর্থক আত্মবঞ্চনা অনুষ্ঠানের দরকার কি বল দেখি? তোমরা আমায় যতটা দূরে রেখে চলছো আমি ততটা দূরেই চলি, তোমাদের কাছে গিয়ে অজস্র ঘৃণা কুড়াতে আমি পারব না। এতো বেশই আছি রাখালদা, আমার সমাজ নেই, সংসার নেই, আত্মীয়স্বজন নেই, একলা চলেছি—একলাই চলব। চলতে চলতে একদিন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে যাব, শ্রান্ত চোখ মুদে আসবে—কেউ সেদিন আমার জন্যে চোখের জল ফেলতে একটা "আহা" বলতেও থাকবে না।"

উদাসভাবে সে জানালাপথে বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল। ফুলে ভরা লেবু গাছটার একটা সরু ডালে সবুজ পাতা ও সাদা ফুলের মধ্যে একটা ছোট পাখী নাচিয়া নাচিয়া শিষ দিতেছিল। লেবু ফুলের সুন্দর গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া ঘরের মধ্যে আসিতেছিল।

হঠাৎ রাখাল ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সেই শব্দে মৈত্রেয়ী ফিরিয়া তাকাইল।

"চলছো রাখালদা—?"

রাখাল বলিল, "হ্যাঁ, যাওয়ার আয়োজন করে নিতে হবে আর দেরী করলে চলবে না।"

মৈত্রেয়ী উঠিয়া দাঁড়াইল, "একটু দাঁড়াও প্রণাম করি।"

গলায় আঁচলটা জড়াইয়া সে রাখালের পায়ের উপর একেবারে উপুড় হইয়া পড়িল।

খানিক পরে সে মুখ তুলিল, শান্তকণ্ঠে বলিল, "যাও।"

রাখাল আত্মভোলার মত কতক্ষণ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ অত্যন্ত সচকিত হইয়াই প্রায় ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

২৪

দিন ক্রমেই অগ্রসর হইয়া আসিল। পাওনাদারেরা চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল, প্রসাদবাবুর বন্ধুবান্ধবেরা একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল, সরিল না কেবল রাখাল।

স্নিগ্ধ হাসিয়া প্রসাদবাবু বলিলেন, "একা তুমিই টিঁকে যাচ্ছো রাখাল, এটা তো উচিত নয়, তুমি যে মহাবাক্য লঙ্ঘন করছো। জানো তো—কথাই আছে সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়, অসময়ে হায় হায় কেহ কারও নয়, সরে পড় রাখাল, দুঃসময়ে থেকো না।"

রাখাল হাসিতে গেল, কিন্তু মুখে তাহার হাসি ফুটিল না, বড় বেদনায় সুন্দর মুখখানা তাহার বিকৃত হইয়া উঠিল মাত্র।

সে বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "আমার বড় অসময়ে আপনি আশ্রয় দিয়েছিলেন বাবু, সেদিনে আপনি আমায় আশ্রয় না দিলে কোথায় ভেসে যেতুম তার ঠিক নেই। আমায় আপনি অকৃতজ্ঞ ভাববেন না, আপনার অনেক নুন খেয়েছি, আজ আপনি বিপদে পড়েছেন বলে আপনাকে আমি ছাড়তে পারব না।"

প্রসাদবাবুর মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল, খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বিকৃতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "সুসময়ে কাউকে চিনতে পারিনি রাখাল, তখন সকলকেই নিজের অকৃত্রিম বন্ধু বলে জেনেছিলুম। আজ দেখ—সেই সব বন্ধুরা যেমন জানতে পেরেছে আমার আর কিছু নেই—তারা অমনই অনেক দূরে সরে গেছে, আজ আমি ডাকলেও তারা কেউ ফিরবে না। না ফিরুক, আমি তাদের ফিরবার প্রত্যাশাও করিনে। কেবল একটা বড় দুঃখ রইল রাখাল।"

রাখাল উৎসুকভাবে তাঁহার পানে তাকাইল।

প্রসাদবাবু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "প্রকৃত বন্ধুর মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারলুম না। আজ ভাবছি রাখাল—হাতে যখন পয়সা ছিল, যখন খেয়ালের বশে অজস্র পয়সা ব্যয় করে গিয়েছি তখন যদি তোমায় কিছু দিয়ে দিতুম।"

আর্ত্তকণ্ঠে রাখাল বলিয়া উঠিল, "আর কি দেবেন বাবু, আমি আপনার কাছে যা পেয়েছি—"

একটু হাসিয়া প্রসাদবাবু বলিলেন, "সে কতটুকু? তোমায় খেতে পরতে দিয়েছি, মাত্র এইটুকু পেয়েই তুমি চরিতার্থ হয়ে গেছ, কিন্তু যারা আমার সব নিয়েছে তারা তো একবার সে কথা মুখেও আনলে না রাখাল।"

একে একে জমীদারি মটর সবই যাইতেছিল, প্রসাদবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সব শেষ, বাড়ীখানা গেলেই হয়।

রাখালকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার প্রকৃত বন্ধুর কাজ তুমি করছো রাখাল, জানি তুমি চিরকাল এমনই ভাবে করবে। আমার সুকুকে মানুষ করে গড়ে তুলছো, ওকে ওর মামাদের কাছে কোন রকমে যদি পৌঁছে দিয়ে আসতে পার আমি নিশ্চিন্ত হই। কেবল ওকে নিয়ে গেলে চলবে না, ওর মাকেও নিয়ে যেতে হবে। বাড়ীখানা আর পনের দিন আমার আছে, তারপর পাওনাদারে এসে এ বাড়ী দখল করে নেবে, তার আগে ওদের আমি সরাতে চাই।"

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথায় যাবেন?"

হাসিয়া উঠিয়া প্রসাদবাবু বলিলেন, "আমার জায়গার কি অভাব আছে রাখাল, সে আমি ঠিক করে রেখেছি। তুমি ওদের রেখে এসো, তোমার কাজ ফুরিয়ে যাবে। এতদিন বিশ্বস্ত বন্ধুর কাজ করছো, আজও তাই এ কাজের ভার তোমার উপরেই দিতে চাই।"

সেইদিন প্রথম রাখাল প্রসাদবাবুর সহিত তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

আগে এই বাড়ী আত্মীয় আত্মীয়াগণে পরিপূর্ণ থাকিত, আজ এ বাড়ীতে কেহই নাই। প্রসাদবাবু নিজের অবস্থা জানাইয়া সকলকেই সরাইয়া দিয়াছেন, বাকি নিজের স্ত্রী পুত্র। একটী ঘরে ষ্টোভের উপর ভাত চড়ানো হইয়াছে, অনুপমসুন্দরী একটী মেয়ে নিকটেই বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন। লালপাড় শাড়ীর আঁচল পিছনে মাটিতে লুটাইতেছে, মাথায় কাপড় ছিল না, উন্মুক্ত চুলগুলা এলোমেলো ভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সিঁথায় ও কপালে সিঁদুর টিপটী দপ দপ করিতেছে।

প্রসাদবাবুর পদশব্দ পাইয়া তিনি মুখ তুলিলেন, তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া উঠিয়া তিনি একপাশে সরিয়া গেলেন, সেখান হইতে কাহাকেও আর দেখা গেল না।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে প্রসাদবাবু বলিলেন, "আমার স্ত্রী, সুকুমারের মা। আমাদের জন্য আজ ওঁকেই রাঁধতে হচ্ছে।"

কথাটার মধ্যে কতখানি বেদনাপ্রচ্ছন্ন ছিল তাহা রাখাল বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। এই কোটিপতির একমাত্র কন্যা, লক্ষ্মীর গৃহের একমাত্র বধূ—হয় তো কোনদিন কি করিয়া ভাত রাঁধিতে হয় তাহাও জানিতেন না, আজ তাহাকে গৃহের সমস্ত কাজই স্বহস্তে সম্পন্ন করিতে হইতেছে, একি বড় কম কষ্টের কথা।

প্রসাদবাবু ভিতরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "রাখালকে দেখে লজ্জা করে না রাণু, এর সামনে এসো, একে তোমার নিজের সন্তানের মত—নিজের ভাইয়ের মত মনে করে কথা বল।"

বউরাণী স্বামীর আদেশে সরিয়া আসিলেন কিন্তু মুখের অবগুণ্ঠন সরিল না।

প্রসাদবাবু রাখালের পানে তাকাইয়া বলিলেন, "তা হলে রাখাল, তুমি প্রস্তুত হয়ে থেকো, আমি কালই তোমার সঙ্গে এদের, পাঠাতে চাই।"

বউরাণীর পানে তাকাইয়া বলিলেন, "আর অমত করো না রাণু, আমার জন্যে তোমার এতটুকু ভাবনা নেই, আমার জায়গা আমি ঠিক করে রেখেছি, তোমাদের কাল বিকালের মেলে পাঠিয়েই আমি পরশু সকালে চলে যাব। আমার কিছু কষ্ট হবে না, তোমরা চলে চাও, গেলে আমার সম্পূর্ণ শান্তি হবে।"

বউরাণীর মুখের অবগুণ্ঠন সরিয়া গেলে, অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি প্রকাশ হইয়া পড়িল ; স্বামীর মুখের উপর যুগল চোখের দৃষ্টি রাখিয়া তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "না, আমি যাব না, যেতে পারব না।"

বিস্মিত হইয়া গিয়া প্রসাদবাবু বলিলেন, "যাবে না কি রকম? জানো —এ বাড়ী হতে আমাদের পনের দিনের মধ্যে উঠে যেতে হবে, অথচ কোথায় তোমাদের নিয়ে যাব তার ঠিক নেই। আমি একলা মানুষ যেখানে খুসি গিয়ে উঠতে পারব, থাকতেও পারব, স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে থাকলে আমায় কতটা বিব্রত হতে হবে তা একবার মনে ভেবেছ কি?"

বউরাণী নতমস্তকে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাহার পর যখন তিনি মুখ তুলিলেন, তখন তাঁহার মুখের উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শান্তভাবে তিনি বলিলেন, "আমি তোমায় এরকম অবস্থায় একলা কোথাও ছেড়ে দিতে পারব না। বিয়ে হয়ে পর্যন্ত নিজের অনিচ্ছাতেও তুমি যখন যা হুকুম করেছ, অন্যায় জেনেও তা পালন করেছি ; আমার বুকের ভেতরটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, সে আঘাত তুমি জানতে পারনি, কেউ জানতে পারে নি। এতদিন নিজের সত্ত্বা বিলীন করে দিয়েছিলুম,

আদর্শ স্ত্রী হতে গেছলুম, তোমার যখন যা ইচ্ছে হয়েছে করে গেছ, আমি তাতে বাধা দেইনি। এখন দেখছি নিজেই ঠকেছি, তোমার পদানতা দাসী হয়ে যদি না থাকতুম, নিজের সত্বা যদি বজায় রাখতুম—তা হলে হয়তো তোমায় আগেই ফিরাতে পারতুম, সময় থাকতে তুমি সাবধান হয়ে যেতে। কিন্তু আর নয়, আমি তোমার কোন আদেশ আর শুনব না, আমি তোমার কথায় তোমায় ছেড়ে ছেলে নিয়ে চলে যাব না। আমি দাদাকে পত্র দিয়েছি, তিনি উত্তর দিয়েছেন দুই একদিনের মধ্যে এসে আমাদের নিয়ে যাবেন।”

বিবর্ণ হইয়া গিয়া প্রসাদবাবু বলিলেন, “আমাদের মানে—তোমায় আর স্থকুকে তো ?”

বউরাণী একটু হাসিলেন ; সে হাসিতে ঝরিয়া পড়িল হৃদয়ের পুঞ্জীকৃত বেদনারাশী।

তিনি বলিলেন, “তুমি কি তাই ভেবেছ আমি তোমায় একলা ছেড়ে দিয়ে চলে যাব ? তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে কোথায় ? বিপদে আজ তোমার কেউ নেই, একা আমিই আছি, থাকবও। আমার সঙ্গে তোমার যেতে হবে। যতদিন না স্থকু মানুষ হয় ততদিন তোমায় ওখানেই থাকতে হবে।”

প্রসাদবাবু নির্ণিমেষে কতকক্ষণ স্ত্রীর মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর চক্ষু ফিরাইয়া কোনদিকে অন্যমনস্ক ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

ভাত হইয়া গিয়াছিল, বউরাণি ভাত নামাইতে বসিলেন।

প্রসাদবাবু একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া রাখালের পানে তাকাইলেন, শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন, “শুনলে তো রাখাল, আমার ভবিষ্যৎ দেখ, এতে কি শিক্ষা পাওয়ার কিছু নেই ? যে আমি লোককে অজস্র দিয়ে এসেছি, সেই আমায় আজ শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে তাদের গলগ্রহ হয়ে

থাকতে হবে,—কতদিনের জন্য—হয় তো আজীবনকাল এমনই গলগ্রহ হয়ে দিন কাটাতে হবে। উঃ, কি শোচনীয় পরিণাম,—কিন্তু উপায়ই বা কই, বাঁচতে হলে এই রকমই করা চাই বই কি ?"

তিনি অস্থিরভাবে খানিকক্ষণ পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

রাখাল তাঁহার মুখের বিকৃতভাব লক্ষ্য করিয়া চিন্তিত হইল, বলিল, আজীবন কাল নয় বাবু, বউ মা বলছেন যতদিন না সুকু মানুষ হয়—

প্রসাদবাবু এমনভাবে হাসিয়া উঠিলেন যাহাতে রাখাল আর কথাটা শেষ করিতে পারিল না।

খানিকটা অনর্থক হাসি। হাসিয়া প্রসাদবাবু বলিলেন, "তার মানেই তাই—তা জানলে রাখাল। সুকুর বয়েস মাত্র এই নয় বছর, তার মানুষ হতে পনের কুড়ি বছর লাগবেই তো, ততদিন আমার পরের দুয়ারে দুটি অন্নের জন্যে থাকতে হবে। পনের কুড়ি বছর আমি বেঁচে থাকতে পারব কি রাখাল, তারপরে ছেলের গলগ্রহ হওয়ার শুভাদৃষ্ট আমার ঘটবে কি ?"

রাখাল নির্ব্বাকে তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিল।

প্রসাদবাবু বলিলেন, "তবে এসো রাখাল, আর তোমার কোনও দায়ীত্ব রইল না, আমারও নয়।"

তিনি অগ্রসর হইলেন, রাখাল তাঁহার পিছনে চলিল; যাইবার সময় একবার পিছন পানে ফিরিয়া চাহিল, তাহার সে চক্ষে ছিল অনাবিল শ্রদ্ধা ও ভক্তি, মনে মনে সে বউরাণীর সুন্দর পা দুখানিতে লক্ষবার প্রণাম করিয়া গেল।

২৫

মিঃ বসু যখন আসিয়া পৌছাইলেন তখন বেশ সকাল হইয়া গিয়াছে। ভগ্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তা হলে প্রস্তুত হয়ে নাও রাণু, আজই বিকালের ট্রেণে তোমাদের নিয়ে যেতে চাই।"

প্রসাদবাবু তখনও নিজের শয়নগৃহ হইতে বাহির হন নাই।

সুকুমার আসিয়া রাখালকে বলিল, "সরকারমশাই, বাবা আজ এখনও উঠছেন না। এতবার দরজায় ধাক্কা দিলুম, তাঁর কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি নে। মার বড্ড ভয় করছে। বাবা তো কোনদিন দরজা বন্ধ করে শোন না, আজ দরজা বন্ধ, তার পরে তিনি কোনও সাড়া দিচ্ছেন না কেন? মা আপনাকে গিয়ে একবার দেখতে বললেন।"

রাখালের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত যেন বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল—প্রসাদবাবু কিছু করেন নাই তো?

কাল রাত্রের কথাগুলা মনে পড়িল,—প্রসাদবাবু সুকুমারকে কোলে টানিয়া লইয়াছিলেন, তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া কতক্ষণ তাহার পানে চাহিয়াছিলেন। রাখাল তাঁহার এ ভাব কখনও দেখে নাই, সুকুমার ও পিতার এরূপ ভাবান্তর কখনও দেখে নাই, তাই সেও আশ্চর্য্য হইয়া পিতার পানে তাকাইয়াছিল।

কাল সমস্তদিন প্রসাদবাবু বেশী কথা বলেন নাই, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহে আলো জ্বলিতেছিল।

রাখাল তাড়াতাড়ি বাহির হইল।

প্রসাদবাবুর দ্বারে আঘাত করিয়া সে ডাকিল, "বাবু—"

উত্তর নাই, বার বার ডাকিয়াও কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

উৎকণ্ঠাকুল মিঃ বসু বলিলেন, "দরজাটা ভেঙ্গে ফেললে হতো; আমার মনে হচ্ছে ভেতরে কোন কাণ্ড হয়ে গেছে।

বউরাণী পিছনে দাঁড়াইয়া, তাঁহার মুখখানা শবের মতই মলিন হইয়া গিয়াছিল, স্পন্দিত-হৃদয়ে তিনি দ্বারের পানে তাকাইয়া ছিলেন।

রাখাল অতি সহজেই দরজার দুইখানি কব্জা উঠাইয়া ফেলিল। দরজা খুলিতে দেখা গেল প্রসাদবাবু দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া একখানি কৌচে শুইয়া আছেন।

মিঃ বসু মুখ ফিরাইয়া ভগিনীর পানে তাকাইলেন।

কম্পিতকণ্ঠে বউরাণী বলিলেন, তুমি ঘরে যাও দাদা, রাখাল বাবুকে না হয় বল একবার দেখতে।"

রাখাল নিকটে গিয়া ডাকিল "বাবু—"

উত্তর নাই।

রাখাল প্রসাদবাবুর গায়ে হাত দিতেই দেহটা চিৎ হইয়া পড়িল, সে দেহে প্রাণ নাই। বিস্মিত রাখাল সরিয়া দাঁড়াইল—

"দাদা—এ কি হল—"

উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া বউরাণী স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন, বিস্ফারিত নেত্রে স্বামীর পানে তাকাইয়া রহিলেন।

মিঃ বসু বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, একটী কথাও তাঁহার মুখে ফুটিল না।

বউরাণী স্বামীর গায়ে হাত দিলেন, সে দেহ তখন শক্ত, শীতল। গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন নিশ্বাস পড়িতেছে কি না—

"রাখালবাবু, একবার আপনি দেখুন না, একজন ডাক্তার ডেকে আনুন। দেখুন—এখনও নিশ্বাস পড়ছে তো—?"

রুদ্ধকণ্ঠে রাখাল বলিল, "না বউমা, আর নিশ্বাস পড়ছে না, পড়বেও না,—প্রসাদবাবু আর জাগবেন না।"

বউরাণী আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "না না, আপনি বুঝতে পারছেন না, দাদা তুমি একবার দেখ না। এই তো অল্প অল্প নিশ্বাস পড়ছে, এই তো বুকটা একটু নড়ছে। এখনও চেষ্টা করলে হয় তো বাঁচবেন, এখন ও—"

বলিতে বলিতে তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

ডাক্তার আসিলেন, পরীক্ষা করিয়া জানাইলেন, চার পাঁচ ঘণ্টা আগে দেহ হইতে প্রাণ চলিয়া গিয়াছে। এমন উগ্র বিষ তিনি যোগাড় করিয়াছিলেন যাহাতে আধ ঘণ্টার মধ্যে মানুষ মরিবেই।

মিঃ বসু বসিয়া পড়িলেন, স্বামীর বুকের উপর মাথা রাখিয়া বউরাণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া রহিলেন, বালক সুকুমার বাহিরে বারাণ্ডায় পড়িয়া রহিল।

লোকজনে বাড়ী পূর্ণ হইয়া গেল, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মহা সমারোহে প্রসাদবাবুর শবদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল।

মৃতের মাথার কাছে একখানি পত্র লেখা ছিল, কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া এ পত্র লেখা হয় নাই।

রাখাল পত্রখানা পড়িল—

প্রসাদবাবু লিখিয়াছেন—

"আমি চলে যাচ্ছি। আমার এই মরণের জন্যে দায়ী কেউ নয়, আমি নিজে। স্বেচ্ছায় এই ধ্বংশকে বরণ ক'রে নিয়েছি, প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে।

এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে অনেক দেখলুম, অনেক শিক্ষালাভ করলুম। জীবনভোর যে সব কাজ করেছি—অতীতের ইতিহাসের পাতা উল্‌টিয়ে তার মধ্যে মসী বিন্দু ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনে।

কিন্তু ভাল কাজ করবার ইচ্ছা মনে ছিলনা কি? ছিল—এখনও আছে। আজ জীবনের এই শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছি, এক তিল তফাৎ মাত্র, এখনি ওই কালোর মধ্যে আমায় বিলীন হয়ে যেতে হবে, এখন আমি ভাবছি আমার এই দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর জীবনের মধ্যে আমি কি করেছি?

মনে আশা ছিল এমন একটা কাজ করে যাব যাতে আমার নাম অন্ততঃপক্ষে কিছুকাল মানুষের মনে জেগে থাকবে; কিন্তু সে আশা আমার সফল হয়নি।

নিজের যা ছিল সব ঘুচিয়ে দিলুম। কিসে? শুধু বদ খেয়ালে। স্ত্রীকে পর্য্যন্ত সুখী করতে পারিনি, তাকে একটা দিন একটা ভাল কথা পর্য্যন্ত বলিনি।

সুকুকে আজ কোলে টেনে নিলুম, সে অবাক হয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল। তার এই নয় বছর জীবনের মধ্যে সে আমার এত কাছে কখনও আসেনি।

তার মুখের পানে তাকিয়ে আমায় বুকটা শতধা হয়ে যাচ্ছিল। ওর জন্যে আমি কি রেখে গেলুম?—কিছু না, মাথা রাখবার বাড়ীটুকু পর্য্যন্ত নেই, এখন আমার ছেলে হয়ে ওকে পরের বাড়ী গিয়ে থাকতে হবে।

তবু ও তা পারবে কারণ ও ছেলেমানুষ—আত্মমর্য্যাদা বোধশক্তি ওর এখন নেই, দুঃখকষ্ট বরণ করে নিয়ে ক্রমে সহ্য করতেও পারবে—কিন্তু আমি তা পারব না। এই হাতে লোককে দানই করেছি, কারও কাছ হতে কিছু নেইনি, আজও নিতে পারবনা।

আর রাণু, তাকে বলবার মত আমার কিছু নেই, অথবা থাকলেও আমি বলবার ভাষা পাচ্ছিনে। আমি তার স্বামী, কিন্তু তাকে তার প্রাপ্য কোনদিন এতটুকু দিয়েছি কি? সে আমার কাছে পেয়েছে কি—

চির অবহেলা—তাচ্ছিল্যও। তবু সে আমায় ভালবাসে, তবু সে আমায় ফেলে কোথাও যাবে না। বিশেষ করে ওকে মুক্তি দিতেই আমি আজ চললুম। আমি জানি রাণু আমায় ছেড়ে কোথাও যাবেনা, আমার সঙ্গে সে সকল কষ্ট, সকল দুঃখ বরণ করে নেবে। আমি কি তা পারি? আমি অন্যায় করেছি তার শাস্তি আমি ভোগ করব, আমার রাণু—আমার সুকু কেন তা ভোগ করবে? ওদের আমি কিছু দিতে পারিনি, সুখের অংশ সম্পূর্ণ দেইনি, দুঃখের অংশ দেব এমন নরাধম আমি নই। আমি সকল দুঃখ বরণ করতে পারতুম—যদি ওরা চলে যেত, কিন্তু ওরা তো যাবে না।

আজ আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব, ওদের দাঁড়ানোর স্থান থাকবে না, বাধ্য হয়ে যেতেই হবে।

আমার ভিটা,—আমার সাত পুরুষ এই ভিটায় কাটিয়ে গেছেন, জীবন্তে কেউ এখান হতে যান নি, আমি এ ভিটা ছেড়ে কোথায় বাস করতে যাব? প্রথম এই ভিটাতেই আমি চোখ মেলেছি, আজ শেষ এই ভিটাতেই চোখ মুদব। আমি বাঁচতে চাইনে, ঘৃণিত পরান্নভোজী হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে—আমার ভিটায় আমি মরব, এ মরায় গৌরব আছে।

আর না—রাত হয়ে আসছে,—বিদায়।—প্রসাদ।"

রাখালের চক্ষু দুইটী অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল, সে পত্রখানা মিঃ বসুর হাতে দিয়া সরিয়া গেল।

এমন সদাশয় মহাপ্রাণ লোক সে খুব কমই দেখিয়াছে। মাতাল হইলেই বা কি, প্রসাদবাবুর এমন কতকগুলি গুণ ছিল যাহা অনেক মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। তাঁহার সঙ্গী অনেকের যথার্থ পরিচয় তিনি জানিতেন, সমস্ত জানিয়াও তিনি তাহাদের তাড়াইয়া দিতে পারেন নাই, কাহাকেও তিনি কঠিন কথা বলিতে পারিতেন না এই ছিল তাঁহার প্রধান দোষ।

মিঃ বসুকে অগত্যা বাধ্য হইয়া চারদিন থাকিতে হইল। তাহার পর একদিন রোরুদ্যমানা ভগিনী ও ভাগিনেয়কে লইয়া রওনা হইবার উদ্যোগ করিলেন।

যাওয়ার আগে বউরাণী সুকুমারকে দিয়া রাখালকে ভিতর বাটীতে ডাকাইয়া আনিলেন। আজ রাখাল তাঁহাকে যে মূর্ত্তিতে দেখিল তাহা তাহার মনের মধ্যে চিরকাল জাগরিত থাকিবে।

প্রথম সে একদিন বউরাণীকে দেখিয়াছিল, সেদিনে তাঁহার হাতে তিনগাছি করিয়া চুড়ি ও শাঁখা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তাঁহার সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দূর সেদিন দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছিল, লাল কাপড়ের পাড়টী আগুনের মত দেখাইতেছিল। আজ তাঁহার পরিধানে শুভ্র থান, রুক্ষ চুলগুলা এলোমেলোভাবে জড়ানো, সিন্দূরহীন সীমন্ত।

রাখাল একবার মাত্র মুখ তুলিয়াই চক্ষু নামাইল, এ মূর্ত্তি সে যেন সহিতে পারিতেছিল না।

বউরাণী অন্যমনস্কভাবে বাহিরের পানে তাকাইয়া ছিলেন, সুকুমার তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "মা, সরকার মশাই এসেছেন।"

বউরাণী চোখ ফিরাইলেন, তাঁহার চক্ষু দুইটী অশ্রুসিক্ত।

রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "রাখালবাবু, আপনার সুকু আজ চলে যাচ্ছে ওর সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক এখনকার মত ঘুচে গেল। আশীর্ব্বাদ করুন ও যেন মানুষ হতে পারে, আমার স্বামীর হারানো সম্পদ ফিরিয়ে আনতে পারে, আমি যেন ওকে রেখে মরতে পারি।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

বলার মত কথা রাখাল খুঁজিয়া পাইল না, সে শুধু বিষণ্ণ-নেত্রে এই শোকাতুরা সদ্য-বিধবার পানে তাকাইয়া রহিল।

কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বউরাণী বলিলেন, "আমার এই বাড়ী সম্পত্তি

কুড়ি বছরের জন্যে বন্ধক দেওয়া রইল, কুড়ি বছরের পরে সুকু সমস্ত ফিরে পাবে, এ বোধ হয় শুনেছেন। আমার স্বামীর বন্ধু সব নিয়েছেন, তিনি এর মধ্যে সমস্ত দেনা শোধ করে দেবেন, দাদার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়েছে। তাই ভাবছি রাখালবাবু, মাত্র কুড়িটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে— আমার সবই হবে, কিন্তু যিনি অপমানে, লজ্জায় আত্মহত্যা করলেন তিনি আর ফিরে আসবেন না।"

বউরাণী উচ্ছ্বসিত অশ্রু আর সংযত রাখিতে পারিলেন না। পুত্রের সম্মুখে চোখের জল ফেলিবেননা বলিয়া যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহা ভাঙ্গিয়া গেল।

"মা—"বালক সুকুমার হঠাৎ হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বউরাণী তখনই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পুত্রকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন, আপনার অঞ্চলে তাহার মুখ মুছাইয়া দিতে দিতে সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, "আবার কাঁদছিস বাবা? চুপ কর, এই দেখ আমি চুপ করেছি, আর কাঁদব না। তুই চুপ কর সুকু, তুই কাঁদলে আমার বুক যে আরও ফেটে যায় বাবা।"

সুকুমার চুপ করিল।

বউরাণী বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন, "আমার স্বামীর আজ এমন কিছু নেই যা দিয়ে আপনার অসীম ঋণের এতটুকু শোধ দিতে পারি।—"

রুদ্ধকণ্ঠে রাখাল বলিল, "ভুল বুঝছেন বউমা, আমি পাওয়ার আশায়—"

বাধা দিয়ে বউরাণী বলিলেন, "তা আমি জানি। তবু—আমাদের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ আপনাকে এই আংটীটা দিয়ে যাচ্ছি রাখালবাবু, যদি কোনদিন অসময় পড়ে—এটা বিক্রি করলে হাজার দুই তিন টাকা আপনি পেতে পারবেন। মনে করুন আপনার বোন আপনাকে দিচ্ছে,

আপনি আপনার বোনের দান যেমন অগ্রাহ্য করে ফিরিয়ে দিতে পারেন না, এটাও তেমনি পারবেন না।”

কঠিন-হৃদয় রাখালের দুই চক্ষু দিয়া এই প্রথম তাহার জীবনে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল। মায়ের মৃত্যুতে সে কাঁদিতে পারে নাই, স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, আজ সে কাঁদিতে পারিয়াছিল।

হাত পাতিয়া রাখাল এই মহাদান গ্রহণ করিল।

সেই দিনই বৈকালের ট্রেণে মিঃ বসু, সুকুমার ও বউরাণীকে লইয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের মত কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গেলেন, রাখালও জন্মের মত এ বাড়ী ছাড়িল।

পথে বাহির হইয়া সে একবার পিছন ফিরিয়া বৃহৎ অট্টালিকাটীর পানে তাকাইল।

তিন বৎসর পূর্ব্বে সে যখন এ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন ইহাকে কি সমৃদ্ধিশালীই না দেখিয়াছিল ;—আজ এ অট্টালিকা একেবারে শূন্য। বাহিরে গেট দিয়া প্রবেশ করিবার পথের দুইধারের ফুলবাগান পর্য্যন্ত হতশ্রী হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আর ফুল ফুটে না। উপরের বারাণ্ডার ধারে ধারে টবগুলি আছে, তাহাতে ফুলগাছ নাই। শূন্য সুদৃশ্য খাঁচাগুলি বাতাসে দুলিতেছে, নানা জাতীয় পক্ষী ভিন্ন ভিন্ন খাঁচায় নাই, খাদ্যাভাবে সবগুলিকে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এ যেন তাসের ঘর সাজানো। তিলে তিলে, দিনে দিনে যাহাকে বাড়াইয়া তোলা হইয়াছিল, সাজানো হইয়াছিল, একটী বাতাসের ঢেউ আসার সঙ্গে সঙ্গে সবই ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

রাখাল শুষ্কনেত্রে সম্মুখের পানে চাহিল।

২৬

খিদিরপুর ডকের চাকরী, মন্দ নহে, মাসে তবু কুড়িটা করিয়া টাকা পাওয়া যায়।

রাখাল থাকে খিদিরপুরেই—কুলিবস্তিতে। সামান্য টাকা সে বেতন পায়—ঘর ভাড়া দিয়া আহার চালাইতে হইবে, পরণের কাপড় দরকার, মাসে তিনটাকা ঘরভাড়া সে দেয়।

এখানে থাকিবার ইচ্ছা করে না। আগেও সে এমনই নোংরা জায়গায় কতকাল কাটাইয়াছে কিন্তু তখন তাহার অন্তরে এমন সূক্ষ্ম বোধশক্তি জন্মায় নাই। রাত্রে চারিদিকে অশ্লীল চীৎকার—গান, শনিবার রবিবারে তাণ্ডব নৃত্য তাহার চক্ষুকে বড় পীড়া দেয়। সে নিজের খাটিয়াটার উপর শুইয়া পড়িয়া হতাশ হইয়া ভাবে—এমনই করিয়াই কি তাহাকে জীবনটা কাটাইয়া দিতে হইবে, ইহার চেয়ে উঁচু স্তরে সে কি কোনদিন উঠিতে পারিবে না?

বউরাণী তাহার চোখের সামনে সমগ্র নারীজাতিকে উচ্চ স্থানে স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, এই একটী নারীর মধ্য দিয়া সে দুনিয়ার সমস্ত নারীকে দেখিয়াছে, সমস্ত নারীর পরিচয় পাইয়াছে। এখানে এই বস্তির মধ্যে নারীর মধ্যে সে যাহা দেখিতে পায় তাহাতে শিহরিয়া উঠে, দুই হাতে চোখ ঢাকে।

দীর্ঘ দিনগুলা অশ্রান্তভাবে কাজের মধ্যে কাটিয়া যায়, রাত্রেই হয় মুস্কিল। একা সে একখানি খোলার ঘর লইয়াছে, কিন্তু পাশের ঘরগুলি হইতে চীৎকার, গানের শব্দ আসিয়া তাহার শান্তি দূর করিয়া দেয়, সে অতিষ্ঠ হইয়া ভাবে—এখান হইতে সে পলাইবে।

সে-দিনে হঠাৎ ভূপালের সহিত তাহার দেখা হইয়া গিয়াছিল। ভূপাল আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিয়াছিল—"সে কি দা-ঠাকুর, তবে যে শুনেছিলুম তুমি কোন জমীদারের বাড়ীতে রাজার হালে থাকো, সে কি তবে মিছে কথা ?"

রাখাল শুষ্ক হাসিয়া বলিয়াছিল, "না, সত্যি কথা, কপাল দোষে অমন মনিব হারিয়েছি ভাই, পেটের জ্বালায় আবার এই কাজ নিতে হয়েছে।"

কথায় কথায় ভূপাল সবই জানিয়া লইয়াছিল, দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিল, "শুনে বড় আনন্দ হয়েছিল দা-ঠাকুর যে ভদ্দর লোকের ছেলে, ভদ্দর লোকের মতই রয়েছ। আবার এই কুলি মজুরের কাজে এসেছ দেখে সত্যি বড় কষ্ট হ'ল।"

ভূপাল এখন কি করে জিজ্ঞাসা করিয়া রাখাল শুনিয়াছিল তাহার ভাইটী আই-এ পড়িতেছে, একজন বড়লোকের মেয়ের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া ভূপাল জমীজমা দেখা শোনা করিতেছে, তাহার ভাই তাহাকে আর চাকরী করিতে দেয় না।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া রাখাল ভাবিয়াছিল, সকলেরই সব আছে, তাহারই কেবল কেহ নাই।

সে-দিন শনিবার ছিল, জন কয়েক বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে পড়িয়া রাখাল বাহির হইয়াছিল, যখন বাসার ফিরিতেছিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

আজ নেশার মাত্রাটা কিছু বেশী হইয়া গিয়াছিল। টলিতে টলিতে ফিরিয়া আসিবার সময় সে পড়িয়া গেল।

পুলিসের দৃষ্টিতে পড়িয়া সে-রাত্রি তাহাকে হাজতে লইয়া যাওয়া হইল, সকালে তাহাকে জরিমানা লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

রবিবার ছুটির দিন। এই দিনে তাহাদের কমিশনর বদলী হইয়া চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহার স্থলে আর একজন আজই বৈকালে আসিবেন, কাল হইতে তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

রবিবার দিনও বন্ধুরা তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল, এবং তাহাকে বাসায় পৌছাইয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়া প্রচুর মদ খাওয়াইয়া দিল।

সে-দিন ফিরিবার সময় রাখালের স্ফূর্ত্তির শেষ ছিল না—মনের আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে সে ফিরিয়া আসিতেছিল।

হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল—একখানা মোটরের সামনে ও কে দাঁড়াইয়া ?

ইথার না ?

রাখাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, আর এক পাও সে অগ্রসর হইতে পারিল না।

ইথার প্রথমে তাহাকে দেখিতে পায় নাই, সে মোটরে উঠিয়া পড়িল। শোফার মোটর চালাইতে গিয়া থামিল, বার বার হর্ণ দিয়াও সম্মুখের লোকটীকে সরাইতে পারিল না, অগত্যা তাহাকে নামিতে হইল।

সে যখন গিয়া সম্মুখের লোকটীকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিল, তখন ইথারের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল।

"রাখালদা—"

সে চেঁচাইয়া উঠিতেই রাখাল চমকাইয়া উঠিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইল ; তাহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। প্রেতে তাড়া করিলে মানুষ যেমন ছুটিয়া পলায়, রাখাল সেই রকম করিয়া ছুটিয়া পলাইল।

নেশা তাহার দূর হইয়া গিয়াছিল। এক ছুটে নিজের ঘরে আসিয়া সে দরজায় খিল আঁটিয়া দিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

ইথার তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে, তাহাকে চিনিয়াছে, তাই সে

রাখালদা বলিয়া ডাকিয়াছে। ছিঃ ছিঃ, ইথার তাহাকে এমন অবস্থায় দেখিয়াছে যখন তাহার মধ্যে এতটুকু জ্ঞান ছিল না।

সে-দিন অনতিবিলম্বে সে ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন ভোরে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু সে উঠিতে পারিল না, বিছানায় শুইয়া পড়িয়া গত সন্ধ্যার কথাই ভাবিতে লাগিল।

আজ কার্য্যে যাইতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল না, শরীর বড় শ্রান্ত বলিয়া মনে হইতেছিল। কিন্তু উপায় নাই, কাজে যাইতেই হইল।

বৈকালে ফিরিবার তাড়াতাড়িতে সে একেবারে ইথারের সম্মুখে পড়িল। নবাগত কমিশনার মিঃ মুখার্জ্জির সহিত সে অফিস হইতে বাহির হইতেছিল, সম্মুখে রাখালকে দেখিয়া সেও বিস্ময়ে তাহার পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মিঃ মুখার্জ্জি হঠাৎ তাহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া ফিরিলেন, "এ কি, দাঁড়ালে যে, এসো।"

ইথার বলিল, "আপনি যান, আমি এখনি আসছি।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মিঃ মুখার্জ্জি বলিলেন, "এই কুলিগুলোর মধ্যে থেকে যাবে ইথার?"

একটু হাসিয়া ইথার বলিল, "মাত্র পাঁচমিনিট থাকতে চাই, আপনি ততক্ষণ যান।"

মিঃ মুখার্জ্জি চলিয়া গেলেন।

ইথার যখন রাখালের সম্মুখে দাঁড়াইল, রাখাল তখন মুখ তুলিতে পারিতেছিল না।

ইথার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার জন্যে অনেক খোঁজ করেছিলুম রাখালদা, সমস্ত হাতিবাগানটা তোলপাড় করেছিলুম, কেউ তোমার সন্ধান দিতে পারে নি। শুনেছিলুম কোন জমীদারের কাছে রয়েছ,

ভেবেছিলুম একদিন নিশ্চয়ই তোমার দেখা পাব, কিন্তু কাল সন্ধ্যায় ছাড়া তোমার দেখা পাইনি। কাল সন্ধ্যাবেলায় অমন করে ছুটে পালালে কেন বল দেখি ?”

রাখাল একবার মুখ তুলিয়া চাহিল। কই, ইথারের তো এতটুকুও পরিবর্ত্তন হয় নাই, এ যেন সেই ইথারই রহিয়া গিয়াছে।

তাহাকে নীরব দেখিয়া ইথার বলিল, “আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার কি লজ্জা করছে রাখালদা ?”

রাখাল কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, “হচ্ছে বই কি, কেন না আমার সম্পর্কে একদিন অনেক কথাই তুমি শুনেছিলে—”

বাধা দিয়া ইথার বলিল, “কিন্তু আমিতো সে-সব কথা বিশ্বাস করি নি।”

রাখাল একটু হাসিল, বলিল, “কথাগুলো তখন সম্পূর্ণ মিথ্যে হলেও এখন মিথ্যে নয় ইথার, তখন যা মিথ্যে ছিল এখন তা সত্যি হয়েই দাঁড়িয়েছে।”

ইথার নিস্তব্ধ ভাবে তাহার পানে খানিক তাকাইয়া রহিল, নরমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন ?”

কেন—রাখাল নিজেকে সামলাইতে পারিল না, গর্জ্জিয়া উঠিল—“কেন, সে কথাও শুনতে চাও ইথার ? ভাবলুম—নিজেকে সকল অবস্থায় অক্ষুণ্ণ অটুট রেখেও যদি অপকলঙ্কের হাত এড়াতে না পারা যায়, দরকার কি আমার ভাল সেজে থাকায়—আমি মন্দ হয়ে দেখি। এখন তাই দেখছি, ডুবছি—আরও ডুবব।”

ইথার শান্তকণ্ঠে বলিল, “এতে কাকে জব্দ করা হচ্ছে ?”

রাখাল তেমনই দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিল, “কাউকে নয়, নিজেকে নিজেই জব্দ করছি।”

"এদিকে এসো রাখালদা, এটা যাওয়া-আসার পথ, অনেক লোক এখান দিয়ে যাওয়া-আসা করছে।"

ইথার অগ্রসর হইল।

দূরে একখানা তক্তা জলের ধারেই পড়িয়াছিল, এদিকে দুই একজন লোক কাজের জন্য মাঝে মাঝে যাতায়াত করিতেছিল।

ইথার এখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাখাল অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, "আরও কতকগুলো অপমান করবে এই উদ্দেশ্য তো ?"

ইথার বলিল, "তোমাকে অপমান কি আমিই করেছিলুম ?"

তাহার কণ্ঠস্বরে বেদনা ফুটিয়া উঠিতেছিল।

রাখাল এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "তুমি নও, কিন্তু তোমার আত্মীয় তো বটে।"

রাগ করিয়া ইথার বলিল, "আমার আত্মীয় তোমার আত্মীয় নয় রাখালদা ?"

রাখাল চুপ করিয়া রহিল।

ইথার বলিয়া চলিল, "বস, যাই হোক, আমারই আত্মীয় হোক আর তোমারই আত্মীয় হোক, তা নিয়ে আমাদের আর কোন কথাবার্ত্তা হতে পারে না, কেন না আমি ইচ্ছা করেই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেছি। যাতে আর কোনও আত্মীয় এসে আমায় উত্যক্ত না করে কেবল সেই জন্যেই আমার ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করা।"

রাখাল যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল, "খৃষ্টান হয়েছ—তুমি—ইথার ?"

ইথার একটু হাসিল, তখনই সে হাসি তাহার মুখ হইতে মিলাইয়া গেল, সে বলিল, "হ্যাঁ আমিই ; বড় বেশী দিনের কথা নয়—মাত্র বছর খানেকের কথা, আমি খৃষ্টান হয়েছি।"

রাখাল বলিতে গেল, "কেন হিন্দুধর্ম্মে—"

বাধা দিয়া ইথার বলিল, "এতে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা, নিষ্ঠা অনিষ্ঠার কথা বিন্দুমাত্র নেই রাখালদা, আমি বড় বেশী রকম জ্বালাতন হয়ে পড়েছিলুম। সমস্ত ব্যাপারটা বললে বুঝতে পারবে। আমি এম-এ পাস করে এখানকারই একটা স্কুলে কাজ নিয়েছিলুম; বছরখানেক কাজ করার পরে দাদা হঠাৎ মারা যান, তারপরই শুনতে পেলুম, তিনি অনেক টাকা মিঃ রায়ের কাছে ধার করে গেছেন। মিঃ রায় প্রস্তাব করলেন যদি আমি তাঁকে বিয়ে করি তিনি সব টাকা ছেড়ে দেবেন।"

ইথারের মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছিল, সে অন্যমনস্কভাবে গঙ্গার স্রোতগুলার পানে তাকাইয়া রহিল।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর?"

চমকাইয়া উঠিয়া ইথার মুখ ফিরাইল, "হ্যাঁ, তারপর বউদি আমায় ধরে বসলেন এ কাজ করতেই হবে। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলেরই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। আমি জানালুম—আমি জীবনে কোনদিন বিয়ে করবনা বলে প্রতিজ্ঞা করেছি, কাজেই মিঃ রায়কেও বিয়ে করতে পারব না।"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া রাখাল বলিল, "বিয়ে করবে না—কেন?"

ইথার বলিল, "যে কারণেই হোক, আমি বিয়ে করব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। ওঁরা এ কথা শুনেও শুনলেন না, অনুনয় বিনয় বউদির কান্না —কিছুতেই আমি ভিজলুম না। এই সময়ে কি মন হয়ে গেল জানিনে, খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে ফেললুম।"

সে চুপ করিয়া গেল দেখিয়া রাখাল বলিল, "ওঁরা আর তোমায় কিছু বলেননি?"

ইথার একটা হালকা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা হয়েছে বই কি।

বউদি আমায় বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বললেন, আমিও বার হয়ে এলুম। মিঃ মুখার্জ্জি আমার দাদার ছোটবেলাকার বন্ধু, আমায় ছোটবোনের মত ভালবাসেন, ওঁর স্ত্রীও আমায় খুব ভালবাসেন, সেই হতে ওঁদের বাড়ীতে রয়েছি। স্কুলে মাসে মাসে যে বেতন পাই সবটা দাদার দেনা শোধ করতে মিঃ রায়কে দেই।"

রাখাল অন্যমনস্কভাবে বলিল, "একেবারে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাটা অন্যায় হয়েছে ইথার।"

ইথার উত্তর দিল, "তা হয়েছে স্বীকার করি, কিন্তু এ করা ছাড়া এই সব আত্মীয়দের হাত এড়াতে আমার অন্য উপায় ছিল না। আমার বউদির মধ্যে গোঁড়ামী এখনও আছে, তিনি বাধ্য হয়ে আমার সংস্পর্শ ত্যাগ করেছেন, তাঁর আত্মীয়-স্বজনও আসা বন্ধ করেছে।"

মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এইখানেই আছ তো, তোমার বাসা কোথায় ?"

রাখালের মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, "সে খোঁজে দরকার নেই ইথার, বাসা মানে পায়রার খোপ। এমন খারাপ জায়গা যে সেখানে তোমায় আমি নিয়ে যেতে পারিনে।"

ইথার গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমিই বুঝি যেতে চাইব ? যাই হোক এইখানেই আছ তো, দেখা শুনা মাঝে মাঝে হতে পারবে। তুমি এককাজ কর রাখালদা, এ সব ছোট কাজ ছেড়ে দাও, আমার কাছে চল, আমি তোমায় আর খানিকটা পড়িয়ে একটা কোনও ভাল কাজ যোগাড় করে দেব ?"

"এই বুড়ো বয়েসে আবার পড়া—?"

রাখাল হাসিল।

ইথার জোর করিয়া বলিল, "তাতে তোমার এতটুকু লজ্জা নেই—

পড়তে আবার মানুষের লজ্জা। এক একজন লোক যে তোমার চেয়েও বুড়ো হয়ে পড়ে।”

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, “কার কাছে পড়ব?”

ইথার বলিল, “আমার কাছে।”

রাখাল মাথা নাড়িল।

ইথার বলিল, “তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?”

রাখাল বলিল, “কি করে বিশ্বাস হবে? তোমার নিজের স্কুলের কাজ রয়েছে, এর মধ্যে—”

ইথার হাসিয়া উঠিল, বলিল,“হয়েছে, সে জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, আমার কাজের সময় আমি বেশ বুঝি। সকালে সন্ধ্যায় আমার যথেষ্ট অবকাশ থাকে তা তো জানো, ওই সময়টায় তোমায় পড়িয়ে দিতে পারব।”

রাখাল বলিল, “কিন্তু আমার খরচ—”

ইথার বলিল, “সে জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। ভারি তো তোমার খরচ, সে যেমন করেই হোক চালিয়ে দেওয়া যাবে।”

সঙ্কুচিত হইয়া রাখাল বলিল, “তুমি যে খৃষ্টান ইথার—”

ইথারের চক্ষু দুইটা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—একটু থামিয়া সে বলিল, “ঠিক, আমার মনে ছিল না তুমি হিন্দু আমি খৃষ্টান, তোমার আমার মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। ভয় নেই রাখালদা, আমার দ্বারা তোমার জাতির গৌরব, এতটুকু ক্ষুণ্ণ হবে না, আমি তোমার হোটেলে খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত করে দেব।”

সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘনভাবেই ধরার বুকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, নিকটে ও দূরে বৈদ্যুতিক আলোগুলি উজ্জ্বল দীপ্তি বিকাশ করিতেছিল। ছোট ছোট পতঙ্গগুলি আলোর চারিদিকে উড়িতেছিল, কাচে বাধিয়া পড়িয়া যাইতেছিল আবার সেই আলোর পানে ছুটিতেছিল।

ইথার ক্ষণকাল সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দে রাখাল চমকাইয়া যখন মুখ ফিরাইল তখন ইথারও কথা বলিবার জন্য মুখ তুলিয়াছে।

"তবে এই কথাই রইল রাখালদা, এই মাসটা তুমি এখানে কাজ করবে, জুলাই হতে তোমার ছুটি নিতে হবে, আর এই ছোটলোকদের কাছে থেকে ছোটলোকের কাজ করতে পারবে না। এসো এখন, আমায় খানিকটা এগিয়ে দেবে।"

সে অগ্রসর হইল।

ইথারের নিকট যে কথা দেওয়া হইয়াছিল তাহা রাখাল ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া গেল।

ইথারকে সে ভয় করে, ইথারের কাছে তাহার সঙ্কোচ আসে, সেই ইথারের কাছে সে থাকিবে কি করিয়া? ইথারকে সে দূর হইতে দেখে, তাহাকে নীরবে প্রাণের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্পণ করিয়া সরিয়া যায়, যে-দিকে ইথার থাকে, সে-দিকেও সে যায় না।

সে-দিনে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট, কেহই কাজে গেল না, রাখালকেও তাহারা যাইতে দিল না।

এই ধর্ম্মঘট লইয়া শ্রমিকদের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল; সে অত্যাচার রাখাল সহিতে পারিল না, সে তাহার শক্তি সাহস লইয়া কর্ত্তাদের বিপক্ষে দাঁড়াইল।

শ্রমিকেরা যখন মারধর করিবার প্রস্তাব করিল, রাখাল তাহাতে মত দিল না; সে দৃঢ়ভাবে জানাইল নীরবে কাজ ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল কাজ, কর্ত্তাদের উপর প্রতিশোধ তুলিবার চেষ্টার ফল আরও খারাপ হইবে।

সে-দিনে সাহেব যখন কার্য্যাবসানে ফিরিতেছিলেন সেই সময় শ্রমিক দল তাঁহাকে আক্রমণ করিল।

পুলিসও আসিয়া পড়িল; পুলিসে ও শ্রমিক দলে দারুণ মারামারি আরম্ভ হইয়া গেল।

ক্ষিপ্ত শ্রমিকেরা নিজেদের জীবন-মরণের দিকে তাকাইল না, তাহারা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাদের কর্ত্তা ছিল রাখাল,—সে ইহাদের নিবৃত্ত

হইবার জন্য চীৎকার করিতেছিল, কিন্তু তাহার কথা কেহ কানে তুলিল না।

অবশেষে পুলিস গুলি চালাইল।

জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িল তাহার ঠিক নাই।

রাখালের হাতের চামড়া ভেদ করিয়া একটা গুলি চলিয়া গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিল, পুলিস কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল, কতকগুলির পশ্চাদ্ধাবন করিল কিন্তু তাহাদের ধরিতে পারিল না।

হাতের অসহ্য যন্ত্রণায় রাখাল অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্ত রাত্রি সে যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল, ইহার উপর যখন প্রবলবেগে জ্বর আসিয়া আক্রমণ করিল তখন সে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিল।

সমস্ত দিন কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, সন্ধ্যাবেলা যখন তাহার জ্ঞান হইল, তখন সে চক্ষু মেলিয়াই গৃহমধ্যে একটী রমণীকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল।

তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, কাতরকণ্ঠে সে বলিল, "একটু জল দাও।"

রমণী তাড়াতাড়ি গ্লাসের জল তাহার মুখে দিল।

এতক্ষণ যাহা স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছিল তাহা সত্যরূপে রাখালের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল। সে দেখিতে পাইল পার্শ্বের ঘরের রামশরণ সর্দ্দারের সেই দারুণ দুর্ম্মুখা বিবাদ-পরায়ণা স্ত্রীটিই তাহার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে।

রামশরণ সর্দ্দার লোকের নিকট বলিত তুলসী তাহার বিবাহিতা পত্নী নয়, কিন্তু তুলসী সগর্ব্বে লোকের কাছে প্রচার করিত সে তাহার বিবাহিতা পত্নী। সর্দ্দার তুলসীর ভয়ে সর্ব্বদা তটস্থ থাকিত, তথাপি

তাহার নিস্তার ছিল না। পাশের ঘরে এই পরিবারটী থাকায় রাখালের কত রাত্রি বিনিদ্র কাটিয়া গিয়াছে তাহার ঠিক নাই।

এই দুর্ম্মুখা নারীটি বস্তির সকলের উপরেই প্রভুত্ব চালাইত, সকলেই ইহার ক্ষুরধার রসনাকে ভয় করিত। ইহার মত কঠিন প্রকৃতির নারীর মধ্যেও যে স্নেহ-দয়া আছে তাহা রাখাল আজ ছাড়া আর কোনদিন জানিতে পারে নাই।

সে দেখিতে পাইল তাহার হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, এই দয়াবতী রমণীটিই যে তাহার সেবাশুশ্রূষা করিতেছে তাহাতে তাহার সন্দেহ রহিল না।

শ্রান্তভাবে সে চোখ মুদিল। তুলসী তাহার মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে ?"

তাহার মুখে এমন স্নিগ্ধ কথা—রাখাল আশ্চর্য্যভাবে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হচ্ছে বই কি, এই হাতটায়—"

তুলসী সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল; "আহা বাছা রে, মা নেই বুঝি ?"

রাখাল নিঃশব্দে মাথা নাড়িল।

তুলসী বলিল, "ভাই বোন—"

রাখাল জানাইল কেউ নেই।

তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, "বউ,—তাও নেই ? বিয়ে করনি বুঝি—তাই এমন দশা। ভদ্দর লোকের ছেলে—লেখাপড়া বুঝি শেখনি তাই এই কুলির কাজ করতে এসেছ ? করছিলে ভালই—এসব কাজে কেন গেলে বাছা ? এই যে এখন হাতের যন্ত্রণা, তা ছাড়া পুলিসও তোমায় অমনি ছাড়বে না—"

রাখাল বলিল, "সর্দ্দার কোথায় ?"

তুলসী একটা নিশ্বাস ফেলিল, "সব ধরা পড়েছে, পুলিস কাল দশ

বার জনকে গুলি করেছিল তারা হাঁসপাতালে গেছে। কাল কয়জন ধরা পড়েছিল, আজ না হোক কুড়ি পঁচিশজনকে ধরে নিয়ে গেছে, সর্দ্দারও ধরা পড়েছে।"

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া আসিল, তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল, "পোড়ারমুখো তো দিব্যি চলে গেল, আমি এখন কি করি—কোথায় যাই, কে আমায় দেখে? তিনকুলে কেউ নেই,—এক মামা আছে, সেখানে গেলে আর কি জায়গা দেবে? পোড়ারমুখো মিনসে আমার সব দিক ঘুচিয়ে দিয়েছে যে।"

এখানে দীর্ঘ পনের বৎসর বাসের মধ্যে সে যে কথা এক প্রাণীকেও বলে নাই আজ সেই সব কথা সে রাখালের কাছে মনের আবেগে ব্যক্ত করিয়া ফেলিল।

রামশরণ জাতিতে এককালে ব্রাহ্মণ ছিল। অতি বাল্যকালে তাহাদের বিবাহ হয়, কিন্তু স্ত্রী তখন পিত্রালয়েই ছিল, রামশরণের পিতামাতা না থাকায় স্ত্রীকে লইয়া যাইবার স্থান ছিলনা।

যখন তুলসী আট নয় বৎসরের তখন রামশরণ এক সুন্দরী মুসলমান বালিকার জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে এবং বালিকাকে গ্রহণ করে। ইহারই কয়েক বৎসর পরে স্ত্রীর চরিত্রে সে দোষ দেখিতে পায়। স্ত্রীকে বারবার সাবধান করা সত্ত্বেও সে যখন সাবধান হইল না, তখন একদিন দারুণ ক্রোধে সে তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়া গা ঢাকা দেয়।

পাঁচ বৎসর পরে সে একদিন পূর্ব্ব স্ত্রীর কাছে গিয়া পড়ে, তখন ব্যারামে সে জীর্ণশীর্ণ। তুলসীর মামা হত্যাকারীকে পুলিসে দিবার প্রস্তাব করেন কিন্তু তুলসী তাহাতে বাধা দেয়। মামা তুলসীকে দূর হইয়া যাইতে বলেন, মুখরা তুলসীও সেই মুহূর্ত্তে স্বামীকে লইয়া চলিয়া আসে।

তাহার পর কত কষ্টে সে স্বামীকে আরোগ্য করিয়া তোলে তাহা সেই জানে আর বাবা বিশ্বনাথই জানেন। ভাল হইয়া দিনকতক এদিক ওদিক ঘুরিয়া স্বামী এখানে আসিয়া নাম বদল করিয়া কাজ লইয়াছে এবং এখানেই থাকিয়া গিয়াছে। তাহার আকৃতির আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, দেখিয়া কেহ চিনিতে পারে না কাজেই এতকাল ধরা পড়ে নাই।

রাখাল নিজের যন্ত্রণার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল, তন্ময় হইয়া সে তুলসীর এই আশ্চর্য্য কাহিনী শুনিতে শুনিতে বার বার তাহার মুখের পানে তাকাইতেছিল।

কে আজ দেখিয়া বলিতে পারে এই মেয়েটাই একদিন ভদ্র গৃহস্থকন্যা ছিল। আজ ইহাকে দেখিয়া সামান্য লোক বলিয়াই মনে হয়, স্বামীর জন্য এই মেয়েটা নিজেকে পর্য্যন্ত কতখানি হেয় করিয়াছে ভাবিতে রাখালের সমস্ত হৃদয়টা ভিজিয়া গেল।

সে খানিকক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, "পুলিসে আমাকেও তো ছাড়বে না তুলসী, আমিও দলের মধ্যে ছিলুম।"

তুলসী বলিল, "তারা তোমারও খোঁজ করছে।"

চিন্তিতমুখে রাখাল বলিল, "তা আমি জানি। তুমি এক কাজ করতে পার তুলসী? আমি এই হাতে একরকম যেমন তেমন করে একখানা পত্র লিখে দেই, একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পার, সেখানে তোমারও আশ্রয় জুটতে পারে।"

ব্যগ্র হইয়া তুলসী বলিল, "নিয়ে যেতে পারি বই কি বাবু, কিন্তু তুমি লিখবে কি করে?"

রাখাল বলিল, "তা একরকম করে লিখব এখন, তুমি আমায় দোয়াত কলম আর একখানা কাগজ ওখান হতে দাও।"

বামহাতে অতিকষ্টে রাখাল সামান্য কয়টী কথায় নিজের অবস্থা জানাইয়া সপ্তমীর কাছে দিন কয়েকের মত গোপন আশ্রয় চাহিল।

ইথারের কথা মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু সেই পুণ্যবতীর সংস্পর্শে যাইবার তাহার শক্তি কই? তাহার মনে হইতেছিল, তাহার কলুষিত বাতাস লাগিলে ইথারও কলঙ্কিত হইয়া উঠিবে।

আজ এ অবস্থায় সপ্তমী ছাড়া আশ্রয় দিতে আর কে আছে? সপ্তমী কলঙ্কতিলক পরিয়াছে। কলঙ্কে তাহার আর ভয় নাই। সে বলিয়াছিল—যদি রাখালের কোথাও আশ্রয় না থাকে, সে যেন তাহার কাছে যায়। তুলসীর হাতে পত্রখানা দিয়া সপ্তমীর কাছে পাঠাইয়া দিয়া রাখাল স্পন্দিতবক্ষে তাহার প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া রহিল।

২৮

রাত্রি নয়টার সময় মৈত্রেয়ী যখন একটা লণ্ঠন হাতে একা রাখালের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল তখন রাখাল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

মৈত্রেয়ী লণ্ঠনটা মেঝের নামাইয়া রাখিয়া রাখালের বিছানার ধারে দাঁড়াইল।

হাতটায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, সেখানা আড়ষ্টভাবে বিছানার উপর পড়িয়া আছে। রাখাল এইদিকে মুখ ফিরিয়া শুইয়াছিল, লণ্ঠনের আলোটা সোজাভাবে তাহার মুখের উপর গিয়া পড়িয়াছিল, সেই আলোতে মৈত্রেয়ী দেখিল রাখালকে আর চেনা যায় না। প্রসাদবাবুর বাড়ীতে সে যে রাখালকে দেখিয়াছিল এ যেন সে রাখাল নহে, সে এত শীর্ণ এত মলিন হইয়া গিয়াছে।

বারবার পোড়া চোখে জল আসে, মৈত্রেয়ী বারবার আঁচলে চোখ মুছে।

"রাখাল দা—"

রাখালের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, বিস্ফারিত নেত্রে সে মৈত্রেয়ীর পানে তাকাইল, বাম হাতখানা তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিল—"ইথার, তুমি এসেছ—তুমি এখানে—এই কুলি বস্তিতে—"

মৈত্রেয়ীর মুখখানা মড়ার মতই বিবর্ণ হইয়া গেল, সে এক পা পিছাইয়া গেল, একটু থামিয়া বলিল, "আমি ইথার নই, আমি সপ্তমী।"

"ওঃ, সপ্তমী—"

রাখাল হাতখানা বুকের উপর রাখিয়া হাঁফাইতে লাগিল।

সপ্তমী দ্বেষ ভুলিয়া গেল, অগ্রসর হইয়া আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া

তাহার ললাটে হাত দিল, বুকের উপর হাত দিয়া বিমর্ষভাবে বলিল, "ইস, এখনও তো বেশ জ্বর রয়েছে দেখতে পাচ্ছি।"

রাখাল একটু হাসিবার চেষ্টা করিল মাত্র, সে চেষ্টায় হাসি ফুটিল না, মুখখানাই বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

সপ্তমী নীচে মেঝের উপর নতজানু হইয়া বসিয়া উঁচু হইয়া রাখালের রুক্ষ চুলগুলার মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

রাখাল চোখ মুদিয়া পড়িয়াছিল। মনে হইতেছিল তাহার বাল্যকাল ফিরিয়া আসিয়াছে, সে যেন সে সেই ছোটই রহিয়াছে, বালিকা সপ্তমী তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে।

রাখাল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তাকাইল, "তুমি এত রাত্রে একা এসেছ কেন সপ্তমী, এই চাষা কুলি বস্তিতে আসতে এতটুকু ভয়ও হল না?"

মৈত্রেয়ী একটু হাসিল, বলিল, "আমার আবার ভয়? ভয় ছিল একদিন, কিন্তু এখন আর আমার ভয় নেই রাখালদা।"

রাখাল বলিল, "কাল সকালের দিকে যা হয়, ব্যবস্থা করলেই হতো।"

মৈত্রেয়ী বলিল, "তা বই কি? আজ এই খবরটা শুনে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে রাত্রে কি ঘুমুতে পারতুম? সমস্তরাত্রি ছটফট করে বেড়ানোর চেয়ে এসে পড়াই ভাল। যাই হোক, উঠতে পারবে তো? আমি গাড়ী এনেছি আজই তোমায় নিয়ে যাব, এখানে আর তোমায় রেখে যাব না।"

রাখাল কি একটা কথা বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেল।

মৈত্রেয়ী তুলসীকে ডাকিল, "তা হলে তোমার জিনিসপত্র যা আছে গুছিয়ে নাও, এখনি যেতে হবে, রাতও অনেক হয়ে উঠেছে, আর দেরী করলে চলবে না।"

তুলসী বলিল, "আমার কিছুই নেই দিদিমণি, এই এককাপড়েই যাব।

মৈত্রেয়ী শোফারকে ডাকিল, তাহারই সহায়তায় সে রাখালকে ধরিয়া উঠাইতে গিয়া হাতের উজ্জ্বল আংটিটার পানে তাকাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল, "এ আংটী কোথায় পেলে, খুব দামী আংটী দেখছি।"

রাখাল হাসিল, "ভয় নেই, চুরি এখনও করিনি, একজন দিয়েছে।"

"এত দামী আংটী দিয়েছে? কে—ইথার বোধ হয়?"

তাহার মুখের উপর যে বিদ্রূপ ভাবটা ফুটিয়া উঠিল তাহা লক্ষ্য করিয়া রাখাল অকস্মাৎ শক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, "না, সে সৌভাগ্য আমার হয় নি সপ্তমী। এ আংটী বউরাণী আমায় দিয়েছেন, তাঁর কথা একদিন সব শুনতে পাবে।"

রাখালকে সন্তর্পণে মোটরে বসাইয়া মৈত্রেয়ী তাহার পার্শ্বে বসিল, তুলসী শোফারের পার্শ্বে বসিল।

মৈত্রেয়ীর বাড়ী পৌছাইয়া সমস্ত রাত্রি রাখাল অত্যন্ত যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। হাতটা নাড়াচাড়া পাইয়া বেশী রকম ফুলিয়া উঠিয়াছিল।

প্রভাত হইতেই মৈত্রেয়ী ডাক্তার আনাইল, ডাক্তার দেখিয়া ঔষধ দিয়া গেলেন।

রাখালের জ্বর ছাড়ে নাই, তাহার উপর আবার জ্বর আসিল, সে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যার সময় একবার কিছুক্ষণের জন্য তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, মৈত্রেয়ী তাহার মাথার কাছে বসিয়া মাথায় আইসব্যাগ ধরিয়াছিল।

বাম হাতে তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া ক্ষীণকণ্ঠে রাখাল ডাকিল, "সপ্তমী—"

মৈত্রেয়ী উত্তর দিল—"কেন—?"

রাখাল বলিল, "তোমার অনেক ক্ষতিই করলুম। আমায় যদি না আনতে—"

বাধা দিয়া মৈত্রেয়ী বলিল, "ক্ষতি আমার কিছুই হয় নি, সে জন্যে তোমায় কষ্ট করতে হবে না।"

রাখাল বলিল, "ক্ষতি হয় নি একথা বল না। তুমি থিয়েটারে কাজ কর, কাল যাও নি, আজ যাও নি, এ ক্ষতি তাঁরা সহ্য করবেন না।"

মৈত্রেয়ী বলিল, "আমি থিয়েটারের কাজ ছেড়ে দিয়েছি।"

চমৎকৃত হইয়া গিয়া রাখাল বলিল, "ছেড়ে দিয়েছ—কবে? এই যে সে দিনও তোমার নাম দেখলুম—চন্দ্রশেখরে শৈবলিনীর ভূমিকায় তুমি থিয়েটারে নেমেছ—সে কি তুমি নও?"

মৈত্রেয়ী উত্তর দিল, "হ্যাঁ আমিই। আমি কাল পর্য্যন্ত থিয়েটারের কাজে ছিলুম, আজ জবাব দিয়েছি।"

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, হঠাৎ জবাব দিলে যে?"

মৈত্রেয়ী উদাস ভাবে উত্তর দিল, "খুসি হল,—আর থিয়েটারে কাজ করতে ইচ্ছে হল না, জবাব দিলুম।"

রাখাল খানিক চুপ করিয়া থাকিল, তাহার পর বলিল, "তার পর—দিন চলবে কি করে? এই বাড়ীর ভাড়া, গাড়ী ঝি চাকর—এসব খরচ চালাবে কি করে?"

মৈত্রেয়ী শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল, "যতদিন চলে চলুক তার পর না হয় একখানা ঘর দু পাঁচ টাকায় নিয়ে তাতে গিয়ে থাকব।"

রাখাল হাসিল—"পারবে? এই রাণীর মত দিন কাটিয়ে আবার সেই অবস্থায় গিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারবে?"

মৈত্রেয়ী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "পারব কিনা সে সম্বন্ধে তোমায় এখন কোন

কথা বলতে চাই নে, পারব বলে আশা করছি—তার পর দেখা যাক কি হয়।”

আজই যে ম্যানেজার আসিয়া সে কেন কাজে যায় নাই সে সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন এবং যে লোকটীকে সে কাল অনেক রাত্রে স্বয়ং গিয়া মোটরে করিয়া লইয়া আসিয়াছে তাহার সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন, মৈত্রেয়ী সেই জন্যই নিজেকে নিদারুণ অপমানিতা জ্ঞান করিয়া কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে তাহা সে বলিতে পারিল না,—মুখখানা লাল করিয়া রাখালের মাথায় কেবল আইসব্যাগ ধরিতে লাগিল।

রাখালের অসুখ না কমিয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল, এই মেয়েটীও সংসারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক তুলিয়া দিয়া অনন্যমনে তাহারই শিয়র অধিকার করিয়া বসিল।

সতের দিন পরে জ্বর কমিয়া রাখালের স্বাভাবিক জ্ঞান যে-দিন ফিরিয়া আসিল, সেই দিনই সে বেহারার হাতে দিয়া কালীঘাটে পূজা পাঠাইয়া দিল।

পূজা পাঠাইবার আয়োজনে বেলা নয়টা বাজিয়া গিয়াছিল, তাহার পর সে রাখালের নিকটে আসিয়া বসিল।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, “আজ ও-দিকে কি ব্যাপার চলছে সপ্তমী, পূজো কিসের ?”

আরক্তমুখে মৈত্রেয়ী বলিল, “কালীঘাটে পূজো পাঠিয়ে দিলুম, মানা ছিল কিনা ! সেইজন্যে তোমার ওষুধ পথ্য দিতে দেরী হয়ে গেছে। আগে দুধটুকু খেয়ে নাও, তার পরে ওষুধ দেব এখন।”

বিনা আপত্তিতে দুধ খাইয়া রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, “কিসের মানত, আমার অসুখের জন্যে বোধ হয়।”

মৈত্রেয়ী উত্তর দিল না।

রোগবিবর্ণ মুখের উপর জোর করিয়া এক টুকরা হাসি ফুটাইয়া তুলিয়া রাখাল বলিল, "যত সব ভূতের ব্যাগার, তা ছাড়া আর কিছু নয়। মা কালীই যে আমায় বাঁচিয়েছেন, তার কোন প্রমাণ পেয়েছ সপ্তমী, যার জন্যে তাড়াতাড়ি করে তুমি ষোড়শোপচারে মন্দিরে পূজো পাঠাতে গেলে ?"

মৈত্রেয়ী রাগ করিয়া বলিল, "বোক না, চুপ করে থাক, দেবতার সম্বন্ধে ও-রকম কথা বলতে নেই।"

বলিতে বলিতে সে নিজেই শিহরিয়া উঠিল।

রাখাল বলিল, "তাতে যদি দেবতার রাগ হয় এই পাপে যদি আমায় তিনি সরিয়েই নেন তা হলে আর কেউ না হোক—আমি বেঁচে যাই সপ্তমী, সত্যি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা আমার পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠেছে।"

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিল, "কিসে দুরূহ হল ?"

রাখাল আবার একটু হাসিল, "কিসে ? আবার এই ভাল হলেই পেটের জ্বালায় ঘুরে বেড়াতে হবে তো ? কোনদিন খেতে পাব, কোনদিন হয়তো শুধু জল খেয়েই দিন কাটাতে হবে। অভিশপ্ত জীবন, যে কয়দিন তোমার এখানে আছি সুখে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু এই অভিশপ্তের সঙ্গে মিশে তোমার ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে গেল সপ্তমী।"

মৈত্রেয়ী বলিল, "ওটা তোমার ভুল ধারণা, আমার ভবিষ্যৎ আমি নিজেই ঠিক করে রেখেছি। থিয়েটার কোম্পানী আমায় আবার দু বছরের জন্যে যে আগাম টাকা দিয়েছিলেন তার দেড় বছর কেটে গেছে, আর ছয়টা মাস কোন রকমে ওদের কাজ করে—ঋণ শোধ করে দিয়ে আমি নিজেই সরে যাব ভেবেছিলুম, ভগবানের ইচ্ছায় সেটা আগেই হয়ে গেল। আমি ওদের টাকা হিসেব করে সব মিটিয়ে দিয়ে দিয়েছি। ওদের সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক নেই।"

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "ভবিষ্যতে কি করবে মনে করেছ ?"

মৈত্রেয়ী কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল, একটু পরে বল্লিল, "সং সেজে পয়সা উপায় করব ভেবেছি।"

"সে আর তোমার দ্বারা হচ্ছে না—"

বলিয়া রাখাল হাসিল।

২৯

রাখাল সুস্থ হইয়া উঠিয়া চলিয়া যাইতে চাহিল।

মৈত্রেয়ী বাধা দিল, "আর দুই একদিন থেকে যাও রাখালদা। যাবেই তো,—তোমায় আমি তো এখানে ধরে রাখব না, তবে তোমার শরীরটা সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত, আর—"

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি ?"

মৈত্রেয়ী বলিল, "শুনছি পুলিস তোমার নামে ওয়ারেণ্ট বার করেছে, এখন এই শরীরে জেল খাটতে পারবে না। শরীরটা একটু ভাল হোক—ধরা তো পড়বেই, তখন বরং জেলে যেয়ো—সইতে পারবে।"

সে-দিনে সন্ধ্যার পরে রাখাল দ্বিতলের খোলা ছাদে মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, মৈত্রেয়ী কি কাজে বৈকালেই বাহির হইয়া গিয়াছিল এখনও ফিরে নাই।

আকাশে সে-দিন চাঁদ উঠিয়াছে,—অসংখ্য তারকাও ফুটিয়া উঠিয়াছে, চাঁদের উজ্জলতায় তাহারা মলিন হইয়া গিয়াছে। পাশের বাড়ীতে একটী মেয়ে হার্ম্মোনিয়ামের সুরে সুর মিলাইয়া গাহিতেছে—

আজ শুক্লা একাদশী
হের নিদ্রাহারা শশী,
ওই স্বপন পারাবারের খেয়া
একলা চালায় বসি।

তিথিটা হয় তো শুক্লা একাদশীই হইবে। দূরে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে পোষা একটা কোকিল দুইবার চীৎকার করিয়া উঠিল—"কুহু কুহু—"

নীচে রাজপথ সন্ধ্যার সময় কোলাহলে পূর্ণ, অবিশ্রান্ত মোটর ট্রামের শব্দ,—এ যেন আর ভাল লাগে না।

মাথার মধ্যে সব যেন গোলমাল হইয়া যায়, রাখালের ইচ্ছা করে—আবার সে তাহার শান্ত পল্লীর বুকে ফিরিয়া যায়, সেখানে যে শান্তি, তৃপ্তি আছে তাহা প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করে।

হাঁ, এ-ভাবে অসংযত জীবন যাপন করার চেয়ে সে ভাল, সেখানে মাঠের কাজ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ সেও স্থখের। মানুষ কিসের মোহে ভুলিয়া সহরে থাকে তাহা বুঝা যায় না।

পিছনে পদশব্দ পাইয়া রাখাল মুখ ফিরাইয়া দেখিল মৈত্রেয়ী আসিয়াছে।

মৈত্রেয়ী মাহুর হইতে খানিক দূরে বসিয়া পড়িল, শ্রান্তভাবে বলিল, "আজ বড্ড ঘুরেছি, শরীর যেন ভেঙ্গে পড়ছে। সন্ধ্যাবেলা ওষুধ খেয়েছিলে রাখালদা, ঝি দুধ দিয়েছিল?"

রাখাল বলিল, "হ্যাঁ, ওরা ওদের কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করে গেছে; সে-জন্যে তোমায় উদ্বিগ্ন হতে হবে না সপ্তমী। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমায় মুক্তি দেবে কবে,—এ অধীনতা আর তো আমার ভাল লাগছে না।"

মৈত্রেয়ীর প্রফুল্ল মুখখানা হঠাৎ যেন নিবিয়া গেল, সে বলিল, "তুমি তো মুক্ত হয়েই রয়েছ রাখালদা, আমি তো তোমায় বন্দী করে রাখি নি।"

রাখাল উঠিয়া বসিল, জ্যোৎস্নালোকে দীপ্ত মৈত্রেয়ীর মুখের পানে তাকাইয়া দৃপ্তকণ্ঠে সে বলিল, "না, আমি মুক্ত নই, আমি তোমার কাছে বন্দীর মতই রয়েছি। একবার ঘরে, একবার ছাদে আসা এই-টুকুই মাত্র আমার স্বাধীনতা, আর কতটুকু স্বাধীনতা আমায় দিয়েছ বল

দেখি, জানালার কাছে পর্য্যন্ত যাওয়ার অধিকার আমায় দাও নি, তবু বলছো আমি স্বাধীন ?”

আহত হইয়া মৈত্রেয়ী বলিল, “কিন্তু কেন যে দেই নি সে কথাটা একবার ভেবেছ ? তুমি আসামী—তোমায় ধরবার জন্যে—”

বাধা দিয়া জোরের সঙ্গে রাখাল বলিল, “তা হোক, এ রকম ভাবে লুকিয়ে থাকার চেয়ে সামনে বার হওয়া ভাল। দণ্ড যা পাব তা একবারই পাব, সে এ রকম ঘৃণিতভাবে লুকিয়ে থাকার চেয়ে ভাল।”

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মৈত্রেয়ী ধীরে ধীরে বলিল, “বেশ কথা, এরকম ভাবে থাকতে যদি তুমি ঘৃণা বোধ কর, পুলিসের হাতে ধরা দেওয়ায় যদি গৌরব মনে করে থাকো, তুমি স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পার রাখালদা, আমার তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু এটুকু মনে রেখো, তোমায় দু’চার মাস জেলে দিলেই পুলিসের ক্ষোভ মিটবে না, খুনের অপরাধ তোমার ওপর পড়েছে।”

“খুন—”

রাখাল বিস্ফারিতনেত্রে মৈত্রেয়ীর পানে তাকাইল।

শান্তকণ্ঠে মৈত্রেয়ী বলিল, “হ্যাঁ, খুনের অপরাধ। সেই দাঙ্গাতে একজন লোক মারা গেছে, প্রমাণ হয়ে গেছে তুমিই খুন করেছ, এর জন্যে তোমার নামে ওয়ারেণ্ট ঘুরছে।”

রাখাল উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, “কিন্তু আমি তো খুন করিনি মৈত্রেয়ী, হাতে যদিও লাঠি ছিল—আমি তো লাঠি চালাইনি।”

মলিন হাসিয়া মৈত্রেয়ী বলিল, “সে-কথা তোমার শুনছে কে, সে প্রমাণই বা তোমার দেবে কে বল দেখি ? হাতে যখন লাঠি ছিল, তুমি যখন ওদের কর্ত্তা হয়েছিলে, মানুষ যখন খুন হয়েছে, তখন তোমার কোন কথা টিকবেনা রাখালদা, কেউ তোমার কথা কানে নেবে না।”

সেদিনকার সেই ভীষণ দৃশ্য রাখালের মনে পড়িয়া গেল। তাহার ঠিক সম্মুখে রক্তাক্তকলেবরে একটা লোক পড়িয়া ছটফট করিতেছিল, তাহার মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল। খানিকটা হাত পা নাড়িয়া সে লোকটা নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, সম্ভব তাহার প্রাণ সেই সময়ে দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া থাকিবে।

রাখাল আস্তে আস্তে শুইয়া পড়িল, আর একটীও কথা বলিল না।

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছ রাখালদা ?"

রাখাল একটু হাসিল, বলিল "ভাবছি কপালে কি আছে, দ্বীপান্তর না ফাঁসি। কিন্তু যাই হোক হয়ে যাওয়াই ভাল সপ্তমী, তবু লুকিয়ে থাকা আর ভাল লাগে না।"

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিল, "এখান হতে বার হয়ে কোথায় যেতে চাও ?"

রাখাল উত্তর দিল, "নিজের দেশে গাঁয়ের বুকে ফিরে যাব। এবার হতে চাষার কাজ করব সপ্তমী, আর সহরে আসবনা।"

মৈত্রেয়ী একটা হালকা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সেই ভাল,—সহরের চাকচিক্যে আর ভুলনা। এবার দেশে ফিরে গিয়ে বিয়ে কর, সংসারী হয়ে দিন কাটাও। এ রকম উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করা তো ভাল নয়, যাতে মানুষ হতে পার—"

রাখাল একটু হাসিল, "ঠিক কথা, বিয়ে করে সংসারী হওয়াটাই তোমরা মানুষ হওয়ার চরম সার্থকতা মনে কর, না ? কিন্তু কথাটা অত সহজ নয় সপ্তমী, তা ছাড়া যে আসামী, মাথার 'পরে যার অত বড় দণ্ড ঝুলান রয়েছে তাকে কন্যাদান করবে কে বল দেখি ?"

মৈত্রেয়ী বলিল, "আমি চেষ্টা করছি যাতে এই মিথ্যে দোষটা তোমার ওপর হতে যায়। আজও বিকেলে সেই জন্যেই বার হয়েছিলুম, টাকা

খরচ করলে অনেক সত্যও মিথ্যে হয়ে যায় তা তো জানো, মিথ্যেও বড় বেশীক্ষণ টিকবে না। আমি বড় ডাক্তার এনে তোমায় দেখিয়ে আদালতে জানিয়েছি তোমার অবস্থা বড় খারাপ, এখন তুমি কোর্টে হাজির হতে পারবে না। যে কতদিন সময় পাওয়া গেছে, এর মধ্যে আমি সব ঠিক করে নেব, যাতে তুমি স্বাধীনভাবে বেড়াতে পার, তা করে দেব। জীবনে এ পর্য্যন্ত অনেক পাপ কাজই করেছি, একটা যদি পুণ্য কাজ পেয়ে থাকি, একটা মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারি—তাও কি করবার অধিকার নেই রাখালদা ?"

রাখাল তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, একটা কথাও বলিল না।

চাঁদ ধীরে ধীরে মাথার উপর দিয়া পশ্চিমের দিকে চলিয়া পড়িতে লাগিল। কোকিলটা ডাকিয়া ডাকিয়া এখন নীরব হইয়া গেছে, বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

মৈত্রেয়ী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, বলিল "ওঁরা, আশা দিচ্ছেন আর দিন সাতেকের মধ্যে বিচার শেষ হয়ে যাবে, তুমি স্বাধীনভাবে বেড়াতে পারবে। তার পর সত্যিই দেশে যাবে তো রাখালদা ?"

রাখাল বলিল, "আর কোথায় যাব, জগতে আর কোথাও আমার আশ্রয় নেই।"

মৈত্রেয়ী একটা নিশ্বাস ফেলিল, "আশ্চর্য্য দেখ,—তোমাদের দেশে যাওয়ার পথ আছে তাই তোমরা যেতে চাওনা, কিন্তু আমার উপায় নেই, বলেই দেশে যাওয়ার জন্যে আমার মনটা অস্থির হয়ে ওঠে।"

রাখাল উৎসাহিত হইয়া বলিল, "একবার চলনা কেন ?"

মৈত্রেয়ী হাসিল, সে হাসিতে তাহার বেদনাই ঝরিয়া পড়িল,—"আমি যাব কোথায়, আমার কি সেখানে যাওয়ার মুখ আছে ? না রাখালদা, সেখানে আমার আর যাওয়া হবেনা, অন্তর কেঁদে মরলেও না।"

একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "এই বিলাস-বিভবের মধ্যে থেকে আমার কেবল সেই গাঁয়ের কথাই মনে পড়ে রাখালদা। সেই নদী—সেই নদীর ঘাট। গরমকালে শুকিয়ে গিয়ে শুধু বয়েই যায়, জানায়—সে আছে, আর বর্ষাকালে তার সে কি উদ্দাম তেজ, যেন নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। সেই নদীর ঘাটে গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গে যাওয়া—সাঁতার দেওয়া; তারা আজও তেমনি করে,—ছেলেমেয়েদের অস্থির তাড়নে জল ছিটকে ওঠে, তার ওপরে রোদ পড়ে সাতটা রঙের সৃষ্টি করে। সবই আছে, সবই থাকবে—কেবল আমিই নেই, আর কোনদিন ফিরবনা। যে পথ দিয়ে এসেছি, সেই পথের পায়ের দাগ মুছে দিয়ে এসেছি, আর চিনে ফিরতে পারব না।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া পড়িল—"যাক্ গে, রাত বেশী হয়ে যাচ্ছে, এ শরীরে আর এ রকম আলগা জায়গায় শুয়ে থেকোনা, নীচে চল।"

রাখাল বলিল, "যাচ্ছি, তুমি যাও।

মৈত্রেয়ী আবার সাবধান করিয়া চলিয়া গেল।

৩০

দেশে ফিরিবার জন্ত রাখাল উদ্যোগ করিতেছিল। ইহার মধ্যে দুইদিন সে কোর্টে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার অপরাধ প্রতিপন্ন হয় নাই, বিচারে সে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

মৈত্রেয়ী নিঃশব্দে তাহার বাক্সটা গুছাইয়া দিতেছিল। কাপড় জামা কয়টা সযত্নে ভাঁজ করিয়া গুছাইয়া দিতে দিতে কতবার তাহার চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার ঠিক নাই, পাছে রাখাল দেখিতে পায় এই ভয়ে সে অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করিয়াছিল, কোন ক্রমে চোখের জল সামলাইয়াছিল।

রাখাল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একবার নিমেষের দৃষ্টিপাতে বাক্স বিছানা গুছানর ব্যাপার দেখিয়া লইল, বলিল, "অত জিনিসপত্র দেওয়ার কি দরকার আছে সপ্তমী,—ও-সব দিয়োনা। এই নতুন কাপড় জামাগুলো কিনে এনেছ বুঝি ? নাঃ, এ কি তোমার ভাল হচ্ছে মৈত্রেয়ী, অনর্থক এতগুলো টাকা জলে ফেলে দেওয়া হল না এতে ?"

মৈত্রেয়ী একবার মাত্র চোখ তুলিয়া তাহার পানে তাকাইল মাত্র, নির্ব্বাকে সে আবার বাক্স গুছাইতে লাগিল।

রাখাল বলিল, "কথা যে কানেই তুলছ না সপ্তমী।"

মৈত্রেয়ী উদাসভাবে বলিল, "কি কথা কানে তুলব ?"

রাখাল যেন হতভম্ব হইয়া বলিল,—"বেশ, আমার কথার কি কোন মূল্য নেই ?

"এ-সব বিষয়ে তো নেই বলেই মনে হয়," মৈত্রেয়ী গায়ের কাপড়খানা ভাঁজ করিতে করিতে বলিল, "বেশী বকিয়োনা রাখালদা, যা বোঝনা তা

নিয়ে মাথা গরম করবার দরকার নেই। বিকেলের ট্রেণে যাবে তো,—যাও, এখন খানিকটা শুয়ে নাও গিয়ে।"

রাখাল বলিল, "তুপুরে গেলেই ভাল হয়, রাত্রে গিয়ে কোথায় কি তার ঠিক নেই, কোথায় থাকব, কোথায় খাব—"

মৈত্রেয়ী বলিল, "খাবার ভাবনা নেই, আমি কতকটা খাবার দিয়ে দেব এখন, শোওয়ার জায়গা কারও বাড়ীতে আজ ঠিক করে নিয়ো। তা বলে—সেই কতকালের বন্ধ ঘর, সাপ ব্যাঙ হয়তো বোঝাই হয়ে আছে—কতকাল ঘরে সন্ধ্যে পড়েনি, মানুষের পা পড়েনি, ও-ঘরে যেন আজ ঢুকোনা। যদি আজ ও-ঘরে ঢোক—"

সকৌতুকে হাসিয়া রাখাল বলিল, "তা হলে কি হবে সপ্তমী?"

সপ্তমী মুখখানা লাল করিয়া ফেলিল—বলিল, "তা হলে তোমার ভাল হবেনা বলছি।"

রাখাল বলিল, "কিন্তু তুমি শুনতে পাবে কি করে? জান তো, তোমার আমার মধ্যে কতখানি ব্যবধান?"

সপ্তমী খানিক চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর ধীরকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, তা জানি। এও জানি এ ব্যবধান এ জীবনে কোনদিন ঘুচবে না,—দূর যা তা চিরদিন দূরেই থাকবে। তোমার আমার মধ্যে এতখানি ব্যবধান আছে বলেই তো তোমার কাছ হতে আমিও দূরে থাকতে চাই রাখালদা, না হলে তোমায় কি আমি আজ যেতে দিতুম? আর কেউ না বুঝুক—আমি তো দেখেই বুঝি তোমার শরীর আজও ভাল হয়নি, আজও তুমি জোর পাওনি,—চলতে চলতে আজও তুমি বুক চেপে ধরে দাঁড়াও—"

বাধা দিয়া সজোরে রাখাল বলিয়া উঠিল, "কক্ষণ না, এ তোমার একেবারে মিছে কথা সপ্তমী, আমি বেশ জোর পেয়েছি।"

মৈত্রেয়ী শুষ্ক হাসিল, পরক্ষণেই অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া বলিল,

"হ্যাঁ তা জানি, আমি মিছে কথা বলছি, তুমি সত্যি কথা বলছ। আচ্ছা না হয় মেনেই নিলুম তুমিই সত্যি কথা বলছ—আমি মিছে কথা বলছি, কিন্তু ওই যে পরশুদিন রাত্রে হঠাৎ চমকে উঠে একেবারে—"

রাখাল বলিল "সেটা কি তোমারই অন্যায় নয় সপ্তমী ?"

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিল, "আমার অন্যায় কিসে ?"

রাখাল বলিল, "গভীর রাত্রে চুপি চুপি তুমিই যে আমার মশারী ফেলে দিতে গিয়েছিলে তাইবা আমি কি করে জানব বল ? সেই রাত্রে হঠাৎ যদি লাফিয়েই উঠি, সেটা কিছু দুর্ব্বলতার পরিচায়ক নয়। তুমি তাড়াতাড়ি চোরের মত বাইরে পালালেও আমি কি বুঝতে পারিনি যে তুমিই এসেছিলে ?"

মৈত্রেয়ী যেন বিবর্ণ হইয়া গেল, "আমি,—না আমি তো যাইনি।"

রাখাল হাসিল, তখনই সে হাসি তাহার মুখ হইতে মিলাইয়া গেল, গম্ভীরভাবে সে বলিল "মিথ্যের কারবার অনেকদিন হতেই চালাচ্ছ সপ্তমী, মুখেও বাধেনা, মনেও আঘাত দেয়না। দিত একদিন যেদিন—কিন্তু না, সে কথা আজ থাক, আজ যা চলছে তাই চলুক। না হয় সত্যের খাতিরেই আজ একটা সত্য কথা বললে সপ্তমী, ওতে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবেনা, বরং যাওয়ার বেলা জেনে যেতে পারব—তোমার জীবনে সত্য বলার একটা সময়ও এসেছিল।"

বলিয়া সে সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

সপ্তমী পাঙাস মুখে কতক্ষণ এই নির্লজ্জ লোকটার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "ঢের ঢের নির্লজ্জ মানুষ দেখেছি, তোমার মত নির্লজ্জ বেহায়া আর কাউকেই দেখিনি। যাক গিয়ে ওতে আমার কিছু আসে যায় না। ধরে নাও—আমি তোমার মশারী ফেলে দিয়ে ছিলুম, কিন্তু তাতে কি হল ?"

রাখাল বলিল, "কিছুই হয় নি, হবেও না। তুমি বলছিলে তুমি দাওনি,—তাই জানতে চাইলুম সত্যিই সে তুমি কিনা। যাই হোক—মনে তবু এতটুকু সান্ত্বনা রইল—হাতে হাতে ধরা পড়লে সত্যকে স্বীকার তোমাকেও করতে হয়।"

মৈত্রেয়ীর মুখখানা লাল হইয়া গিয়াছিল, রাখালের কথার কোন জবাব না দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

খানিক বাদে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল রাখাল নিজেই অনাবশ্যক বোধে অনেক জিনিস বাহির করিয়া ফেলিয়া বাক্স গোছান শেষ করিয়াছে।

মৈত্রেয়ীর পানে তাকাইয়া হাসি মুখে সে বলিতে গেল, "এত কাপড় চোপড়—"

মৈত্রেয়ী দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, "থাক, পরবার লোকের অভাব হবে না।"

সব গুলা কুড়াইয়া লইয়া সে বাহির হইয়া গেল, পরক্ষণেই ও ঘরের কপাট সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল, রাখাল বুঝিল সে বড় বেশী রকম চটিয়া গিয়াছে।

একটা কুলি ডাকিয়া আনিয়া তাহার মাথায় বাক্স ও বিছানা চাপাইয়া ভৃত্যের সহিত তাহাকে নীচে পাঠাইয়া দিয়া সে মৈত্রেয়ীর রুদ্ধ দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইল, ডাকিল—"সপ্তমী—"

প্রথম ডাকে উত্তর পাওয়া গেল না।

রাখাল আবার ডাকিল, "আমি এই ট্রেণেই চলে যাচ্ছি সপ্তমী, একবার দেখা করে যেতে চাই। এরপর যে বলবে—লোকটা এমন কৃতঘ্ন যে এত করে খাইয়ে পরিয়ে, রোগের সেবা করে, মোকর্দ্দমার তদ্বির করে বাঁচালে—নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন করলে, সে যাওয়ার সময় একবার একটা

কথা বলে গেল না। অত বড় কলঙ্কের গ্লানি সইতে পারব না, একবার বার হয়ে এস।"

ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া গেল, মৈত্রেয়ী দরজার উপর দাঁড়াইল।

"এই দুপুরের রোদে এই ট্রেণেই যাবে? সেখানকার সেই পথ—রোদে আগুন হয়ে উঠেছে—"

তাহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র।

রাখাল বলিল, "তা হোক গিয়ে, রাতে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে দিনে রোদে পুড়ি সে ভাল; আর পথের ধারে গাছপালা তো আছে, বিশেষ কষ্ট আর এমন কি হবে?"

মৈত্রেয়ী বলিল, "খাবারটা—"

"কিছু দরকার নেই, এখনই গিয়ে পৌছাব তো, সব যোগাড় করে নিতে পারব। পয়সা হাতে থাকলে কিছুরই অপ্রতুল হবে না—নিজে রেঁধে অনেককাল খেতে হয়েছে সে কথা বোধ হয় শুনেছ?"

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু পয়সা?"

রাখাল মাথা নাড়িয়া বলিল, "ওই টুকুরই অনাটন। যাওয়ার ভাড়াটা তোমার দয়ায় হয়েছে, সেখানে গিয়ে উপস্থিত দুচার দিনের খাওয়ার যোগাড়টাও তোমায় করে দিতে হবে সপ্তমী, দুটো টাকা যদি কোন রকমে দাও—"

"দাঁড়াও দিচ্ছি।"

মৈত্রেয়ী সরিয়া গিয়া ড্রয়ার খুলিল, একখানি রুমালে বাঁধিয়া কি কতকগুলি রাখালের হাতে দিল।

রাখাল সন্দিগ্ধ ভাবে প্রশ্ন করিল, "এতে কি, দুটো টাকা খুচরো দিলেই হতো।"

মৈত্রেয়ী শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই, তুমি আমার গুরুঠাকুর নও

যে তোমার জন্যে দফায় দফায় এতগুলো টাকা খরচ করে—বিদায় দেওয়ার বেলায় আবার কতকগুলো টাকা দেব। যা দিলুম—বাড়ীতে গিয়ে দেখো, আমার দিব্যি পথে খুলো না।”

রাখাল রুমালটা পকেটে ফেলিয়া বলিল, “অগত্যা তোমার দিব্যিটা রাখলুম, কেন না তোমারই দান নিচ্ছি, উপায় নেই। তবে আমার কথা রইল—টাকা পেলেই আমি তোমার দেনা আগে শোধ করে দেব। তুমি এখানেই থাকবে তো, এই বাড়ীতে ?”

রুদ্ধ কণ্ঠে মৈত্রেয়ী বলিল, “না, আমি আর দশ বার দিন আছি, তার পর চলে যাব।”

রাখাল বিস্মিত হইয়া বলিল, “মাত্র দশ বার দিন, তার পর কোথায় যাবে ?”

মৈত্রেয়ী মলিন হাসিল, বলিল, “তার কি কিছু ঠিক আছে রাখালদা ?”

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, “তা হলে বল, আবার থিয়েটারে যাচ্ছো, ওদের সঙ্গে আবার দেশ ভ্রমণে যাবে ?”

উদাস ভাবে মৈত্রেয়ী বলিল, “যাই হোক, একটা কিছু। মোট কথা —দশ বার দিন পরে আর এখানে থাকব না।”

রাখাল খানিকটা চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, “ভাল, তোমার ঋণের জন্যে দেখছি আমাদের শান্তি নেই। মাকে দশটাকা ধার দিয়ে এমন আবদ্ধ করে ফেলেছিলে যে মা মরবার সময়েও শান্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছিলেন না। আবার এই যে টাকা দিচ্ছ—”

মৈত্রেয়ী বাধা দিয়া বলিল, “আর কেউ হলে তাকে হয় তো শোধ দেওয়ার কড়ারে দিতুম না, তবে তুমি যখন দিতে চাও—তখন নেব না কেন ? এক কাজ করো টাকাটা অনাথ আশ্রমে দান করো—তাতে বরং শান্তি থাকবে।”

রাখাল বলিল, "সেই ভাল; কোথায় থাকব কোথায় যাব তার ঠিক নেই,—তোমাকেই বা কোথায় খুঁজে বেড়াব, তার চেয়ে সেই ভাল। যাক, তা হলে চললুম সপ্তমী।

"দাঁড়াও, পায়ের ধূলোটা দিয়ে যাও।"

রাখাল পিছনে সরিয়া গিয়া বলিল, "এমন কোন গুণ নেই সপ্তমী যার জন্যে পায়ের ধূলো নিতে হবে।"

মৈত্রেয়ী বলিল, "ব্রাহ্মণের ছেলে তো, গলায় পৈতেটা আছে।"

রাখাল উচ্ছ্বসিত ভাবে হাসিতে লাগিল, "থাকলেই বা, ওটার কোন মূল্য আছে বলে মনে কর? সাদা সুতোটার কোন ক্ষমতা নেই, নেহাৎ রাখতে হয় বলেই রেখেছি—নির্ব্বিষ সাপের খোলস আর কি। ব্রাহ্মণের ছেলের কাজ কোনদিন করিনি, মাকে ছেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা আহ্নিক বিসর্জ্জন দিয়েছি, আজ সে মন্ত্রগুলোও মনে নেই। সেই জন্যই বলছি প্রণাম করতে হয় মানুষ বলে কর, ব্রাহ্মণ বলে কর না, ওতে ব্রাহ্মণকে অনেকটা খাটো করে দেওয়া হবে।"

মৈত্রেয়ীর মুখখানা কঠিন হইয়া গেল, একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া নতজানু হইয়া রাখালের পায়ের ধূলো লইয়া মাথায় দিল, ধীর কণ্ঠে বলিল, "না হয় ধরছি তুমি মানুষ; আর তাই বলেই তোমায় প্রণাম করলুম। তবে তোমায় একটা কথা বলে দেই রাখালদা, সত্যি সৎ হয়ে থাকবার চেষ্টা করো, বিয়ে থাওয়া কোরো, সংসারী হয়ো, আর এ রকম লক্ষ্মীছাড়ার মত টো টো করে ঘুরে বেড়িয়ো না।"

রাখাল খানিক মৈত্রেয়ীর পানে তাকাইয়া রহিল, এবারে আর সে হাসিল না, গম্ভীর ভাবেই বলিল, "আমার মত হতচ্ছাড়ার হাতে মেয়ে দেবে কে সপ্তমী?"

মৈত্রেয়ী বলিল, "বাংলা দেশে মেয়ের অভাব নেই রাখালদা, কত বাপ-

মা উপযুক্ত মেয়ের বিয়ে দিতে না পেরে পাগলের মত হয়ে গেছে, কত কুমারী মেয়ে আত্মহত্যা করে বাপ-মাকে লোকের লাঞ্ছনা গঞ্জনা হতে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছে। এই সব অভাগিনীদের মধ্যে একটীকেও যদি তুমি রক্ষা করতে পার, সে তোমার পক্ষে বড় কম পুণ্যের কাজ হবে না রাখালদা।"

রাখাল মাথা নাড়িয়া বলিল, "ওই কথাটী বলো না সপ্তমী, পুণ্যের কথা আমি মোটে বরদাস্ত করতে পারি না। মানুষের জীবনে পাপই বা কি, পুণ্যই বা কি ; লোকের কাছে যে কাজটা ভাল বলে বোধ হবে সেইটাই হবে পুণ্য, আর আমার নিজের কাছে যেটা ভাল—লোকের বিবেচনায় মন্দ, সেইটার নাম হবে পাপ ? না, এ রকম এক চোখোমি আমার সহ্য হবে না, কাজেই পাপ পুণ্যের কথা এখন থাক। কিন্তু আমার সময় হয়ে এল, কুলিটা ডাকাডাকি করছে, সুতরাং এই পর্য্যন্ত ; আবার যদি কোনদিন থিয়েটারের অভিনেত্রী রূপে অথবা অন্য কোন রূপে তোমায় দেখতে পাই—তখন না হয় কথা হবে।"

সে ফিরিল।

৩১

রাখাল দেশে আসিয়াছে।

রুমালখানা সে পথেই খুলিয়া ফেলিয়া দেখিয়াছিল—মৈত্রেয়ী একশত টাকার করিয়া তিনখানি নোট দিয়াছে। কতক্ষণ সে গুম হইয়া বসিয়াছিল, একবার ভাবিয়াছিল, কোন ষ্টেশনে নামিয়া পরের ট্রেণে আবার কলিকাতায় ফিরিবে এবং মৈত্রেয়ীর টাকা মৈত্রেয়ীকে ফিরাইয়া দিবে। তখনই মনে পড়িল দেশে গিয়া খরচ আছে। আজ কত বৎসর সে দেশে যায় নাই, ঘরখানি আছে কি পড়িয়া গেছে তাই বা কে জানে। যদি পড়িয়া গিয়া থাকে সেখানা আবার তুলিতে হইবে, কিছু জমী জমা লইতে হইবে, নচেৎ সে দেশে খাইবে কি, বিনা কাজে কি করিয়া দিন কাটাইবে?

দেশে ফিরিয়া দেখিল—অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা—যাহারা তাহার মাকে চিনিত, তাহাদের মধ্যে অনেকেই নাই। তাহার বয়সী ছেলেদের মধ্যে অনেকেই জীবিকার্জ্জনের চেষ্টায় বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

ঘরখানি কবে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। রাখাল শ্রীদাম ঘোষের বাড়ীতে গিয়া উঠিল এবং সেখানে থাকিয়া ঘর তুলিয়া লইল, এদিকে কয়েক বিঘা জমী লইল, কয়েকটা বাগানও কিনিয়া ফেলিল।

একদিন সে নিজের নূতন ঘরে আসিয়া উঠিল এবং সংসার পাতাইয়া বসিল।

কাজের নেশায় সে নিজেকে একেবারে ডুবাইয়া দিল। সকাল হইতে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত সে মাঠে কাটাইয়া দেয়, তাহার পর বাড়ী ফিরিয়া

স্নানান্তে অন্নপূর্ণা পিসীর বাড়ীতে গিয়া ভাত খাইয়া আসিয়া খানিক বিশ্রাম করিয়া আবার বাহির হইয়া যায়।

এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী নিজেই রাখালের খাওয়ার ভার লইয়াছিলেন, রাখাল তাঁহাকে এ জন্য মাসে মাসে সাহায্য করিত।

দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসরও আসিয়া গেল। রাখালের উঠানে প্রকাণ্ড ধানের গোলাটা ধানে পূর্ণ হইয়া গেল, ঘরের পিছনে বেড়া ঘেরা প্রকাণ্ড বাগানে নানা তরকারী জন্মিতে লাগিল। পাশের ডোবাটা কাটাইয়া লইয়া রাখাল তাহাতে মাছ ছাড়িয়াছিল, একবৎসরের মধ্যে সেগুলা জলে লাফাইতে লাগিল।

পিসী বলিলেন "এইবার একটী বিয়ে থাওয়া কর বাবা,—এখন তো যা হোক সামলে গেছিস, সংসারও পাতিয়েছিস, একটী বউ আন।"

হাসিয়া রাখাল বলিল, "না পিসীমা, বেশ আছি, বউ এনে আর কি হবে? এমন করেই দিন গুলো কেটে যাক না, দিব্যি নির্ঝঞ্ঝাটে রয়েছি।"

পিসীমা বলিলেন, "তা কি হয় বাবা? আমার একটী বোন-ঝি আছে, বাপ নেই, মা আছে। খেতে পায় না এমনি দুরবস্থা। নিজের অবস্থা তো এই, ওদেরকে কি করে এনে নিজের কাছে রাখি। মেয়েটী মন্দ নয়, বয়েসও হয়েছে, যদি তোর মত পাই—ওদের আসতে লিখে দেই।"

চমকাইয়া উঠিয়া রাখাল বলিল, "ও কাজটি করো না পিসীমা, আসল কথা আমি বিয়ে করব না।"

পিসীমা ইহার পর আর কোন কথা তুলিলেন না, কিন্তু দুইদিন বাদে রাখাল আহার করিতে গিয়া ভাতের থালা হাতে যে কিশোরীটিকে সামনে দেখিতে পাইল তাহাতে বুঝিল পিসীমা মুখে বেশী বাক্যব্যয় করার চেয়ে কাজের যোগ্যতা দেখান কিছু বেশী রকম।

সে বেশ সঙ্কোচহীনভাবেই মেয়েটীকে দেখিয়া লইল। পিসীমা পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে, উষাকে কেমন দেখলি ?"

সে উত্তর দিল, "বেশ, মন্দ নয়।"

পিসীমা বলিলেন, "তোর পছন্দ হয়েছে তো? তা হলে বল—ওর মামাকে খবর দেই, ওর মাকে গিয়ে আনতে। এই সামনের মাসেই তোদের বিয়েটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই।"

রাখাল হাসিল, "ক্ষেপেছ পিসীমা, বিয়ে আমার অদৃষ্টে নেই। এক গণৎকারকে হাত দেখিয়েছিলুম, সে বলেছে—আমার স্ত্রী দুদিন বাঁচবে না, বিয়ের পরই মরে যাবে। জেনে শুনে একটী মেয়েকে আমি এমনি করে খুন করব ?"

পিসীমা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তোর ও-সব কথা রেখে দে রাখাল, যাতে বিয়ে না করতে হয় কেবল তারই চেষ্টা।"

রাখাল বলিল, "না পিসীমা, সত্যি কথাই বলছি, সেই জন্যেই আমি বিয়ে করছি নে, করবও না।"

পিসীমা বলিলেন, "বোকামী করিস নে বাছা, বউ যদি তোর পায়ে মাথা রেখে মরতে পারে সে তার শতজন্মের তপস্যার ফল তা জানিস ? উষা যদি আজ তোর বউ হয়ে কাল মরে, সে কি ওর বড় কম ভাগ্য রে রাখাল ?"

রাখাল হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তোমাদের এ-দেশে অমনি একটা কথা আছে বটে, মেয়েরা ব্রতও করে—ঠিক ওই বরই চায়। সত্যি জানো পিসীমা, বিয়ে আমি করব না, আমার বিয়ে একবার হয়ে গেছে।"

বিস্ময়ে পিসীমা দুই চোখ কপালে তুলিয়া এতখানি হাঁ করিয়া ফেলিলেন, "সে কি রে, কার সঙ্গে বিয়ে হল,—কই, তা তো কিছু জানতে পারি নি। বউ কোথায় রাখাল—তাও তো একদিনও বলিস নি।"

রাখাল বলিল, "সে কি আর কোনদিন জিজ্ঞাসা করেছ পিসীমা, নইলে আপনা হতে বলি কি করে বল দেখি?"

পিসীমা বলিলেন, "বউমা কোথায়, কোথায় বিয়ে করলি?"

রাখাল বলিল, "বউমা যমের বাড়ী গেছে। ওই যে—ওদের সেই সপ্তমী, তাকেই তো আমি বিয়ে করেছিলুম, তা বুঝি জানো না?"

পিসীমা একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন, কতকক্ষণ পরে দম লইয়া বলিলেন, "অমন কথা মুখেও আনিস নে রাখাল। সে হতভাগী তিন কুল খুইয়ে—শুনেছি নাকি কলকাতায় কোন থিয়েটারে কাজ করছে, আমাদের গণেশ বছর তিনেক আগে তাকে দেখে এসেছে। ছিঃ, তার নাম নাকি মুখেও আনে। যার স্বোয়ামীর কূলে এখনও নাম করবার মত সব আছে, সে কিনা আজ থিয়েটারে গিয়ে মুখ হাসাচ্ছে।"

রাখাল গম্ভীর মুখে বলিল, "তা সে যাই বল এ কথা মনে করো পিসীমা—একদিন ওর সঙ্গেই আমার বিয়ের ঠিক হয়েছিল; আর শুধু এ-কথাই বা বলি কেন—খেলাঘরে খেলতে গেলে ও আমার বউ ছাড়া আর কারও বউ হতো না।"

দারুণ বিরক্তির সহিত পিসীমা বলিয়া উঠিলেন, "আর যা তা বলিসনে রাখাল, তোর কথা শুনলে আমার পা হতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে যায়। আসল কথা বল যে উষাকে তোর পছন্দ হয় নি, তাই ওকে বিয়ে করবি নে। কত আশা করে ওকে নিয়ে এলুম, ওর মাও কত আশা করে মেয়ে পাঠিয়ে দিলে—যদি মেয়েটার কোন সদ্গতি হয়।"

রাখাল একটু ভাবিয়া বলিল, "ওঃ কেবল মাত্র সদ্গতির জন্যে? আচ্ছা, না হয় বিয়ের পাত্র আমিই ঠিক করে আনব, খরচও যা লাগে তা আমিই দেব, তা হলে তো কোনও আপত্তি হবে না পিসীমা?"

পিসীমার সমস্ত অন্তর আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল, গদগদ কণ্ঠে তিনি

বলিলেন, "আপত্তি কিসের বাবা, কোনক্রমে মেয়েটার একটা গতি মুক্তি হওয়াই কথা, তা যেমন করেই হোক যদি হয়ে যায় তার ওপর কথা বলব কেন। তবে তোর সঙ্গে হলে যেমনটি হতো রাখাল—"

রাখাল বাধা দিয়া বলিল, "সে সব কথা ছেড়ে দাও পিসীমা,—আবার ও-কথা তুলছ কেন? যা হবার নয়—তোমরা তাই করবার চেষ্টা কর—ওই তোমাদের দোষ।"

রাখাল পূর্ণ উৎসাহে পাত্র খুঁজতে আরম্ভ করিল।

পাত্র জুটিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। নিজের গোলার অধিকাংশ ধান বিক্রয় করিয়া ঊষার বিবাহ দিয়া রাখাল একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

৩২

সেদিন রাণাঘাট হইতে ফিঁরিতে ট্রেণে উঠিবার সময় হঠাৎ যাহার সহিত রাখালের দেখা হইয়া গেল, তাহাকে রাখাল চিনিতে পারিল না কিন্তু সে তাহাকে চিনিল।—

"রাখাল—ওহে, শোন শোন—"

রাখাল চাহিয়া দেখিল ফার্ষ্টক্লাস কামরার সামনে দাঁড়াইয়া একটী ভদ্রলোক, তাহাকেই ডাকিতেছে। মুখখানা দেখিয়া পরিচিত বলিয়া মনে হইল, কিন্তু কোথায় যে তাহাকে দেখিয়াছে তাহা রাখালের মনে পড়িল না। জীবনে এই বত্রিশ বৎসরের মধ্যে অনেক রকম লোকের সহিত সে মিশিয়াছে এ লোকটী কোন সময়ে কখন তাহার সহিত পরিচিত হইয়া গিয়াছে তাহা মনে পড়ে না।

"বেশ যা হোক, আমায় চিনতে পারছ না,—আমি দেবানন্দ—একসঙ্গে স্কুলে পড়তুম—মনে পড়ে—?"

রাখাল আশ্চর্য্য হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল। হাঁ, সেই বটে—ওই যে কানের কাছে সেই জড়ুলটী এখনও বর্ত্তমান।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার। যখন সে হাতীবাগানের বাসায় ছিল তখন যে দেবানন্দকে দেখিয়াছিল তখনকার সেই মূর্ত্তির সহিত ইহার আকাশ পাতাল পার্থক্য। দেবানন্দের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সকলই সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইল, তাহার হীরকাঙ্গুরীয় দুটিও বাদ গেল না।

দেবানন্দ তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, "অনেক কাল পরে দেখা,

বছর বার তের হবে, না ? এ রকম চেহারা দেখছি যে, চাষার মত হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলো, মোটা খাদি পরা—"

রাখাল একটু হাসিল, বলিল, "অদৃষ্ট আর কাকে বলে ? ভগবান এমন কোন সোজা পথ দেখিয়ে দেন নি যে পথ দিয়ে গিয়ে লাখটাকা পেতে পারি।"

দেবানন্দ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠাইয়া লইল, বলিল, "ট্রেণ ছাড়তে এখনও বহুত দেরী, ততক্ষণ বসে গল্প করা যাক এসো। যাচ্ছো কোথায়—কোন ট্রেণে উঠবে ?"

রাখাল বলিল, "যাব বনগ্রাম লাইনে, চাঁদপাড়ায় নামব। দেশেই আছি, আর কোথায় যাব বল ?"

দেবানন্দ বলিল, "কাজ কর্ম্ম কি ?"

রাখাল গম্ভীর মুখে বলিল, "চাষার কাজ, অর্থাৎ এ-দিক আর ও-দিক। কুলির কাজ করতুম, এসেছি চাষার কাজে, ভাল এইটুকু যে স্বাধীনতা আছে, কথায় কথায় চাকরী যাওয়ার ভয় নেই।"

দেবানন্দ কি ভাবিতেছিল, বলিল, "ওঃ, অতটা শক্তি এই সব কাজেই অপব্যয় করে ফেললে হে, যথার্থভাবে কাজে লাগালে যে মানুষ হয়ে যেতে, একটা নাম রেখে যেতে পারতে।"

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "কাজের ক্ষেত্র কোথায় আর কি কাজই বা আমি করব ?"

দেবানন্দ হাসিল, বলিল, "এইটুকুই ভারি আশ্চর্য্যের কথা যে কাজের ক্ষেত্র পেলেনা, কাজও পেলে না। মূর্খের মত কথা বল না রাখাল, ইচ্ছা থাকলে খুঁজতে হয় না কাজ আপনি আসে।"

রাখাল মাথা নাড়িল, "এটা একটা কথার কথা মাত্র। জগতে কে ইচ্ছা করে গরীব হয়ে থাকবে, খেটে খাবে ? জগতে এমন কোন মানুষ

নেই যে ইচ্ছা করে না সে বড়লোক হয়, আরামে স্ফুর্ত্তিতে দিন কাটায়? কিন্তু সত্যি করে বল দেখি দেবানন্দ, কয়জনের আশা পূর্ণ হয়, কয়জন বড়লোক হতে পারে?"

দেবানন্দ জোর করিয়া বলিল, "ওইটাই মানুষের ভুল। একজন বড়লোকের পানে তাকিয়ে দশজন দরিদ্র নিঃশ্বাস ফেলে ভাবে—গতজন্মের সুকৃতির ফলে ধনী ধনীর ঘরে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু তাই কি সত্যি? পরজন্ম বা গতজন্ম বলে কিছু নেই, যা আছে তা এই জন্ম, তাই এই জন্মটাকেই নিঃশেষ করে ভোগ করে যাও। একজন ধনী হয়েছে—তুমি কেন নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবে?"

পৃথিবী উপভোগের বস্তু, এর যা কিছু উপভোগ করবার জন্যেই আমরা জন্মেছি, যা আছে সব নেব, জোর করে—ছলনা করে—বঞ্চনা করে নেবই।

একটু থামিয়া সে বলিল, "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা তা জান তো। মনে করো না কেউ তোমার হাতে এনে কিছু দিয়ে যাবে, অদৃষ্ট নামে কিছু নেই—কাজেই ওর পরে নির্ভর করে থাকতে গেলেও চলবে না। কারও সৌভাগ্যের পানে তাকিয়ে তুমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলবে কেন, জোর করে কেড়ে নাও, দখল কর, সৌভাগ্য তোমারই হবে।"

রাখাল শিহরিয়া উঠিল, দেবানন্দের মনের গতি দেখিয়া সে চমৎকৃত হইল বড় কম নয়।

শুষ্ক হাসি হাসিয়া সে বলিল, "সে একদিন ছিল বটে যে দিন—মাইট ইজ রাইট এই কথাটা খাটত, কিন্তু আজও কি তা খেটে যাবে বলে মনে কর দেবানন্দ, এটা যে ইংরেজ রাজত্ব—আধুনিক যুগ, সেটা তো মনে রাখতে হবে।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেবানন্দ উত্তর দিল—"সে কথা ভুলব না, মনে

রাখতেই হবে, আজ আমি স্বদেশী দলের প্রধান একজন পাণ্ডা, পোষাকে সব খদ্দর দেখেই বুঝতে পারছ। তুমি আমার অকৃত্রিম বন্ধু, জানি কোন কথা ব্যক্ত তোমার দ্বারা হবে না। জানো না, এই অহিংস পোষাকের অন্তরালে কে লুকিয়ে রয়েছে। জন সাধারণ আমায় মানে, চেনে, আমি ও নিজের কাজ করে যাই। আজ আমার অভাব নেই, দুঃখ নেই, ক্লেশ নেই, আমি মানুষ, দেশের একজন নেতা।"

রাখাল ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু তুমি কি সত্যিই দেশকে মা বলে মানো—মা বলে জানো দেবানন্দ ?"

দেবানন্দ বলিল, "তা না মানতে পারি, না জানতে পারি, আর তা জানারও তো আমার দরকার নেই।"

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "কেন দরকার নেই ?"

দেবানন্দ বলিল, "আজ সে কথা থাক, আর একদিন বলব আমি তোমায় আমার পাশে পেতে চাই রাখাল।—সত্যি—আমি তোমার অনেক খোঁজ করেছি, কিন্তু আজ বার তের বছরের মধ্যে তোমার কোন খোঁজ খবর পাইনি ; আজ যখন হঠাৎ অচিন্তিতভাবে তোমায় পেয়েছি তখন সহজে তোমায় ছাড়ব না, আমার কাজে তোমায় আসতেই হবে। এই যে জীবিকার্জ্জনের জন্যে পরের দাসত্ব করা, মাঠে ঘুরে চাষার কাজ করা—এ তোমায় ছেড়ে দিতে হবে। আমার সাহায্যকারী রূপে দাঁড়াও দেখতে পাবে মান অর্থ সব তোমার হাতের মধ্যে এসে পড়বে, তোমার একটী আদেশ পালন করতে হাজার হাজার লোক ছুটবে।

রাখাল বলিতে গেল—"কিন্তু এ-রকম ভাবে লোককে প্রবঞ্চনা করা—"

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল, "তা যদি বল দেখিয়ে দাও—জগতে সাধু কে, কে কাউকে প্রবঞ্চনা করছে না ? পাপ পুণ্য, সত্যাসত্য সব ভুল যাও রাখাল, জেনো—জগতে একমাত্র অর্থই সত্য, আর কিছু নয়।"

ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা দিল, রাখাল নামিয়া পড়িল।

দেবানন্দ ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যাবে তো ?"

রাখাল চিন্তাপূর্ণ মুখে বলিল, "দেখি, ছুদিন ভাবি।"

দেবানন্দ নিজের ঠিকানা একখানা কাগজে লিখিয়া রাখালের হাতে দিল, বলিল, "ছুদিন মাত্র আমি কলকাতায় থাকব—তারপর দিল্লী চলে যাব। তুমি আজ কাল ছুদিন ভেবে দেখো, যদি ইচ্ছা হয় তবে সোজা কলকাতায় চলে যেয়ো, আমার সঙ্গে দেখা করো।"

কলিকাতাগামী ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

রাখাল বনগ্রামগামী ট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া বসিল।

সত্য—দেবানন্দই সুখী সে সুখ পাইয়াছে, শান্তি পাইয়াছে, নাম পাইয়াছে, অভাব তাহার নাই।

রাখাল জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—সেও ফাষ্টক্লাস কামরায় যাতায়াত করে, দেশব্যাপী তাহার নাম, অজস্র অর্থ তাহার হাতে।

ঝণাৎ করিয়া ট্রেণ থামিয়া গেল, বনগ্রাম আসিয়াছে, রাখাল নামিয়া পড়িল।

নিজের পানে তাকাইয়া যথার্থ-ই সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, সত্যই এ তো চাষার বেশ।

মনে পড়িল একদিনকার কথা, তখন তাহার অন্তরে ছিল উচ্চ আশা, যে কোন রকমেই হোক সে বড় হইবে এই ছিল তাহার পণ। কৈশোরে দেবানন্দের সহিত মিশিয়া স্কুল কামাই করিয়া দত্তদের শিবমন্দিরে শুইয়া পড়িয়া সে এই কথাই শুনিত, দেবানন্দ বলিত, শুনিতে শুনিতে তাহার ছুইটা চোখ উজ্জল হইয়া উঠিত, সেও দৃঢ়পণ করিত যেমন করিয়াই হোক—সে বড় হইবে সে মানুষ হইবে।

কোথায় গেল তাহার সে পণ, কোথায় গেল তাহার সে তেজ শক্তি

উৎসাহ? পল্লীগ্রামের শান্তজীবন উপভোগ করিবার জন্য তো তাহার জন্ম হয় নাই; অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য সে মনের একটী অভিলাষপূর্ণ করিতে পারে না, এই কি তাহার জীবনের উচ্চ লক্ষ্য।

মানুষ হইয়া জন্মায় সকলেই, কিন্তু হৃদয়ে অতৃপ্ত বাসনা রাখিয়া মরিবে কেন? উপায় তো আছে, পথও তো আছে।

অন্তরে তাহার যে আগুন প্রচ্ছন্ন ছিল, দেবানন্দ সে আগুন খোঁচা দিয়া জ্বালাইয়া দিয়া গেল, শান্তি সুখ রাখালের কাছে হাস্যাস্পদ মনে হইল; যেমন করিয়াই হোক—তাহাকে ধনী হইতে হইবে—মানুষের মধ্যে নিজের আসন গড়িয়া লইতেই হইবে।

ধীর পদক্ষেপে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের চিত্র মনের মধ্যে আঁকিতে আঁকিতে রাখাল গ্রাম্যপথে চলিল।

৩৩

একদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়া রাখাল আবার দেশে ফিরিল।

সে জমীগুলি বিক্রয়ের উদ্যোগ করিতেছে শুনিয়া পিসীমা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রাখালের কাছে থাকায় তাঁহার জীবিকার জন্য ভাবনা ছিলনা, বৃদ্ধ বয়সে দুইটা ভাত খাইয়া তিনি বাঁচিতেছিলেন। সংসারে তাঁহার কেহই ছিলনা, স্বামী কিছুই রাখিয়া যান নাই যাহাতে একবেলা ভাতটাও জুটে, কাজেই লোকের বাড়ী যাচ্ঞা করা, শিষ্যবাড়ী যাতায়াত করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। এই তিন বৎসর নিশ্চিন্তভাবে তিনি রাখালের সংসারে বাস করিতেছিলেন, তাঁহার ঘরখানা গত বর্ষায় পড়িয়া গিয়াছে, রাখাল সেখানি আবার তুলিয়া দিবার মতলব করিতেছিল।

রাখাল তাঁহার কাছে কিছুই বলে নাই। নদীর ঘাটে গিয়া পিসীমা শুনিতে পাইলেন রাখাল জমী ঘর বাগান সব বিক্রয় করিয়া দিয়া চিরকালের মত চলিয়া যাইবে—আর আসিবে না।

ক্যাবলার মা সমস্ত সংবাদ রাখে, সে জানাইল রাখাল আজ সকালেই ক্যাবলার বাবার কাছে জমী বিক্রয় করিবার জন্য আসিয়াছিল।

পিসীমা সবিস্ময়ে বলিলেন, "কই, ওতো আমায় একটা কথা বলেনি?"

ক্যাবলার মা বলিল, "তা বলবে আর দুচারদিন পরে—যখন সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে তখন। তুমি কি মনে করেছ পিসীঠাকরুণ, দা ঠাকুর ঘরে থাকবে? ছোটবেলা থেকে যারা বাইরে বাইরে ঘোরে, তারা আর কতদিন বাড়ীতে থাকবে? এই যা বছর তিনেক রইল—এই ঢের।" বাড়ী আসিয়াই পিসীমা রাখালকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁরে, তুই নাকি এবার সব বিক্রী করে চলে যাচ্ছিস রাখলা?"

রাখাল নির্ব্বিকারভাবে উত্তর দিল, "দেশ আর ভাল লাগছেনা পিসীমা ? একটা বড় কাজ পেয়েছি, সেই জন্যেই যাচ্ছি।"

পিসীমা বলিলেন, "কত করে মাইনে দেবে ?"

রাখাল উত্তর দিল, "তা ঢের, শ দুই তিন হবে ?"

পিসীমা অত শত বুঝেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কয় কুড়ি টাকা ?"

রাখাল হাসিল, বলিল দশ কি পনের কুড়ি।"

চমৎকৃত হইয়া পিসীমা বলিলেন, "তবে তো বেশ ভাল। কোথায় কাজ করতে হবে—কলকাতায় ?"

রাখাল বলিল, "না, অনেকদূরে—সেই যেখানে মথুরা বৃন্দাবন সেই দিকে।"

লুব্ধা পিসীমা বলিলেন, "আমায় একবার নিয়ে চলনা বাবা, তোর দৌলতে যদি মথুরা বৃন্দাবনটা দেখে নিতে পারি। আর কত দিনইবা বাঁচব, তিনকুড়ি তিনবছর বয়েস হল আমার, বেশীদিন আর টেঁকবনা, এখন যদি কোন রকমে তোর দয়ায় দেখতে শুনতে পাই।

রাখাল বলিল, "এবারটা থাক, প্রথম এখন যাচ্ছি কোথায় থাকব কি করব তার কিছু ঠিক নেই, আসছে বারে এসে বরং তোমায় নিয়ে যাব।"

হতাশভাবে পিসীমা বলিলেন, "হ্যাঁ, তুইও আর আসছিস আমিও গিয়েছি ; ও-সব তোর কেবল আমায় ভুলানোর কথা। এইতো শুনছি বাড়ী ঘর জমীজমা সব বিক্রী করে যাচ্ছিস।"

রাখাল বলিল, "না, বাড়ী আর বিক্রী করবনা পিসীমা, তবে জমীজমাগুলো বিক্রী করব বটে, নইলে ও-সব দেখাশোনা করবে আর কে, সকলেই ফাঁকি দেবে বইতো নয়। বাড়ী ঘর তোমার নামে দিয়ে যাব, তোমার অবর্ত্তমানে উষা পাবে, কি বল।"

অন্তরে অন্তরে খুসি হইয়া উঠিলেও পিসীমা তাহা বাহিরে প্রকাশ

করিলেন না ; বলিলেন, "তোর যা খুসি তাই কর বাবা, তার ওপর আমি আর কি বলব। আমায় যেন একেবারে মারিসনে এইটুকুই আমার কথা।"

রাখাল আর বেশীদিন দেরী করিল না, তাহার অন্তর এখন ঘর ছাড়িয়া বাহিরের দিকে ছুটিয়াছে, শান্তির চেয়ে বিপদই তাহার কাছে বেশী ভাল বোধ হইতেছে, তাই সে এদিককার ব্যাপার তাড়াতাড়ি করিয়া মিটাইয়া লইল।

একদিন সব গুছাইয়া বাড়ীঘর পিসীমার নামে লেখাপড়া করিয়া পাঁচশত টাকা হাতে লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

প্রথমেই সে কলিকাতায় আসিল, সংবাদ লইয়া জানিল দেবানন্দ চলিয়া গিয়াছে।

হাতে টাকা আছে, মৈত্রেয়ীর যদি খোঁজ পাওয়া যাইত সে এই টাকা দিয়া তাহার দেনা শোধ দিতে পারিত।

মৈত্রেয়ী যে বাসায় থাকিত, দীর্ঘ কয়েক বৎসর পরে সে সেই বাড়ীর দরজায় গিয়া দাঁড়াইল সংবাদ লইয়া জানিল তাহারা কেহ মৈত্রেয়ীর সংবাদ রাখে না।

মৈত্রেয়ী পূর্ব্বে যে থিয়েটারে কাজ করিত, রাখাল একদিন তাহার ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিল।

ম্যানেজার জানাইলেন মৈত্রেয়ী তাঁহাদের থিয়েটারে আর আসে নাই। সে খুব ভাল অ্যাক্ট্রেস ছিল, তাহার জন্যই তাঁহাদের থিয়েটার এতটা নাম পাইয়াছিল ; তাঁহারা সেইজন্যই তাহাকে আরও বেশী বেতন দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু সে আর আসিতে সম্মত হয় নাই। সে নাকি সমস্ত জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা কোন বিশ্বাসী লোকের নিকট রাখিয়াছে,—ইহা হইতে মাসে মাসে তাহাকে টাকা পাঠানো হয়, কিন্তু

সে যে কোথায় গিয়াছে—কোথায় আছে সে সংবাদ সেই বিশ্বাসী লোকটী ছাড়া আর কেহই জানে না।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রাখাল বাহির হইল। মনে হইল মৈত্রেয়ীর মত মহাপাপিষ্ঠা একটা পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে, কিন্তু সে আজও তাহার জীবনে চলার পথ খুঁজিয়া পায় নাই।

বহুদিন পরে ইথারের মুখখানা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। আজ সে কোন পথে যাত্রা করিতেছে তাহা সে নিজেই জানেনা, কে জানে আর সে ফিরিবে কিনা, শেষ একবার ইথারের সহিত দেখা করিবার বাসনা তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল।

কিন্তু কোথায় ইথার, তাহার সন্ধান সে পাইবে কেমন করিয়া? একবার সে খিদিরপুরের দিকে গেল, সেখানে খোঁজ লইয়া জানিল মিঃ মুখার্জ্জি বহুদিন আগে চলিয়া গিয়াছেন, ইথার কোথায় গিয়াছে কে জানে।

শ্রান্তভাবে সে হাওড়ায় ফিরিয়া আসিল,।

একখানি টিকেট কাটিয়া সে যখন চলিতেছিল তখন পাশেই একদল যাত্রী দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

ওই যে স্থূলাঙ্গিনী বিধবা স্ত্রীলোকটী আগে যাইতেছেন, উনিই না তাঁহার মামীমা? তাঁহার পিছনে যে চশমাধারী যুবকটী আর কয়েকটী মেয়েকে লইয়া চলিয়াছে সে নরেশ নয়?

একবার মনে হইল দরকার নাই বাধা দিয়া, উঁহারা যেমন যাইতেছেন তেমনই চলিয়া যান, কিন্তু না—যদি ইথারের সন্ধান ইঁহাদের কাছে পাওয়া যায়।

সে অগ্রসর হইয়া বিধবার সম্মুখে দাঁড়াইল, নরেশ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"রাখাল—"

"সে কি,—রাখাল—" মামীমা সবিস্ময়ে পিছনে এক পা সরিয়া গেলেন। রাখাল মৃদু হাসিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল—"হ্যা মামী, আমিই রাখাল।"

"ওমা, তোকে দেখে যে আর চেনা যাচ্ছেনা রাখাল। সাহেবের পোষাক পরেছিস্ আমি ঠিক ভেবেছি কোন সাহেব টাহেব হবে, ভাগ্যে নরু তোর পরিচয়টা দিলে। ও যদি না থাকত, আর কেউ সঙ্গে থাকত—আর তুই যদি হাজার বারও বলতিস আমি রাখাল—তাও আমি কক্ষনো বিশ্বাস করতুম না।"

মামীমা অগ্রসর হইয়া আসিয়া হাতখানা তাহার মাথায় দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার হাত সুদীর্ঘদেহ রাখালের স্কন্ধ পর্য্যন্ত পৌছিল মাত্র।

রাখাল একটু হাসিল মাত্র, জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাওয়া হচ্ছে মামীমা? অনেককাল খোঁজ খবর পাইনি, ভেবেছিলুম—একবার আপনাদের ওখানে যাব, কিন্তু নানা গোলমালে তা আর হয়ে ওঠে নি। সব ভাল তো?"

সরোদনে মামীমা বলিলেন, "আর সব ভাল। তোর মামা আজ বছর আট নয় হল মারা গেছেন, তারপর যে কি করে দিন যাচ্ছে, তা একমাত্র ভগবান বই আর কেউ জানে না। নরুর তো ওই স্বাস্থ্য, মেরে কেটে কোনরকমে বি-এ টা পাস করলে—সে পাস করাই সার তিরিশ পঁয়ত্রিশ টাকার বেশী মাইনে আর হলনা।"

রাখাল বলিল, "আজকালকার দিনই যে এমনি পড়েছে মামীমা, বি-এ, এম-এ, তে চাকরীর বাজার ছেয়ে গেছে, বেশী টাকা মাইনে দিয়ে কতজন লোক সরকার নিতে পারবে?"

মামীমা বলিলেন, "তারপর কাজের জায়গাও বাংলা দেশে নয়, সেই

বিলাসপুরে, এবারও সকলকেই নিয়ে যাচ্ছে, দুটো বাসার খরচ চালান তো বড় মুখের কথা নয়। বাড়ীটা তিরিশ টাকায় ভাড়া দেওয়া হল— আমার বোনই বাড়ীতে রইল। শুনেছ তো—তারও সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।”

রাখাল মাথা কাত করিয়া জানাইল, শুনিয়াছে।

মামীমা বলিলেন, “তার সেই ননদটা—সেই ইথার—আজ চার বছর হল বিলেতে চলে গেছে, আজও ফেরেনি। হাতে করে আমার বোন তাকে মানুষ করেছিল বাছা, অমন করে কেউ বোধহয় নিজের সন্তানকে মানুষ করে না, সেই ননদ কিনা তার একটা কথা রাখলে না। ইথার যদি আমার বোনের কথামত বিয়ে করত, তবে আজ তার বাড়ীঘর যেত না, সব যেমন তেমনি বজায় থাকত। সকলে মিলে না হোক লক্ষবার তার হাতে ধরেছি—মেয়ের কি গোঁ, কিছুতেই বিয়ে করলে না। এখানে থাকলে পাছে লোকের কথা শুনতে হয় সেই ভয়ে বিলেতে পালাল।”

ইথারের সন্ধান আপনিই মিলিয়া গেল, সে আজও বিবাহ করে নাই, পাছে বিবাহ করিতে হয় এই ভয়ে বিলাতে পলাইয়াছে।

একটা হালকা নিশ্বাস ফেলিয়া রাখাল বলিল, “ওখানেই বোধ হয় তিনি থাকবেন, আর এ-দেশে ফিরবেন না ?”

বিকৃতমুখে মামীমা বলিলেন, “সেই জানে, তার খবর আর কে রাখে। মরুক গে, তুই এখন কি করছিস, কোথায় যাচ্ছিস ?”

রাখাল হাসিল, নরেশের পানে তাকাইয়া বলিল, “আমার কাজ কুলির সর্দ্দারী—আর কি হতে পারে ? লেখাপড়া এমন কিছু শিখিনি যাতে ভদ্রলোকের মত কাজ পাব—কি বল নরু ?”

নরেশ আহত হইল—অনেকদিন আগেকার একটী দিনের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল—যেদিন সে ইথারের সামনে রাখালকে অতি

জঘন্য ভাবে গালাগালি করিয়াছিল। আজ সে সেইদিনের কথা মনে করিয়া একটী কথাও বলিতে পারিল না।

মামীমা রাখালের কথা বিশ্বাস করিলেন না। না করিবারই কথা। রাখাল নগদ পাঁচশত টাকা হাতে পাইয়া আগেই একটা ইউরোপীয়ান স্যুট কিনিয়া ফেলিয়াছিল, কেননা এ বেশে নাকি যথেষ্ট খাতির পাওয়া যায়; একখানা ফাষ্ট ক্লাসের টিকেটও সে কিনিয়াছিল, একবার ধনী হওয়ার স্থখটা সে লাভ করিতে চায়।

ট্রেণের ঘণ্টা পড়িতে নরেশ ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "আর কথা নয় মা, ট্রেণ ছেড়ে দেবে। রাখাল, যদি কোনদিন স্থবিধা পাও—দয়া করে একবার আমার বাড়ীতে যেয়ো, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। চিরকাল তোমার সঙ্গে যে খারাপ ব্যবহার করেছি, আজ তার জন্যে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে যাচ্ছি।"

রাখাল সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া বলিল, "সাময়িকভাবে সে-সব অশিষ্ট আচরণ অন্তরে আঘাত করলেও আজ সে বেদনা আমার বুকে নেই ভাই।"

নরেশ হঠাৎ তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, "তবু বলে যাও—ক্ষমা করেছ, আমার বাসায় যাবে?"

হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া রাখাল বলিল, "ক্ষমা করেছি। জীবনে যদি কোনদিন স্থযোগ আসে তোমার বাড়ীতে যাব।"

৩৪

দিনগুলা কাটিতেছে বেশ।

নিত্য নূতন উন্মাদনা, বিলাসিতার চূড়ান্ত, মানুষকে নিত্য প্রবঞ্চনা। তা হোক,—রাখাল আজ অতীতের সহিত বর্ত্তমানকে মিলাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া ভাবে—এতদিন সে কি ঘুমাইয়াছিল ?

জীবনটা তো ক্ষণস্থায়ী কিন্তু এই স্বল্প দিনের মধ্যেই ইহাকে সার্থক করিয়া লইতে হইবে তো।

তবু মাঝে মাঝে সে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত, তাহার উদ্যত হস্ত থামিয়া পড়িত, বিবেক তবু কোন ফাঁকে তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতে চাহিত।

জীবনাবধি সে অনেক পাপ কাজই করিয়াছে, নিজেকে পাপের সাগরে ডুবাইয়া দিয়াছে, তবু এমন কাজ সে কোনদিনই করে নাই বলিয়া মনে হয়। সে পাপে ডুবিয়াছে নিজে অন্যকে নষ্ট করে নাই,—নিজেকে নিজে সে ধ্বংস করিয়াছে, পরকে ধ্বংস করে নাই, সেই ছিল তাহার একমাত্র শান্তি।

সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া এই দলের লোক ছিল, ইহারা দেশের কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিত, ইহার জন্য খুন ডাকাতি সবই তাহারা করিত। দেবানন্দ ছিল এই দলের কর্ত্তা, লোকে তাহাকে সম্মান দিত, শ্রদ্ধা দিত। বাহিরে সে নিতান্ত সৎলোক, তাহার দলের অনুরক্ত দেশসেবকেরা পর্য্যন্ত তাহার পরিচয় পায় নাই। ত্যাগের ধর্ম্মে নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া সে ভিতরে সম্পূর্ণ ভোগ করিয়া যাইত।

রাখাল এক একসময় স্তম্ভিত হইয়া যাইত, দেবানন্দের চাতুরী সহজে সেও ধরিতে পারিত না।

সেদিনে সমিতির অধিবেশনের পর সভ্যেরা যে যাহার নিজের কাজে চলিয়া গিয়াছিল। রাখালের উপরও কাজের ভার ছিল, কিন্তু সে নড়িল না, যেমনভাবে বসিয়াছিল তেমনই বসিয়া রহিল।

সকলকে কাজে পাঠাইয়া দেবানন্দ ফিরিয়া দেখিল রাখাল উঠে নাই, উঠিবার কোন চিহ্নই তাহার মধ্যে দেখা যাইতেছে না।

দেবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি রাখাল, তুমি যে উঠছ না?"

রাখাল মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ কাজ আমার ভাল লাগছে না দেবানন্দ।"

বিস্মিত হইয়া দেবানন্দ বলিল, "ভাল লাগছে না কেন? এমন আরামে রাজার মত থাকা—তোমায় কোন ছোট কাজে রাখিনি, একটা দলের ভার তোমার হাতে দিয়েছি এও ভাল লাগছে না?"

রাখাল দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "না, এও আমার ভাল লাগছে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি দেবানন্দ—যদিও তুমি আমার প্রভু, তবু তুমি আমার বাল্যবন্ধু, কাজেই তোমায় আমি অসঙ্কোচে যে কোনও প্রশ্ন করিতে পারি। বল দেখি এই যা কাজ তুমি আমাদের দিয়ে করাচ্ছ—এ কি সত্যি দেশের কাজ হচ্ছে?"

দেবানন্দ ধীরকণ্ঠে উত্তর দিল—"কিসে হচ্ছেনা বলে মনে কর?"

রাখাল বলিল, "কিন্তু তুমি আগেই আমায় যখন দেশসেবাব্রতে ব্রতী কর—তখন বলেছিলে অহিংসা পরম ধর্ম্ম, আমরাও সেই নীতি অনুসারে চলব। কিন্তু এই কি সেই নীতি, এতে শান্তি কোথায়? তুমি যে শান্তি আনতে চাও, আমি দেখছি—আমরা আমাদের এই সব কাজে কেবল অশান্তিই আনছি। এই নরহত্যা, লুণ্ঠন, এক একটা দেশের

মধ্যে বিদ্রোহ নিয়ে আসা—একি শান্তির কাজ বলতে চাও, একে কি দেশসেবা বলে ?"

দেবানন্দ খানিক চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "এ প্রশ্নের উত্তর আজ দেব না, আর একদিন দেব। আজ উপস্থিত তোমায় কাজে যেতে হবে, তোমার জন্যে ওরাও কেউ যেতে পারছে না।"

কঠিনভাবেই রাখাল বলিল, "না, আমি এ-রকম কাজ করতে ইচ্ছুক নই। তুমি আজ যা ধ্বংস করবার জন্যে আমাদের পাঠাচ্ছ, হয়তো একজনকে ধ্বংস করাই তোমার অভিপ্রায় কিন্তু তার জন্যে শত শত প্রাণীকে ধ্বংস করতে আমি পারব না৷"

শক্তকণ্ঠে দেবানন্দ বলিল, "পারতেই হবে, যখন জেনে শুনে আমাদের ব্রত নিয়েছ, তখন না বললে আমরা তো শুনব না রাখাল।"

রাখাল বলিল, "আমি যদি না করি।"

শান্তভাবে দেবানন্দ বলিল, "দলের লোক যদি কেউ হুকুম না শোনে, যদি দলের বিপক্ষতাচরণ করে, তা হলে তার যে কি শাস্তি হয় তা তোমার অজ্ঞাত নেই রাখাল।"

রাখাল শিহরিয়া উঠিল।

মনে পড়িল, কয়েকদিন আগে একটী মাদ্রাজী যুবককে ইহারা কি নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। যুবকের সংসারে মা বর্ত্তমান, তিনি পুত্রের এই দলে যোগ দেওয়ার কথা শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে যুবক দল ছাড়িয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছিল, স্পষ্ট বাক্যেই জানাইয়াছিল এ-রকম ঘৃণিত কাজ সে আর করিবে না, দেশসেবার নামে সে দেশের অনিষ্ট করিবে না। এই অপরাধে তাহাকে একদিন রাত্রে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়।—সেদিনের কথা রাখাল ভুলে নাই।

বিবর্ণ মুখে সে বলিল, "জানি, তোমরা আমায় হত্যা করবে।"

দেবানন্দ বলিল, "আমাদের দলের নিয়মই এই। আজ যদি আমি ছেড়ে দিতে চাই, ওরা আমার ওপর বিশ্বাস হারাবে, আমায় হত্যা করবে। দেখছ—এদিকে মৃত্যু, ওদিকে জেল—পরিত্রাণ কিছুতেই নেই।"

ইহার পরই যে সাংঘাতিক ট্রেণ-দুর্ঘটনাটা ঘটিয়া গেল তাহাতে আপামর-সাধারণ লোক চমকিয়া উঠিল।

সরকার হইতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল দেশ-সেবার নামে যাহারা এমন সব পৈশাচিক কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতেছে তাহাদের মধ্যে কাহাকেও যদি কেহ ধরাইয়া দিতে পারে সে যথেষ্ট পুরস্কৃত হইবে।

পুরস্কারের পরিমাণ বেশ বেশী রকমই ছিল। দেবানন্দের দল কিছুদিনের মত চুপচাপ রহিয়া গেল, তাহারা নূতন কোন কাজে হাত দিল না।

বহুকাল পরে আবার কলিকাতা, আবার বাঙ্গালীর মধ্যে।

রাখাল স্পষ্টই বলিল—"সে আর বাংলা ছাড়িয়া নড়িবে না, বাংলায় থাকিয়া দলের যে কোন কাজ পড়ে তাহা সে করিয়া দিবে।

দেবানন্দ বলিল, "মাস দুই থাকতে পার, কিন্তু এর মধ্যে এই কলকাতাতেই থেকে একটা কাজ করতে হবে।"

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ?"

দেবানন্দ বলিল, "মিস রায় নামে একটী মেয়ে আমাদের দলের নিরঞ্জন নামে যে ছেলেটী ছিল তার আত্মীয়া। নিরঞ্জন দল ছেড়ে পালিয়েছিল কিন্তু পালিয়ে সে আত্মরক্ষা করতে পারে নি, আজ ছয় সাত দিন হল তাকে ইহজগৎ হতে বিদায় দেওয়া হয়েছে। আমাদের দলের অনেক গোপনীয় কাগজপত্র, নক্সা, সকলের নাম—সবই এই মেয়েটীর হাতে গিয়ে পড়েছে, শুনেছি সে এইগুলো পুলিসের হাতে দেবার চেষ্টায় আছে। যদি পুলিস এগুলো পায়, তা হলে আমাদের দলের যে যেখানে আছে সব ধরা পড়বে, আর সহজে যে মুক্তি পাব না, অনেককে আন্দামানে যেতে হবে, ফাঁসিতেও দোল খেতে হবে, এ জানা কথা। এখন কথা হচ্ছে যেমন করেই হোক এই কাগজপত্রগুলো মিস রায়ের কাছ হতে নিতে হবে।"

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু এই পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে কাগজপত্র তিনি যে পুলিসের হাতে দেন নি তার প্রমাণ কি?"

দেবানন্দ বলিল, "তিনি আজ কয়দিন বাড়ীর বার হন নি, সে খবর আমি রাখি। তাঁর বাড়ীর চারিদিকে লোক রেখেছি—তারা অহোরাত্র

পাহারা দিচ্ছে। মিস রায় সেদিন বিকেলে বেরিয়ে ছিলেন বটে, শুধু হাতে গেছলেন।”

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, “আমায় কি করতে হবে?”

দেবানন্দ বলিল, “যেমন করেই হোক সেই কাগজপত্র আনতে হবে—আর মিস রায়কে—”

রাখাল বলিল, “হত্যা করতে হবে।”

দেবানন্দ খুসি হইয়া বলিল, “তা না করা ছাড়া উপায় নেই, তাঁর একটা প্রাণের বদলে আমাদের শত শত প্রাণ রক্ষা হবে, তা বুঝতে পারছ তো?”

ইহারই দিন দুই পরে কালীঘাটের দিকে বেড়াইতে গিয়া একটী মেয়েকে দেখিয়া রাখাল চমকাইয়া উঠিল।

প্রথমটায় বিশ্বাস হইল না, তাহার পর বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিল—সে তুলসীই বটে।

সে মৈত্রেয়ীর সহিত চলিয়া গিয়াছিল। রাখাল সেবার কাশী গিয়া অনেক খুঁজিয়াছিল, মৈত্রেয়ী বা তুলসী কাহাকেও দেখিতে পায় নাই।

তুলসীকে দেখিয়া সে অগ্রসর হইয়া গেল,—“তুলসী যে,—কোথায় আছ এখন?”

তুলসী বিস্ময়ে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, দীর্ঘ কয়েক বৎসরের ব্যবধানে সে রাখালকে চিনিতে পারিল না।

রাখাল বলিল, “আমায় চিনতে পারছ না তুলসী, আমি তোমাদের সেই দাদাঠাকুর—রাখাল। খিদিরপুরের কথা মনে পড়ে?”

“ওমা—আপনি দাদাঠাকুর—প্রণাম হই।”

তুলসী ভক্তিভরে পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাখালের মূল্যবান কাপড়-জামার পানে তাকাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, “এখন কোথায় কাজ করছ দাদাঠাকুর?”

রাখাল উত্তর দিল, "চাকরী আর করি নে, ব্যবসা করি।"

তুলসী বলিল, "লাভ-টাভ আছে তো?"

হাসিয়া রাখাল বলিল, "তা আর নেই? এই দেখ না—চেহারাও ফিরেছে, কাপড় জামাও বদলেছি, একখানা মোটরও কিনে ফেলেছি। আগে তো কুলির কাজ করতে দেখেছিলে—তখন কি এ-রকম কিছু ভেবেছিলে?"

তুলসী আনন্দে মন খুলিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, "আহা তা হোক, তা হোক। বামুনের ছেলে, কত কষ্টই না পেয়েছ বাছা, ওই সব ছোট-লোকদের সঙ্গে মিশে; ওদের সঙ্গে মেশা কি তোমার পোষায়। ভদ্দর লোকের ছেলে—ভদ্দর লোকের সঙ্গে মেশো, ভদ্দরের মত থাকো, সেই তা ভাল।"

রাখাল বলিল, "ও-কথা যাক, তুমি এখানে কার সঙ্গে এলে, কোথায় আছ?"

তুলসী বলিল, "আমি তো সেই থেকে বরাবর মায়ের সঙ্গেই আছি। মা কামাখ্যায় যাবেন এই অম্বুবাচীর সময়ে, তাই বৃন্দাবন হতে এসেছেন, আমিও তাঁর সঙ্গে এসেছি।"

"কে, সপ্তমী এসেছে?"

রাখাল খানিক স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "সে কোথায় আছে বল দেখি, একবার তার সঙ্গে দেখা করব।"

তুলসী ভয়ে ভয়ে বলিল, "কিন্তু তিনি যদি আমার ওপর রাগ করেন?"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া রাখাল বলিল, "কেন, রাগ করবার কি হেতু আছে?"

তুলসী বলিল, "মা যে কারও সঙ্গে দেখা করেন না। টাকাকড়ি কিছু নেওয়ার জন্যেই এখানে এসেছেন, ওঁর ব্যাঙ্কে কিছু টাকা আছে কিনা। এখানে কেউ জানে না যে উনি এসেছেন, মা কারও সঙ্গে দেখা করেন না।"

রাখাল একটু হাসিয়া বলিল, "আর কারও সঙ্গে দেখা না করলেও আমার সঙ্গে করবেন, কেন না আমি তাঁর রাখালদা। তুমি বলে দাও তো তিনি কোথায় আছেন।"

তুলসী অনিচ্ছার সহিত বলিল, "তিনি গঙ্গার ধারে আছেন; কিন্তু তুমি এখন গিয়ে তাঁর সাড়া পাবে না দাদাঠাকুর, তিনি এখন সমাধিতে বসেছেন কিনা।"

সমাধি, সপ্তমী—থিয়েটারের অ্যাক্ট্রেস বিখ্যাত মৈত্রেয়ী—সে আবার সমাধিতে বসে, কথাটা শুনিয়া রাখাল উচ্ছ্বসিত হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে না।

কোনক্রমে হাসি দমন করিয়া সে বলিল, "কখন তাঁর দেখা করার সময় হয়?"

তুলসী বলিল, "কোন সময়েই তাঁর ছুটি নেই; তবু সকালের দিকে দুই একটা কথা বলেন, সেই সময় আসবেন।"

রাখাল বলিল, "সেই ভাল। আমি যে আসব একথা তাকে বলে রেখো।"

তুলসী বলিল, "না দাদাঠাকুর, একথা বললে মা আমাকেই বকবেন, ভাববেন আমি তোমায় খবর দিয়েছি। তার চেয়ে তুমি এমনই চলে এসো, তাতে কিছু হবে না।"

রাখাল ফিরিয়া আসিল।

রাত্রে দেবানন্দ তাড়া দিল—মিস রায়ের ব্যাপারটা আগে মিটাইয়া

লওয়া উচিত, যত দেরী হইতেছে, মনে হয় বিপদ ততই ঘনাইয়া আসিতেছে।

এমন একদিন ছিল যেদিন রাখাল এ সমস্ত কাজ দারুণ ঘৃণার চোখে দেখিত, বিশেষ করিয়া মেয়েদের উপর অত্যাচার সে মোটেই সহিতে পারিত না। সে-দিনে যে বিবেক মাঝে মাঝে অন্তরে উঁকি দিত তাহাকে সে গলা টিপিয়া হত্যা করিয়াছে। তাহার অন্তর আজ পাষাণ সমান হইয়া গেছে, তাহাতে কোন দাগ আর বসে না।

ধীরে ধীরে সে বিলাসিতা-পঙ্কে এমন নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে যেখান হইতে উঠা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। দিনকতক সে নেশা ছাড়িয়া দিয়াছিল, সৎ হইবার বাসনাও অন্ততঃপক্ষে করিয়াছিল, এখন সে-কথা মনে করিলেও হাসি পায়।

তাহার কেবলই মনে পড়িতেছিল—সপ্তমী আজ সমাধিতে বসে, ইহা অপেক্ষা হাস্যকর কথা আর কি থাকিতে পারে?

মানুষ কেন যে নিজেকে সর্ব্বসুখে—সর্ব্বপ্রকার আনন্দ হইতে বঞ্চিত করে তাহা সে ভাবিয়া পায় না। একদিন ছিল—যেদিন রাখাল বুঝিত ত্যাগই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ত্যাগেই তৃপ্তি, শান্তি ও আনন্দ প্রচুর পরিমাণে নিহিত আছে, কিন্তু আজ সেই রাখালই এ-কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়।

পরদিন সকালে সে মোটর হাঁকাইয়া কালীঘাটে গিয়া পৌছিল।

তুলসীর দেখা সহজেই মিলিল, সে তখন পূজা দিয়া ফিরিতেছে।

দূর হইতে গঙ্গাতীরের একটা গাছতলা দেখাইয়া দিয়া তুলসী সরিয়া পড়িল, বলিয়া গেল, "ওইখানে তিনি আছেন, গেলেই দেখা হবে।"

কে-জানে কেন—সেদিকে যাইতে রাখালের বুক কাঁপিতেছিল, জোর করিয়া সে অগ্রসর হইল।

নিকটেই একটী গাছতলায় বসিয়া একটী গৈরিক-বসনা নারী, তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, অপূর্ব্ব মুখের জ্যোতি। সন্ন্যাসিনী পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া যোগাসনে বসিয়াছেন, হাত দুখানা শ্লথ ভাবে কোলের উপর পড়িয়া আছে। প্রভাত-সূর্য্যের অরুণ আলো সেই দৃপ্ত-সুন্দর মুখখানার উপর পড়িয়া ঝলমল করিতেছিল।

রাখাল স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইল, বুঝিয়াও সে বুঝিতে পারিতেছিল না, চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছিল না। এই কি মৈত্রেয়ী, বিলাসিনী বিখ্যাত অভিনেত্রী মৈত্রেয়ী ? না, সে মৈত্রেয়ী মরিয়া গিয়াছে, সপ্তমীও মরিয়া গিয়াছে, এ পবিত্রা তপস্বিনী।

কতকক্ষণ সে আত্মহারাভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহা সে নিজেই জানে না।

নারী সূর্য্যকে অঞ্জলি দিয়া চক্ষু মেলিল, সম্মুখেই রাখালকে দেখিতে পাইল। তাহার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল মাত্র।

নিকটে একটী স্থান দেখাইয়া সে ইঙ্গিতে রাখালকে বসিতে বলিল ; বিস্ময়াপ্লুত-হৃদয়ে রাখাল তাহার নির্দ্দেশানুসারে সেখানে বসিয়া পড়িল।

ধ্যানান্তে আরাধ্য-দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া সপ্তমী মাথা তুলিল।

"বসে আছ রাখালদা, ভেবেছিলুম তুমি চলে গেছ।"

রাখাল বলিল, "আমি তো যাওয়ার জন্যে আসি নি সপ্তমী, তোমার কাছে আমার কাজ আছে, গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে সেই জন্যেই এসেছি। শুনেছি ও-বেলা তুমি চলে যাবে, কাজেই—"

মৃদু হাসিয়া সপ্তমী বলিল, "হ্যাঁ, বিকেলে আমি কামাখ্যা রওনা হব ঠিক করেছি বটে। আমি যে এখানে এসেছি এ-খবর তুমি কি করে পেলে?"

রাখাল বলিল, "এ-দিকে বেড়াতে এসে হঠাৎ তুলসীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, জানতে পারলুম তুমি এখানে এসেছ।"

সপ্তমী বলিল, "দেনা শোধ দিতে এসেছ বুঝি?"

রাখাল মাথা নাড়িল—"না—"

সপ্তমী বলিল, "তবু ভাল। যাক, কি কথা জিজ্ঞাসা করবে বলছিলে বল দেখি?"

রাখাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "না, এমন কোনও কথা নয়। তুমি চলে যাওয়ার কিছুদিন পরে আমি এসে তোমার খোঁজ নিয়েছিলুম, কেউ খবর দিতে পারলে না। আজ কতকাল পরে দেখা বল দেখি সপ্তমী, মাঝখানে সাতটা বছর কেটে গেছে না?"

অন্যমনস্ক ভাবে সপ্তমী বলিল, "হ্যাঁ, তা হল বই কি?"

রাখাল বলিল, "সাতবছর পরে তোমায় দেখে সত্যিই আমি চিনতে

পারছি নে, আগাগোড়া তোমার পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। তোমার পর পর অনেক পরিবর্ত্তনই দেখলুম সপ্তমী, কোন অবস্থাতেই তো সুখী হতে পার নি, এ অবস্থায় কেমন আছ তাই জানতে চাই।"

সপ্তমী হাসিল, মিষ্টকণ্ঠে বলিল, "আজ আমি যথার্থ সুখ, যথার্থ শান্তি পেয়েছি রাখাল-দা, আজ বেশ বুঝেছি—ভোগের পথে সুখ নেই—শান্তি নেই, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের পায়ের কাছে উৎসর্গ করে দিলে সত্যিই সুখ শান্তি মেলে। জানবে কি রাখাল-দা—জীবনের গত কাজের জন্যে কতখানি অনুতপ্ত হয়ে উঠেছিলুম, আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করতে গিয়েছিলুম, কিন্তু ভগবান নিজে একটী সাধুর রূপ ধরে আমায় রক্ষা করলেন, আমায় পথ দেখিয়ে দিলেন,—আমায় শান্তি তৃপ্তির অধিকারিণী করলেন।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, "আমি মনে করি—আমার পুনর্জন্ম হয়েছে তোমাদের সে সপ্তমী—সে মৈত্রেয়ী মরে গেছে, আজ আমি মাতাজি,—আমি স্ত্রী নই, মেয়ে নই, আমি জগতের মা। দুনিয়ার কোন ঐশ্বর্য্য, কোন মোহ আমায় প্রলোভিত করতে পারবে না, আমায় কেউ আঘাত করতে পারবে না, আমি যে অক্ষয়বর্ম্ম পরেছি এই বর্ম্মে ঠেকে সব আঘাত ব্যর্থ হবে। রাখাল-দা—ভোগে তৃপ্তি নেই, ভোগে বাসনা বেড়েই চলে, নিবৃত্ত হয় না, ত্যাগে একমাত্র নিবৃত্তি, ত্যাগে মোক্ষ, ত্যাগে শান্তি।"

এ কে, এ কি রাখালের বাল্য সহচরী সপ্তমী, নাট্য জগতে পরিচিতা মৈত্রেয়ী? রাখাল সম্মুখে যাহাকে দেখিতেছে এ যে সন্ন্যাসিনী, এ যে মাতাজি। রাখাল আজও কাহার মূর্ত্তি মনের মধ্যে আঁকিয়া রাখিয়াছে, আজও কাহাকে কাছে ফিরিয়া পাইবার গোপন বাসনা—তাহার অন্তরের গোপনতম অন্তরালে সঞ্চিত আছে?

সপ্তমী রাখালের মুখের উপর সরল দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কি করছ রাখালদা? তোমায় দেখে বুঝতে পারছি তোমার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে, আগে নিজের পানে তাকাতে তুমি চির উদাসীন ছিলে, বলে বলেও তোমায় নিজের সম্বন্ধ সচেতন করতে পারি নি; আজ তোমার এই সযত্নকৃত সাজসজ্জা দেখে মনে হচ্ছে—বিলাসিতার উপাদান তুমি পেয়েছ, জীবনকে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করে যাচ্ছো—কেমন তাই নয় কি?"

রাখাল উত্তর দিল না, নীরবে সম্মুখ প্রবাহিতা শীর্ণা নদীটির পানে তাকাইয়া রহিল। সে সপ্তমীর সহিত খেলা করিয়াছে মৈত্রেয়ীর সহিত ঝগড়া করিয়াছে, মাতাজীর সম্মুখে সে মাথা তুলিতে পারে না, একটী কথা বলিবার সাহস তাহার নাই।

সপ্তমী তাহার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করিল, ধীর কণ্ঠে বলিল, "বুঝতে পেরেছি, তুমি মোহ ছাড়তে পার নি, আজও ভগবানকে চিনতে পার নি। হয় তো একমুহূর্ত্তে তোমার মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হতে পারে, মহাপাপীর জীবনের পরিবর্ত্তন অকস্মাৎই হয়ে থাকে নিজের জীবনে সেটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি রাখালদা। আজ তোমার প্রশ্নই আমি তোমায় করছি, বল দেখি—এই বাবুয়ানাতে সুখ পেয়েছ কিনা, শান্তি পেয়েছ কিনা?"

ছায়ার মতই রাখাল মাথা নাড়িল।

সপ্তমী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, "সত্যিই তা পাওয়া যায় না। একদিন আমি তোমায় বলেছিলুম, টাকা পয়সায় সত্যিকার শান্তি সুখ কেনা যায় না, সে কথা সত্যি। একজন ধনীর মনে যে আনন্দ নেই একজন গরীবের মনে সে আনন্দ থাকে।"

রাখাল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "তুমি ভগবানকে পেয়েছ?"

সপ্তমী হাসিল, "ভগবানকে পাওয়া কি সহজে যায়, তবে অন্তরে তাঁর স্নেহের স্পর্শ অনুভব করি এ কথা নিশ্চয়ই বলব। যখন কোন কারণে অন্তরে আঘাত পাই তখন তিনিই তাঁর স্থধামাখা হাত দিয়ে সে আঘাতের ব্যথা মুছিয়ে দেন; যখন অতীতের কথা ভেবে শিউরে উঠি, তখন বুকের মধ্যে তিনিই আশা জাগিয়ে দেন, তিনিই ডেকে বলেন—পাপীরও উপায় আছে, চলার পথ আছে। আবার কি করে ভগবানের দেখা পাব রাখালদা? তাঁর স্পর্শ আমি পাচ্ছি তাঁর কথা আমি শুনছি এই আমার যথেষ্ট পাওয়া, আমি তাঁকে দেখতে চাইনে।"

রাখাল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, বলিল, "তোমার এখনও ঢের কাজ বাকি আছে, না?"

সপ্তমী বলিল, "একবার মন্দিরে যাব।"

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "বিকেলের ট্রেণে কামাখ্যা রওনা হবে?"

সপ্তমী বলিল, "যাব তো ভাবছি। এমনি করে ঘুরে ঘুরে জীবনটাকে কাটিয়ে দেই। আর কয়টা দিনই বা, শেষ হয়ে গেলেই বাঁচি। গত জন্মে বোধ হয় এতটুকু সৎকাজ করেছিলুম যার ফলে এ পাপে ডুবেও আবার উঠতে পেরেছি। এ জন্মে যদি পারি, এমন কাজ করে যাই যাতে আর এ জগতে না আসতে হয়। জগতে এসে অনেক সুখ ভোগই করেছি, জগতের পরে ঘৃণাই জন্মে গেছে।"

রাখাল উঠিল,—"তোমার কাজ আছে, আমি এখন যাই, তোমার কাজে বিঘ্ন দেব না।"

কুণ্ঠিতা সপ্তমী বলিল, "না না, বিঘ্ন কিছু হবে না রাখালদা, তুমি বসো। অদৃষ্টক্রমে একবার দেখা হয়ে গেছে, আর দেখা হবে কিনা

তাই বা কে বলতে পারে। আমি না হয় একটু বেলা হলে মন্দিরে যাব এখন।"

রাখাল বল্লিল, "বিকেলে ষ্টেশনে থাকব এখন, মেলে যাবে তো, সেই সময় যাব।"

সে বিদায় লইল।

অন্তরে সত্যই তাহার আঘাত লাগিয়াছিল একদিনকার কথা মনে পড়িল—সে দিন মৈত্রেয়ীকে সে বিদ্রূপ করিয়াছিল, জানিতে চাহিয়াছিল যে পথে সে আসিয়াছে সে পথে শান্তি আছে কিনা। কে বলিতে পারে তাহার দত্ত সেই আঘাতেই মৈত্রেয়ীর পরিবর্ত্তন হয় নাই, মৈত্রেয়ী সত্যপথ খুঁজিয়া পায় নাই?

আজ সে কোথায় আর রাখাল কোথায়? একদিন তাহারা একই স্থানে ছিল—সেদিন মৈত্রেয়ীকে লাভ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না, কিন্তু মৈত্রেয়ী বরাবর তাহাকে দূরে রাখিয়া চলিয়াছে, কোনদিন কাছে আসিতে দেয় নাই। আজ মৈত্রেয়ী কোথায়, কতদূরে, কত উপরে চলিয়া গিয়াছে, আর সে কোথায়, আরও কত নীচে নামিয়া গেছে। তখন সে কেবল নিজের সর্ব্বনাশই করিয়াছিল, এখন সে কত শত শত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

অন্ধকার—তাহার চারিদিকে নিকষ কাল বিরাট অন্ধকার। এতটুকু আলোর রেখা পাইবার জন্য তাহার প্রাণটা হাঁফাইয়া উঠিতে ছিল—কিন্তু আলো—কোথায় আলো?

কোনক্রমে বাসায় ফিরিয়া সে শুইয়া পড়িল, সেদিন সে উঠিল না, জলস্পর্শও করিল না।

আজই রাত্রে আর একটা নৃশংসকাজের সম্পাদন ভার তাহার হাতে, কিন্তু অন্তর যে চায় না, উপায় যে নাই।

সেই দিনই সে দেবানন্দের সহিত পাকা কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া লইল, আজ রাত্রে কাগজপত্রগুলা জ্বালিয়া দিয়া সে মুক্তিলাভ করিবে। দেবানন্দ বা দলের আর কাহারও ভয় নাই, সে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না, যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহাকে তাহারা স্বচ্ছন্দে হত্যা করিবে।

দেবানন্দ তাহাতেই সম্মত হইল।—

৩৭

রাত্রি তখন গভীর, বালিগঞ্জ তখন নিস্তব্ধ। চোরের মত চুপে চুপে দুইজন সঙ্গী লইয়া রাখাল উচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে পড়িল।

প্রকাণ্ড বড় কুকুরটা বাঘের মত সামনে আসিয়া পড়িতেই রাখাল বিপুল বলে তাহার গলা চাপিয়া ধরিল।

কুকুরটা ছটফট করিতে লাগিল, একটা শব্দ তাহার মুখে ফুটিল না। রাখালের বলিষ্ঠ বাহুর পেষণে অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই কুকুরটা মরিয়া গেল।

বাড়ীর অধিবাসিগণ গাঢ় নিদ্রামগ্ন। সঙ্গী দুইজনকে লইয়া ধীরপদে রাখাল অগ্রসর হইল।

ভিতর হইতে বদ্ধ দরজা খোলা রাখালের কাছে শক্ত কাজ নয়। এ-সব কাজে সে খুব সিদ্ধ হস্ত; সেই জন্যই সে শীঘ্রই দরজা খুলিয়া ফেলিল।

সিঁড়ি বাহিয়া তিনজনে উপরে উঠিয়া গেল; সম্মুখেই যে বড় ঘরটার জানালা পথে ল্যাম্পের মৃদু নীলাভ আলো বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়া ছিল সেই ঘরটা দেখাইয়া জনৈক সঙ্গী চাপা সুরে বলিল, "মিস রায় এই ঘরে থাকেন।"

দরজা ভেজান ছিল, সুরক্ষিত বাড়ীর মধ্যে দরজা বন্ধ করার প্রয়োজন কোনদিনই ছিল না, নিত্যকার মত আজও দরজা খোলা ছিল। তিনজন প্রবেশ করিল, রাখাল দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সোফার উপর নিদ্রাগত মিস রায়—কিছুই জানিতে পারেন নাই।

বাক্স ড্রয়ার খুলিয়া আবশ্যকীয় কাগজপত্র পাওয়া গেল না, ক্রুদ্ধ রাখাল সগর্জ্জনে বলিল, "লুকিয়ে রেখেছে, না হয় পুলিসের হাতে দিয়েছে। ওকে জাগাও।"

কিন্তু জাগাইতে হইল না, মিস রায় হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া ল্যাম্পের মৃদু আলোকে তিনটী মনুষ্য মূর্ত্তি ঘরের মধ্যে দেখিয়া অস্ফুটে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

উদ্যত রিভলভার তাঁহার বুকের উপর লক্ষ্য করিয়া রাখাল দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া বলিল, "চুপ, চেঁচালেই গুলি করব।"

মিস রায় উঠিতে যাইতেছিলেন, আবার শুইয়া পড়িলেন, অস্ফূট কণ্ঠে কেবল মাত্র বলিলেন, "ভগবান—"

রাখাল কর্কশকণ্ঠে বলিল, "আমাদের যে সব কাগজপত্র নিরঞ্জনের কাছে ছিল সে সব কাগজ কোথায়—বার করে দাও।"

মিস রায় উত্তর দিলেন না, নিষ্পলকে রাখালের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

রাখাল বলিল, "সময় নেই—সে সব কাগজপত্র বার কর নইলে—"

বুকের উপর উদ্যত রিভলভার, মিস রায় ভয় পাইলেন না, বলিলেন, "নইলে কি করবে দস্যু, খুন করবে?"

কণ্ঠস্বরটা পরিচিত নয়—

রাখাল হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল, মনে হইল এ কণ্ঠস্বর সে কবে কোথায় শুনিয়াছে। সে ভাল করিয়া মিস রায়ের পানে তাকাইল, না—পরিচিত নয়।

রাখাল বলিল, "নিশ্চয়ই।"

মিস রায় হাসিলেন, "আগেই কর, আমি মরতে ভয় পাইনে।"

কি মনে করিয়া রাখাল রিভলভার উঠাইল, বলিল, "না, আমরা সেই কাগজপত্র চাই। সে গুলো যদি পাই, তোমায় আমরা খুন করব না।"

মিস রায় উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, "কিন্তু তোমাদের কথায় বিশ্বাস

কি? তোমরা দেশদ্রোহী, দেশের শুভ করার নামে দেশের অশুভই করছ, দেশের বুকে রক্ত স্রোত বইয়ে দিচ্ছ, তোমাদের কেউ কি বিশ্বাস করতে পারে? আমি তোমাদের কাগজপত্র না দিলে যেমন আমায় খুন করবে, দিলেও তো তেমনি খুন করবে?"

এই প্রগলভা মেয়েটীর কথায় রাখাল থতমত খাইয়া গেল, বলিল, "দিলে কোন অনিষ্ট হবে না বলছি—কিন্তু—"

বাধা দিয়া মিস রায় বলিলেন, "বিশ্বাস করতে পারলুম না, কারণ আমি সব জানি, কাগজপত্র দিলেও আমি সব কথা পুলিসকে বলে দিতে পারি। তোমরা যে জাল ফেলেছ তাতে কে কে আছ তাও আমার অজানা নেই। আমি কাগজ আজ তোমাদের দিয়ে দিলেও কি এ সব কথা পুলিসকে জানাতে পারিনে?"

রাখাল একটু হাসিল, "হ্যাঁ তা পার, কিন্তু এটাও তেমনি মনে রাখতে হবে—আমরা দলে একজন লোক নই, একজন ধরা পড়বামাত্র দলের অন্য লোকেরা তোমায় খুন করবে।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া মিস রায় বলিলেন, "আমি তো আগেই বলেছি আমি মরণের ভয় করিনে; মরণ—সে তো শান্তির জিনিস, তাকে ভয় করবার মত তো কিছু নেই। মরণকে ভয় করবে তারা যাদের সামনে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলভাবে সেজে দাঁড়িয়ে আছে, বর্ত্তমান যাদের কাছে পরম শান্তিপ্রদ, কিন্তু আমার কাছে তো তা নয়। ভবিষ্যৎ যার কাছে চিরঅন্ধকার, বর্ত্তমান যার কাছে জ্বালাময়, সে মরণকেই তো চায়। আমি তো মরবই—মরবার আগে যদি তোমাদের মত একদল পাপিষ্ঠের শাস্তি দিয়ে যেতে পারি তাতে পৃথিবীর মঙ্গলই হবে, দেশেও শান্তি আসবে।"

দেয়ালের ঘড়িতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিল, রাখাল চঞ্চল হইয়া

উঠিল, “আর দেরী করলে চলবে না, সে কাগজপত্র শিগগীর বার কর, নইলে বাস্তবিকই তোমায় খুন করব।”

মিস রায় বিছানার তলা হইতে কতকগুলা কাগজপত্র বাহির করিয়া রাখালের সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, “এই নিয়ে যাও। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি এই ভেবে—মাত্র তিনজন তোমরা—কোন সাহসে এই বাড়ীতে ঢুকলে? তোমাদের একটুকু প্রাণের ভয় হল না যে আমার বাড়ী সর্ব্বদা সুরক্ষিত থাকে।”

রাখাল কাগজপত্র কুড়াইয়া লইতে লইতে বলিল, “প্রাণের ভয় যে আমরা করিনে এ প্রমাণ অনেক কাল আগেই দেওয়া হয়ে গেছে। আমরা তিনজন আছি, যদি দুজনও আজ এই কাজ করতে ধরা পড়ি —আর একজনও পালাতে পারবে তো।”

কাগজপত্রগুলা সঙ্গীর হাতে দিয়া রাখাল বলিল, “তোমরা দুজন বাইরে দাঁড়াও, আমি আসছি।”

সঙ্গী দুইজন বাহির হইয়া গেল।

রাখাল মিস রায়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, “আমাদের দলের লোকেরা আমায় আদেশ করেছে—যেন আমি তোমায় জীবিত না রেখে যাই। যদি তুমি কোন রকমে বেঁচে থাক—আজকের ব্যাপারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে তুমি নিশ্চয়ই পুলিসের সাহায্য নেবে। কাগজপত্রগুলো তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ কাজেই—”

মিস রায় বলিলেন, “হ্যাঁ, দেখেছি, দেখে মর্ম্মাহত হয়েছি, বড় কষ্ট পেয়েছি যে দেশের কাজ করবার নামে একদল লোক এমনই করে চুরি ডাকাতি খুন করে নিজেদের পৈশাচিক বৃত্তিগুলো চরিতার্থ করছে। হ্যাঁ, আমি আগেও বলেছি—এখনও বলছি আমি এ সব কথা রাষ্ট্র করবো, যাতে তোমাদের শাস্তি হয় তা করব।”

রাখাল রিভলভার তুলিল, "তা হলে প্রস্তুত হও, আমি তোমায় খুন করব।"

"স্বচ্ছন্দে, কিন্তু তার আগে একবার আমাকে এতটুকু সময় দাও রাখালদা, দুটো কথা আমায় বলে নিতে দাও। তুমি আমায় চিনতে পারনি, কিন্তু আমি তোমায় চিনেছি, তোমার এই শোচনীয় অধঃপতন আমার অন্তরকে দারুণ আহত করেছে, আমি তোমায় আর সহ্য করতে পারছি নে।"

"ইথার—তুমি—"

রাখালের হাত হইতে উদ্যত রিভলভার মাটীতে পড়িয়া গেল, ভীষণ শব্দে গুলি ছুটিয়া গিয়া দেয়ালে লাগিল।

শঙ্কিতা হইয়া উঠিয়া ইথার বলিল, "সর্ব্বনাশ করলে? এখনই আমার বাড়ীর সব লোকজনের ঘুম ভেঙ্গে যাবে, তারা ছুটে আসবে। তুমি পালাও রাখালদা—এখানে আর মুহূর্ত্তমাত্র থেকো না। একটা কথা বলে দেই—আমার এ অনুরোধ রেখো—এ পাপের কাজ ছেড়ে দাও—এমন করে দেশের লোকের সর্ব্বনাশ করো না, মঙ্গলের নামে অমঙ্গল টেনে এনো না। তোমার যা কাজ তা মিটে গেল, আর এ সব কাজে হাত দিয়ো না, কাল হতে এ দল ছেড়ে দিয়ো। আমার জন্যে কিছু ভাবনা নেই, আমি যদি জানতে পারি তুমি ওদলে নেই, সব কথা পুলিসকে জানাতে পারব। যে দিন কাগজপত্র পেয়েছিলুম সেই দিনই জানাতুম —কেবল তোমার নাম দেখে সন্দেহ হয়েছিল, তার পর নিরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলুম—রাখাল আর কেউ নয় তুমিই—সেই জন্যে—"

গুম—

একটা গুলি অব্যর্থ লক্ষ্যে অজ্ঞাত হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল,

দুই হাতে আহত বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া ইথার বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল।

উন্মত্তের ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া রাখাল চীৎকার করিয়া উঠিল—"কে, কে গুলি করলে? শিরীষ, হরি সিং—"

তাহারা নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া ততক্ষণে দ্রুত পলাইয়াছে।

"ইথার—ইথার—"

রাখাল ইথারের পার্শ্বে বসিয়া পড়িল—

ক্ষীণকণ্ঠে ইথার বলিল, "পালাও, বাড়ীর লোক আসছে—মিঃ মুখার্জ্জি আসছেন। কেউ বিশ্বাস করবে না অন্যে আমায় গুলি করেছে, তোমাকেই ধরবে—"

রাখাল উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিল, "না, আর পালাব না. আজ চার পাঁচ বছর লুকিয়ে বেড়াচ্ছি, জীবনের ওপর যেটুকু মমতা ছিল আজ তাও অন্তর্হিত হয়ে গেছে, আমি আর বাঁচতে চাইনে, আমার প্রায়শ্চিত্তের সময় এসেছে।"

সে নিমেষহীন চোখে ইথারের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখখানার পানে তাকাইয়া রহিল।

রাখাল অসঙ্কোচে স্বীকার করিল ইথারকে আর কেহ গুলি করে নাই, সেই গুলি করিয়াছে।

বিচলিত বিচারপতি বলিলেন, "কিন্তু মিস রায় ত্যুকালীন জবানবন্দীতে বলে গেছেন তুমি তাঁকে গুলি কর নি, বাইরে হতে গুলি করে পালিয়েছে।"

রাখাল শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "বাইরে আর কেউ ছিল না, আমি একাই ছিলুম। তিনি আমার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে চীৎকার করতে যাচ্ছিলেন, বাধ্য হয়ে আমি তাঁকে গুলি করেছিলুম।"

উকিল প্রশ্ন করিলেন, "কিন্তু মিঃ মুখার্জ্জি বললেন তুমি মিস রায়ের পাশে বসেছিলে, পালাবার এতটুকু চেষ্টা করনি। মিঃ মুখার্জ্জি ঘরে ঢুকতে তুমি নিজেই তাঁর হাতে ধরা দিয়েছ।"

রাখাল উত্তর দিল; "হ্যাঁ দিয়েছি কারণ যে কোনও কারণে আমার অনুতাপ এসেছে, নিজেকে আমি আর বাঁচিয়ে রাখতে চাইনে।"

রাখালের পক্ষে ব্যারিষ্টার ছিলেন মিঃ ঘোষ, দেবানন্দ গোপনভাবে ইঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিল। মিঃ ঘোষ রাখালকে বাঁচাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, তাহাকে নিজের দোষ অস্বীকার করিতে বলিলেন। সে যদি কেবলমাত্র বলে সে খুন করে নাই তাহা হইলে সে বাঁচিয়া যাইবে—কেন না মিস রায় নিজেই মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছেন রাখাল তাঁহাকে গুলি করে নাই। হয়তো কিছুদিনের জন্য সে কারাগারে যাইবে, তাহার পর আবার সে মুক্ত হইবে, স্বাধীনতা পাইবে।

কিন্তু রাখাল একই জেদ ধরিয়া রহিল, সে নিজেই খুন করিয়াছে,

মুক্তি সে চায় না। যেমন করিয়াই হোক—তাহাকে মরিতেই হইবে, স্বাধীনতা সে চায় না।

সেদিন বিচার শেষ হইয়া গেল, বিচারে রাখালের উপর চরমদণ্ডের আদেশ হইল।

রাখালের মুখখানা দৃপ্ত হইয়া উঠিল, সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া উপরের দিকে তাকাইল।

পরদিন সকালে ফাঁসির সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, রাখাল সমস্ত রাত্রি পরম শান্তিতে ঘুমাইল। এমন ঘুম সে বহুকাল—মায়ের কোল ছাড়িয়া পর্য্যন্ত ঘুমায় নাই।

সকাল বেলার সময় দেবানন্দ দেখা করিতে আসিল।

রাখালের প্রফুল্ল হাসিভরা মুখ দেখিয়া সে অন্তরে আঘাত পাইয়াছিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "এমন একটা অমূল্য জীবন আমিই নষ্ট করে ফেললুম, সেই কথা ভেবে সত্যিই আমার বড় কষ্ট হচ্ছে রাখাল।"

রাখাল বলিল, "তুমি নষ্ট করনি দেবানন্দ, আমি নিজেই মরণের দিকে ঝুঁকে পড়েছি। বেঁচে থাকা আমার পক্ষে অসহ হয়ে উঠেছে এখন ;—আজ যদি কোনরকমে আমি মুক্তি পেতুম—বাইরে গিয়ে আমি আত্মহত্যাই করতুম। বাঁচবার ইচ্ছা করেছিলুম সেইদিন পর্য্যন্ত—যেদিন মিস রায়ের কাছে যাই, তারপর আর নয়।"

দেবানন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমারই ভুল হয়েছিল কিন্তু ভাবিনি ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে। তুমি আমার বাল্যবন্ধু, তোমায় আমি যতখানি স্নেহ করি—ভালবাসি, এরকম আর কাউকে ভালবাসতে পারিনি। আমারও একাজে বিতৃষ্ণা এসেছে রাখাল, পৃথিবী হতে চিরবিদায় নেওয়ার বেলায় এটুকু জেনে যাও—ছদ্মবেশী দেবানন্দ মরে গেল, আমি সত্যিই এসব কাজ ছেড়ে দিলুম, দেখি অন্য

কোনরকমে—ত্যাগের পথ দিয়ে লক্ষ্যস্থানে পৌছাতে পারি কিনা। পারব কি ?"

রাখাল উৎফুল্লমুখে বলিল, "পারবে। ভারতের ভাগ্যাকাশ উজ্জল হয়ে উঠবে—যদি ত্যাগের পথে চলতে পারি—অহিংসা মন্ত্র আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারো। কিন্তু আজ তুমি যে কাজ করতে করতে ছেড়ে দিলে দেবানন্দ, আর যারা রইল—তারা কি এ কাজ করেই যাবে না, তোমার ওই হিংসাপূর্ণ পথ—যা তুমি তৈরী করে গেলে—হাজার হাজার জ্ঞানান্ধ কি সেই পথেই চলবে না ? ও পথটার চিহ্ন একেবারে বিলীন করে আসতে পারলে না ভাই ?"

বিষণ্ণমুখে দেবানন্দ বলিল, "না, পারলুম না, আমি যা তৈরী করেছি তা ভাঙ্গবার অধিকার আজ আমার নেই, তা এখন ওদের,—আমি বলতে গিয়ে আমি গুরুর মর্য্যাদা হারিয়েছি, ওদের চোখের সামনে একেবারে খাটো হয়ে পড়েছি। তবে এই সত্য কখনও গোপন থাকবে না রাখাল, ছাই কখনও আগুন চাপা থাকবে না ; এই সব অত্যাচারীরা একদিন বুঝবে—এভাবে ভারতের মুক্তি সম্ভবপর হবে না, বরং তাকে আরও শক্ত বাঁধনে বাঁধা হবে। আমার অসীম দুঃখে সান্ত্বনা এইটুকু— ওদের একদিন ফিরতে হবে, ওরাও একদিন সত্যকে অন্তরের মধ্যেই কুড়িয়ে পাবে।"

রাখাল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "পাবে কিন্তু তার আগে হয়তো অনেককেই আমার মত করে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে।"

দেবানন্দ বলিল, "একটা কথা জানতে চাই, শুনলুম মিস রায় তোমার পূর্ব্বপরিচিতা,—তাঁর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক ছিল— বলবে কি ?"

রাখাল খানিকটা চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "তিনি

আমায় ভালবাসতেন, আর আমি—তাঁর সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়েও—ভক্ত যেরকমভাবে দেবীকে ভালবাসে, সেই রকম তাঁকে ভালবাসতুম।”

একমুহূর্ত্ত পরে দৃপ্তভাবে সে আবার বলিল, “হ্যাঁ, সত্যিই আমি ইথারকে কতখানি ভালবাসতুম, কতখানি ভক্তিশ্রদ্ধা করতুম তা তোমায় কথায় বুঝাতে পারবনা দেবানন্দ। ছোটবেলায় একজনকে ভালবেসে-ছিলুম, সে আমার চোখে সমস্ত নারীজাতিকে ঘৃণিত কলঙ্কিত করে চলে গিয়েছিল, সেই ঘৃণা দূর করেছিল ইথার, সে দেখিয়েছিল সকল মেয়েই সপ্তমী নয়। কুমারী হৃদয়ের পবিত্র ভালবাসা সে এই অশিক্ষিত পশুকে উৎসর্গ করে দিয়েছিল। তার হাত ধরবার জন্যে—তার চলার পথে সাথী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবার জন্যে অনেক সুশিক্ষিত ধনবান ব্যগ্র হয়েছিল, কিন্তু সে সকলকেই ফিরিয়ে দিয়েছিল। এর জন্যে জীবনে তাকে বহুকষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল, আত্মীয় আত্মীয়ারা তার কাছ হতে দূরে সরে গিয়েছিলেন, তবু সে বিচলিত হয় নি, তবু সে আমায় ভোলেনি।

রাখাল নতমস্তকে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর মুখ তুলিল,—

“কিন্তু অন্ধ আমি, কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে, ইথার আমায় ভালবাসে। একদিন মুহূর্ত্তের জন্যে মনে হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল, এ একেবারে অসম্ভব; সে কি—আর আমি কি। আমার অধঃপতন লক্ষ্য করে সে আমায় নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি যাইনি। হয়তো যদি যেতুম, তা হলে—”

সে থামিয়া গেল।

দেবানন্দ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “বুঝেছি। সেই রাত্রে তুমি তার পরিচয় পেয়েছিলে তাই তাকে গুলি করতে ইতস্ততঃ

করেছিলে সেইজন্যেই হরিসিং বা আর কেউ বাইরে হতে তাকে গুলি করেছিল।”

রাখাল বলিল, “ঠিক তাই-ই বটে। ওরা আমায় কর্তব্যে বিমুখপ্রায় দেখে গুলি করেছিল, আমাদের ভালবাসা তাদের জীবন বিপন্ন করবে কেন?”

উভয়ে খানিক নীরবে রহিল। রাখাল বলিল, “সে আমায় জানিয়ে গেছে—সে আমাকেই ভালবাসত। এ মরণে তার দুঃখ নেই, সে বিশ্বাস করে গেছে জন্মান্তর আছে, সেই জন্মে সে আমার তার স্বামীরূপে পাবে। এ জন্মে পাওয়ার আশা নেই,—তার আমার মাঝে জগতে অনেকখানি ব্যবধান থেকে গেছে, এ ব্যবধান এজন্মে দূর হবে না। আমি জন্মান্তর মানতুম না, দেবতা মানতুম না, কিন্তু আজ মানি দেবানন্দ, আজ মানি ভগবান আছেন, জন্মান্তর আছে, সে জন্মে আমি ইথারের উপযুক্ত হয়ে জন্মাব।”

কারাগারের দ্বার ঝণঝণ করিয়া উঠিল, দেবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল— “আর সময় নেই ভাই—বিদায় দাও।”

রাখালকে সে বুকের মধ্যে জড়াইয়া রহিল, কঠোর প্রাণ দেবানন্দের চোখে তখন জলধারা বহিতেছে।

রুদ্ধকণ্ঠে রাখাল বলিল, “আমার পতিত আত্মার জন্যে প্রার্থনা করো বন্ধু।—প্রার্থনা করো—আবার যখন জন্মাব তখন যেন শস্যশ্যামলা বাংলা মায়ের কোলে বাঙ্গালী হয়েই জন্মাতে পারি, আমি যেন চাষার ঘরে সুখশান্তির মধ্যেই জন্মাই, এরকম করে দূরের পানে চেয়ে যেন আজীবন-কাল হাহাকার করে না বেড়াই।”

রুদ্ধকণ্ঠে দেবানন্দ বলিল, “ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার শেষ বাসনা যেন পূর্ণ হয়।”

চোখ মুছিতে মুছিতে সে বাহির হইয়া গেল, কারাগারের লৌহময় কপাট ঝণঝণ শব্দে আবার বন্ধ হইয়া গেল।

রাখালকে যখন ফাঁসির মঞ্চে লইয়া যাওয়া হইল, তখন তাহার মুখ তেমনই দৃপ্ত, তেমনই হাসিতে পরিপূর্ণ।

ফাঁসিতে তাহাকে যখন ঝুলাইয়া দেওয়া হইল তখন একটীমাত্র শব্দ তাহার মুখে উচ্চারিত হইল—

"ইথার—"

রাখাল চলিয়া গেল, তাহার নামটা—জগতে যাহারা কিছু পায় নাই সেই সব হতভাগ্যদের শ্রেণীর মধ্যে চিরকালের জন্য রহিয়া গেল।

সমাপ্ত